পুরাণ ও বিজ্ঞান

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

প্রাক্‌কথন

কিছুদিন পূর্বে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালায় স্বামীজির আর একখানি গ্রন্থ 'বেদ ও বিজ্ঞান' প্রকাশিত হয় এবং বিদগ্ধসমাজে ঐ গ্রন্থ অশেষ সমাদর লাভ করে।

গবেষণা গ্রন্থমালায় স্বামীজির দ্বিতীয় গ্রন্থ এই 'পুরাণ ও বিজ্ঞান'। তথ্যে এবং তত্ত্বে ইহার প্রতিটি প্রবন্ধই অনন্য। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস প্রবীণ এবং নবীন উভয় পাঠকই ইহাতে স্বাভিমত বস্তুর সন্ধান পাইবেন। স্বামীজির রসহীন এবং কঠিন বিষয় সমূহের বিশ্লেষণ দক্ষতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির মাধ্যমে প্রতি ক্ষেত্রে যাচাই করার অভিনব শৈলী এবং উপলব্ধির বিচিত্র পরিবেশনা এই ত্রিধারায় স্নাত হইয়া কুশলী পাঠক প্রচুর আনন্দলাভ করিবেন।

আমরা ভগবৎ সমীপে এই জ্ঞান-তপস্বীর সুদীর্ঘ পরমায়ুঃ সতত প্রার্থনা করি।

শ্রীতারাশঙ্কর ভট্টাচার্য
অধ্যক্ষ

সংস্কৃত কলেজ,
কলিকাতা।
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

সূচীপত্র

ঋতস্য পন্থাঃ

তত্ত্ব জানিবার জন্য মানুষের মনে একটা স্বাভাবিক আকৃতি আছে, মানুষ মানুষ বলিয়াই তার মধ্যে এ জিজ্ঞাসা আছে। ইতিহাসে মানুষের যত রকম নমুনা আমরা দেখিয়াছি, সে সকলের মধ্যে এ জিজ্ঞাসাটিকেই, এক ভাবে না এক ভাবে ধরিতে পারিয়াছি। নিতান্ত অসভ্য পলিওলিথিকম্যান ও বাদ পড়ে না। মানবাত্মার জিজ্ঞাসার ত্রিবেণী আমাদের বেশ ভাল করিয়া চিনিতে হইবে। এই ত্রিবেণীর একটি বেণী বা ধারা হইতেছে কিমিদম্?—এটা কি? দ্বিতীয় বেণী বা ধারা হইতেছে কুত ইদম্?—ইহা কোথা হইতে? তৃতীয় বেণী বা ধারা হইতেছে—কস্মৈ ইদম্? কাহার বা কিসের জন্য ইহা? বলা বাহুল্য যে মানবাত্মার ভিতরে এই জিজ্ঞাসার তিনটি ধারা সম্মিলিত ভাবে বহিয়া যাইতেছে। যে মানুষ একটি মাত্র প্রশ্ন তুলিয়া থাকে, সে সঙ্গে সঙ্গে অপর দুইটি প্রশ্নও তুলিয়া তাদের উত্তরের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়। এ সকল কি, এইটি মাত্র জানিতে চাহিলাম কিন্তু এ সকল কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল, এবং কিসের জন্য আসিল, কি উদ্দেশ্যে কোন দিকে চলিয়াছে—ইহা জানিতে চাহিলাম না, এমন অসম্ভব ঘটনা ঘটে না। একটা জিজ্ঞাসা বা জানিতে চাওয়ারই এ তিনটি অঙ্গ। সুতরাং জিজ্ঞাসার অঙ্গচ্ছেদ করিতে নাই। এই জন্যই আমরা এই সনাতন জিজ্ঞাসার ধারাটিকে ত্রিবেণী বলিয়াছি। ধারা প্রকৃত প্রস্তাবে একটাই; আমরা একটা অভিন্ন ধারাকে তিনদিক দিয়া দেখিয়া তিনটা ভাবিতেছি বই নয়। এই যে অভিন্ন ধারা, ইহার একটা প্রসিদ্ধ শ্রৌত নাম—ঋত বা ঋতি। ঋতি কথাটার মূল ধাতুগত মানের কাছাকাছি একটা মানে লইতেছি। সুতরাং জিজ্ঞাসার অভিন্ন অখণ্ড বিষয় ঋত তত্ত্ব। এই মূলতত্ত্বের তিনটি বিভাগ—সৃষ্টিতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, যজ্ঞতত্ত্ব।

স্মষ্টিতত্ত্বে আমরা গোড়া (origin) খুঁজি, ব্রহ্মতত্ত্বে আমরা স্বরূপ (nature) খুঁজি, যজ্ঞতত্ত্বে আমরা লক্ষ্য বা প্রয়োজন (end or purpose) খুঁজি। ইংরাজি দার্শনিকের সেই সাবেকি পরিভাষা ব্যবহার করিতে গেলে বলিতে হয়—স্মষ্টিতত্ত্ব হইতেছে Cosmology, ব্রহ্মতত্ত্ব হইতেছে Ontology, যজ্ঞতত্ত্ব হইতেছে Teleology.

গোড়ায় যে অভিন্ন ঋতের তত্ত্ব রহিয়াছে, সেই ঋতকে বেদ "সত্য" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ। এই ঋত আবার হইতেছে যজ্ঞের একটি প্রসিদ্ধ নাম। সত্য ব্রহ্মের উপনিষৎ, অর্থাৎ রহস্য নাম। সুতরাং বেদের দৃষ্টিতে যেটি ঋতের তত্ত্ব, তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব এবং তাহাই যজ্ঞতত্ত্ব। বেদ পুনঃ পুনঃ দেবতাদিগকে এবং যাজ্ঞিকদিগকে ঋতের পথ অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন। এই ঋতের পথ এমন একটা সনাতন মার্গ, যে মার্গ অনুসরণ করিয়া দেবতা মানুষ এবং আর আর সকল পদার্থই স্বভাবে স্থির থাকিতে পারে, অথবা স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকিলে, আবার স্বভাবে ফিরিয়া যাইতে পারে। এই সনাতন মার্গকে আমরা যেন জড়বাদীর অন্ধ নিয়তি মনে না করিয়া বসি। ইহা এমন একটা ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা মানিয়া চলিলে স্বভাবে থাকা যায়, এবং লঙ্ঘন করিলে স্বভাব হইতে দূরে সরিয়া রহিতে হয়। এইজন্য এই ব্যবস্থার নাম ঋতি এবং লঙ্ঘনের নাম নিঋ'তি।

এই শেষোক্তটিকে অনেকস্থলে 'পাপ' বলিয়া ডাকা হইয়াছে। ঋতি আমাদিগকে স্বভাবে রাখে এবং স্বভাবে লইয়া যায়। নিঋ'তি আমাদিগকে স্বভাব হইতে তফাৎ করিয়া রাখে। নিখিলের এই নিজস্ব স্বভাবটি কি তা আর বলিতে হইবে কি? আমরা দেখিতেছি যে, হিন্দুর দৃষ্টিতে এমন কিছু নাই যাহা তার খাঁটি স্বরূপে ও স্বভাবে সচ্চিদানন্দময়, স্বাধীন ও লীলাময় নয়। সামান্য একটা ধূলিকণাও স্বরূপে ও স্বভাবে তাই। লীলার খাতিরে কর্ম, এবং কর্মের জন্য বস্তুর নানা দশা হইয়াছে ও হইতেছে। কর্মের জন্য দশ চক্রে ভগবান ভূত হইয়াছেন। এইজন্য কোন বস্তুই তার স্বরূপ ও স্বভাবে বজায় নাই। অথচ প্রত্যেক বস্তুর ভিতরেই স্বভাবে ফিরিয়া যাইবার জন্য একটা ঝোঁক রহিয়াছে। ফিরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত তার সুখ নাই, স্বস্তি নাই। এখন যে রাস্তা ধরিয়া চলিলে সে আবার স্বভাবে ফিরিয়া যাইতে পারে, সেই রাস্তাটি হইতেছে ঋতি। আর যে রাস্তা ধরিয়া চলিলে সে স্বভাব হইতে দূরে রহিয়া যাইবে এবং ক্রমে দূরেই সরিয়া পড়িবে, সেই রাস্তার নাম নিঋ'তি। ঋতের উল্টা বলিয়া ইহা অনৃত।

স্বভাব হইতে দূরে সরিয়া পড়ার মানে সচ্চিদানন্দময়ের স্বরূপটি হারাইয়া ফেলা; নিজের স্বাধীনতাটি খোয়াইয়া বসা। ভারতবর্ষ আজ হাজার বছর নিঋ'তির রাস্তায় হাঁটিয়া তার প্রাণের সত্য অনুভূতি, আনন্দ, স্বাধীনতা খোয়াইয়া বসিয়া আছে। আজ আবার ঋতের পথ অনুসরণ করার একটা বিপুল সাড়া পড়িয়াছে দেখিতেছি। এ ঋতের পন্থা সত্য হউক, শিব হউক। আসলে যেটি স্বরূপ, সেটি খোয়ান যায় না,

কিন্তু তা না হইলেও, যেন খোয়া গিয়াছে এরূপ একটা ভাব আসিতে পারে। এইরূপ ভাব আসে বলিয়াই, যিনি সচ্চিদানন্দময়, তিনি জড় সাজিয়া বসেন, যিনি বড় তিনি ছোট হইয়া পড়েন; যিনি স্বাধীন তিনি নানা বন্ধনের ভিতরে নিজেকে ধরা দিয়া বসেন। আসলে ইহা একটা মোহ, একটা অবিদ্যা। যে পাপ অনুসরণ করিলে এই অবিদ্যার এলেকাই ক্রমে বড় হইতে দেখা যায়, সেই পথ হইতেছে নিঋ´তি বা পাপ। তাই বেদ মুক্তকণ্ঠে বার বার বলিয়াছেন—দেবতারা ঋতের পথে চলিয়াই দেবতা হইয়াছেন এবং মানুষেরা ঋতের পথ অনুসরণ করিয়াই শ্রেয়োরূপ অন্ন বা রয়ি বা ধন লাভ করিতেছে ও করিতে পারে। বেদের দৃষ্টিতে এই ঋতের পথও যা, যজ্ঞের পথও তাই; ঋত ও যজ্ঞ অভিন্ন। সুতরাং যজ্ঞ এমন একটা ব্যবস্থা, যেটি মানিয়া চলিলে আমরা স্বভাবে ফিরিতে পারি এবং সেটি লঙ্ঘন করিলে আমরা স্বভাব হইতে দূরে রহিয়া যাই। ঠিক রাস্তা হইতে যেমন এদিক ওদিক নামিয়া পড়িতে নাই, সোজা চলিয়া যাইতে হয়, যজ্ঞ-স্বরূপ ঋতকে তেমনিধারা যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করিতে হয়; যজ্ঞের অঙ্গহানি বা অঙ্গবৈকল্য করিতে নাই। যাহা হইতে অঙ্গহানি বা অঙ্গবৈকল্য হয়, তাহা নিঋ´তি বা পাপ।

আমরা অগ্নিষ্টোমাদি যে সকল ছোট বড় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতাম এবং এখনও কিছু কিছু করিয়া থাকি, সেইগুলিকে যজ্ঞের ষোল আনা অর্থসম্পদ মনে করিলে চলিবে না। ব্রহ্ম যেমন বিশ্বে ওতপ্রোত, জগতে যেমন ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নাই, যজ্ঞও তেমনি ধারা বিশ্বে ওতপ্রোত। বিশ্বে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নাই এবং যাহা যজ্ঞে গিয়াই লয় পাইবে না। ঋক্‌বেদের ঋষিরা বহু জায়গায় খোলসা করিয়া যজ্ঞের এই বিশ্বরূপ আমাদিগকে দেখাইয়া, চিনাইয়া গিয়াছেন। স্বয়ং প্রজাপতি বা বিশ্বকর্মার এই সৃষ্টি ব্যাপারটাই হইল একটা যজ্ঞ। তিনি গোড়ায় যে কাজটি করিয়াছেন, সৃষ্টির মাঝখানে সকল বস্তু, আপন অধিকার ও যোগ্যতানুসারে সেই কাজের রিহার্সল দিয়া চলিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই প্রতিক্ষণে যজ্ঞ করিতেছে। এ যজ্ঞের বিরাম নাই। যতদিন না একটা বস্তু আবার নিজের স্বভাবে ফিরিয়া যাইতে পারিল অর্থাৎ নিজেকে পূর্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, স্বরাট, বিশ্বরাট ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিল, ততদিন পর্যন্ত তাকে এ যজ্ঞ করিয়া যাইতে হইবেই। সেজন্য যে স্বাভাবিক প্রেরণা ও বন্দোবস্ত থাকা দরকার, তা তার ভিতরে দেওয়াই আছে। কিন্তু রাস্তা তার সামনে দুটি। এক রাস্তায় চলিলে সে লক্ষ্যে, কিনা স্বভাবে নিশ্চয়ই পৌঁছতে পারিবে, সেই রাস্তা হইল ঋতি। কিন্তু সে রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িয়া যদি সে অন্য রাস্তা ধরে, তবে তার লক্ষ্যের বিপরীত দিকেই যাওয়া হইবে। এই রাস্তাটি হইল নিঋ´তি; যার অপর নাম যজ্ঞের বিঘ্ন—অঙ্গব্যত্যয় বা অঙ্গবৈকল্য। অবশ্য চিরদিনের তরে কোন কিছু পথভ্রষ্ট হইবে না, হইতে পারে না। দু'দিন আগে হউক, কিম্বা পরে হউক, সকলকে স্বভাবে ফিরিয়া আসিতে হইবেই। নিঋ´তি আমাদিগকে সোজা রাস্তা হইতে নামাইয়া খানিকটা

ঘুরাইয়া মারে, কতকটা কষ্ট দেয়। ফল কথা, নিঋর্তিও ঋতির বাহিরে, ঋতি হইতে আলাদা একটা কিছু তত্ত্ব নয়। নিঋর্তিকেও আসলে ঋতির শাসন মানিয়া চলিতে হয়। তাই পাপে দণ্ড আছে—বিগড়াইবার ভিতরে শোধরাইবার ফন্দি দেওয়া আছে। জগৎটা তাই বোধহয় একটা বিরাট self correcting machine.

প্রজাপতি যে মূল যজ্ঞটি করিয়াছিলেন, তার চেহারা আমরা আগে দেখিতেছিলাম। স্বর্গীয় আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁর লেখায় এই মূল যজ্ঞের কথা খাসা খোলসা ও সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। আচার্য মহাশয় তত্ত্বটি এই ভাবে বুঝাইয়াছেন—জগতের মূলে যে সত্তাটি রহিয়াছে সে সত্তাটি আমাদের পরমাত্মীয়। সে সত্তাটি "আমি"। লীলার জন্য, ব্যবহারের জন্য এই বিরাট "আমি" নিজেকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে। ফলে ব্যবহারিক "আমি," ব্যবহারিক "তুমি," ব্যবহারিক "সে" ও "উহা"। এই রকম সব কাজ চালান ভেদ আসিয়া দেখা দেয়। গোড়াতে এবং আসলে যে "আমি" বর্তমান, তার বাইরে কোন কিছু নাই, কোন কিছু থাকিতে পারে না। সেই আসল "আমির" ভিতরেই বিশ্ব, "তুমি" "সে" "উহা"—সমস্তই। এই যে বিরাট আমি নিজের মধ্যে ছুরি চালাইয়া নিজেকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলেন, এবং টুকরাগুলিকে নিজের বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন—এইটাই হইল প্রজাপতির মূল যজ্ঞ। বলি বা ত্যাগ ছাড়া যজ্ঞ হয় না। আসল "আমি" যখন একটা বই দুইটা নাই, তখন "আমি" আর কাহাকে ধরিয়া যজ্ঞে বলি দিবে? কাজে কাজেই "আমি" নিজেকে বলি দিয়াছে, নিজের'ই খানিকটা যেন ত্যাগ করিয়াছে যেন নিজের কাছ হইতে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। এই ত্যাগ বা ছুঁড়িয়া, ফেলার ফলে "আমি" আর শুধু "আমি" রহিল না। "তুমি" "সে" "উহা" এইরূপে বহু হইল। এইরূপে যেটি "আমি" আত্মা, সেটি পর হইল, অনাত্মা হইল। এই রকম বন্দোবস্তের ফলে আমরা সব সংসারে আসিয়াছি এবং সংসারের কারবারটি চালাইয়া যাইতেছি। গোড়াতে এই বন্দোবস্ত, কি না, যজ্ঞ না হইলে সংসারী জীবও থাকিত না, কোন রকম কারবারও চলিত না। গোড়ায় এই যজ্ঞের কল্যাণে আমি একজন জীব, আমার বাইরে একটা বিরাট বিশ্ব কল্পনা করিতেছি, যে বিশ্বের ভিতরে আমার মত এই রকম আরও কত লক্ষ লক্ষ জীব বাস করে এবং যাদের সঙ্গে অরি, মিত্র, উদাসীন—এই সকল রকম সম্পর্কই আমি পাতাইয়া বসিয়াছি। সৃষ্টির মূল যজ্ঞ ইহাই। আমি এই যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর, যজমান, হোতা এবং বলি। এই "আমি" সাধারণ কারবারী "আমি" নই। ইনি পরমাত্মা, পুরুষোত্তম—যাঁহার জ্যোতিঃসত্তা হইতে বিস্ফুলিঙ্গ বাহির হওয়াই ত্যাগ বা বলি। সেই বলির কল্যাণেই আমরা সকলে সত্তাবান হইয়া রহিয়াছি। এক জীববাদী বেদান্তী ছাড়া অপরে কথা কয়টা নিজেদের মত করিয়া বুঝিয়া লইবেন।

বেদ যে নানা যায়গায় প্রজাপতির নিজেকে দুই করিবার, স্ত্রী পুরুষ করিবার, এবং বহু হইবার কামনার কথা বলিয়াছেন, সে কথাটিও আমাদের এই মূল যজ্ঞের অর্থেই লইতে হইবে। উপাখ্যান শুনিতে পাই, কশ্যপের ভার্যা দিতির গর্ভে একটি মহাবলবান পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র দিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া সেই ভ্রূণটিকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়াছিলেন। সেই খণ্ডগুলি ভূমিষ্ঠ হইয়া মরুদ্‌গণ, উনপঞ্চাশ বায়ু হইয়া পড়িল, এবং মরুদ্‌গণ, ইন্দ্র ও দেবতাদের বিপক্ষ না হইয়া সহায়ই হইল। ঋগ্‌বেদ সংহিতার নানা যায়গায় দেখিতে পাই যে, ইন্দ্র মরুদ্‌গণকে সঙ্গে লইয়া পণি নামক ডাকাতদের হাত হইতে দেবতাদের গরুগুলি ছিনাইয়া লইতেছেন। এখন মনে প্রশ্ন উঠে—এই উপাখ্যানের আসল রহস্যটা কি? আমরা যে মূল যজ্ঞের কথা এতক্ষণ বলিতেছিলাম, সে মূল যজ্ঞই এ গল্পের রহস্য। কশ্যপ আর কেহই নন—"আমি"; পুরাণে তাঁর অনেকগুলি ভার্যার কথা আমরা শুনিতে পাই, কিন্তু তাঁর আসল দুইটি সংসার আছে, অদিতি ও দিতি। অদিতি মানে যার খণ্ড নাই, ছেদ্ নাই; অদিতি তত্ত্ব, অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন তত্ত্ব। দিতি ইহার উল্টা। কাজে কাজেই অদিতি অভেদ দৃষ্টি, দিতি ভেদ দৃষ্টি। অভেদ দৃষ্টিতে দেবতা বা আদিত্য, ভেদ দৃষ্টিতে দৈত্য। আসলে কিন্তু আমি ছাড়া আর কিছুই নাই। আমি নিজেকে অভেদ দৃষ্টিতে দেখিয়া হইতেছেন দেবরাজ ইন্দ্র বা আদিত্য, যে ইন্দ্রের বা আদিত্যের মহিমাই হইতেছে এই বিরাট বিশ্ব এবং যিনি স্বর্গ অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়া স্ব স্ব স্থানে ধরিয়া রাখিয়াছেন। স্বয়ং বেদই অকুণ্ঠিত ভাষায় ইন্দ্রের এই স্বরূপ ও মহিমা বারবার আমাদের শুনাইয়াছেন। পুরাণে বরং মনে হয়, ইন্দ্র যেন কতকটা খাটো হইয়াছেন। আমি যখন নিজেকে সব বলিয়া জানি, আমার বাহিরে পর কোন কিছু নাই বলিয়া বুঝিতে পারি, তখন আমি ইন্দ্র। অথবা কশ্যপই ইন্দ্র। আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ। কিন্তু যখন অজ্ঞানে বা মোহে আমি আমার এই আসল আমিত্বটি ভুলিয়া যাই জগতটাকে আমার এলেকা ও পরের এলেকা এইভাবে ভাগ করিয়া লই, তখন আমিই হইতেছি বিরোচন বা দৈত্যরাজ; অথবা কশ্যপই বিরোচন।

এখন কশ্যপ যে অদিতিকে বিবাহ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে উৎপাদন করিতেছেন—এটা সেই মূল যজ্ঞেরই একটা দিক। কেন না এই যজ্ঞের ফলে আদিত্যগণ ও তেত্রিশকোটি দেবতার সৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও এক আমি বহু হইতেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভার্যা অদিতি বা অভেদদৃষ্টি বলিয়া, সেই বহুর মধ্যেও এক বজায় রহিয়া যান। এই জন্য দেবতা তেত্রিশকোটি হইলেও আসলে এক। সেই এক দেবতাকে অগ্নি বলিয়াই ডাকি, বরুণ বলিয়াই ডাকি, মিত্র বলিয়াই ডাকি, ইন্দ্র বলিয়াই ডাকি, আর সোম বলিয়াই ডাকি, তাতে তেমন কিছু আসিয়া যায় না। স্বয়ং বেদই এ পক্ষে আমাদের সন্দেহ রাখিতে দেন নাই।

বেদ দেবতাদিগকে এই নানা রকম নানান নামেই ডাকিয়াছেন, নানা দিক দিয়াই দেখিয়াছেন, কিন্তু দেবতারা যে মূলে এক, তাঁরা যে সকলে আদিত্য বা অদিতির সন্তান, এ কথাটি বেদ এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিতে দেন নাই। প্রকৃতপক্ষে দেবতাভাবে দেখা মানে এক করিয়া দেখা। এই জন্য কশ্যপ অদিতির গর্ভে দেবতাদের সৃষ্টি করিয়া সেই মূল যজ্ঞটিরই অভিনয় করিলেন। বলা বাহুল্য, যজ্ঞটি কেবল এই আকারের হইলে আমরা যে ধরণের সৃষ্টি, সে ধরণের সৃষ্টি হয় না, আমাদের ভিতরে আমিই যে শুধু বহু হইয়াছে এমন নহে, সে আমি যে মূলে, আসলে এক আমি, ইহাও সে ভুলিয়া বসিয়া আছে। আমার দৃষ্টিতে তুমি ও সে সত্য সত্যই পর, অনাত্মীয়। অভেদ দৃষ্টি থাকিলে এমন হবার কথা নয়। কাজে কাজেই কশ্যপের অদিতি ছাড়া, আরও দুটি একটি সংসার করা আবশ্যক। কেবলমাত্র অদিতিকে লইয়া থাকিলে দেবতারাই থাকিবেন। তাই কশ্যপের আর একটি সংসারের নাম পুরাণকার দিয়াছেন দিতি। দিতির গর্ভে দৈত্যই জন্মায়, মানুষ বা আর কিছু জন্মে না, ইহা যেন আমরা না মনে করি। যাহা কিছুর মধ্যে সত্য সত্যই একটা ভেদ দৃষ্টি রহিয়াছে, আপন ও পরের একটা বিরোধ রহিয়াছে, সে সবই কশ্যপের এই দ্বিতীয় সংসারটির গর্ভে জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে। মানুষ, দেবতা ও দৈত্য—এ দুয়ের এলেকাতেই বাস করে। মানুষের ভিতরে কশ্যপ ঠাকুর তাঁর দুইটি সংসার লইয়াই ঘর করিতেছেন। কাজে কাজেই মানুষের ভিতরে ভেদ দৃষ্টি প্রবল সন্দেহ নাই, কিন্তু অভেদ দৃষ্টি একেবারেই নাই এমন নয়। এইজন্য পুরাণকার মানুষকে অর্বাক্ স্রোতাঃ বলিয়াছেন, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সৃষ্টির যে স্রোতটি চলিয়াছে, সে স্রোতের মুখ সোজা উপরের দিকেও নয়, আবার নীচের দিকেও নয়। এইজন্য মানুষের মধ্যে ভাল মন্দ দুই-ই আছে, এবং এ দুয়ের জ্ঞানও আছে। দিতিকে মা বলিয়া ডাকিয়া মানুষ এই সংসার করিতেছে এবং আত্মপর ভেদ করিতেছে, কিন্তু সময়ে সময়ে সে অদিতি ঠাকুরাণীকেও মা বলিয়া চিনিতে পারে; চিনিতে পারিলে সে নিজের অদ্বৈত স্বরূপটি, আনন্দময় সত্তাটি জানিতে ও আস্বাদ করিতে ব্যাকুল হয়। মানুষের ভিতরে যে সত্য সত্যই হুঁস—সে জানে দিতি তার সৎমা, আর অদিতি হচ্ছেন আপন মা। এটি ভুললেই মানুষ বেহুঁস।

কশ্যপ দিতিকে বিবাহ করিয়া ভেদজ্ঞানে যে সৃষ্টিটা করিয়াছেন, সে সৃষ্টিটাও প্রজাপতির সেই মূলযজ্ঞ। এ যজ্ঞের ফলেও এক আমি আত্মপররূপে বহু হইয়া এ সংসারের আজব চিড়িয়াখানাটি বানাইয়াছে ও বানাইতেছে। অদিতিকে লইয়া যে যজ্ঞ, তার সঙ্গে এ যজ্ঞের তফাৎ এইখানে যে, এই যজ্ঞের ফলে বহুর মধ্যে উত্থিত গ্রথিত অভেদ একত্বটি একেবারেই হারাইয়া যায়; অবশ্য অবিদ্যায় বা অজ্ঞানে। সুতরাং এ যজ্ঞের ফলে সত্য সত্যই আমি হইতে তুমি আলাদা হইয়া পড়ে এবং পর বনিয়া যায়। পর হইয়া সে আমির সঙ্গে মারামারি কাটাকাটি জুড়িয়া দেয়। এখন দেবতারা

খবর পাইলেন যে দিতি তাঁহার গর্ভে এক মহাবল সত্ত্ব ধারণ করিয়াছেন। খবরটা পাইয়া দেবতাদের যেন ভয় হইল। তাঁরা ভাবিলেন, বুঝি দিতির গর্ভে ঐ সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে দৈত্যেরা অজেয় হইবে, দেবতাদের আর কোন অধিকার থাকিবে না। দেবতারা ইন্দ্রকে ধরিলেন—যাও তুমি গিয়া দিতির গর্ভে প্রবেশ কর এবং গর্ভস্থ ঐ মহাসত্ত্বটিকে সমূলে শেষ করিয়া আইস। ইন্দ্র তথাস্তু বলিয়া বিমাতার গর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং গর্ভস্থ মহাসত্ত্বটিকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিতে লাগিলেন। টুকরা টুকরা অবস্থাতেই শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইল এবং মরুদ্‌গণ আখ্যা পাইয়া ইন্দ্রের সহায় হইল।

এই অনুষ্ঠানটিরই বা তাৎপর্য কি? দিতির গর্ভে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাঁরা ভেদ-দৃষ্টি-প্রসূত বলিয়া আলাদা আলাদা ভাবে জন্মগ্রহণ করে, সন্দেহ নাই। তারা আলাদা আলাদা ও ছোট বলিয়া, দেবতারা তাহাদিগকে সহজে জয় করিতে পারেন। কিন্তু দিতির গর্ভে বিরাট এমন কিছু একটা যদি জন্মগ্রহণ করে, তবে দেবতাদের ভয় পাইবার কথা। আমরা নিজেদের অনুভূতি লইয়া এ তথ্যটি বুঝিতে চেষ্টা করিয়া দেখি। আমি এই বসিয়া রহিয়াছি। আমার চারিধ র গাছপালা, পৃথিবী, জল, বাতাস, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, তারা, কত অগণিত . .জন্তু, আরও কত কি জড়াইয়া একটা বিপুল বিশ্ব রহিয়াছে। আমি জ্ঞাতা, আর ঐ বিশ্বটা হইতেছে আমার জ্ঞেয়। আমি অহম্, বিশ্বটা হইতেছে ইদম্। আমি জ্ঞাতা হইলে কি হয়—ঐ জ্ঞেয় বিশ্বটা আমার তুলনায় এত বড়, এত বলবৎ, এত বিচিত্র যে আমি ওটার তুলনায় নিজেকে নিতান্ত নগণ্য মনে করিতেছি। ভাবিতেছি এই বিরাট বিশ্বে আমার স্থান কতটুকু, এই মহা-শক্তি-রাজ্যে আমার নিজস্ব শক্তির এলেকা কতটুকু! এইজন্য বিশ্বের পাশে আমি নিজেকে কত ক্ষুদ্র, কত কৃপণ, কত কুণ্ঠিত, কত সঙ্কুচিত ভাবিতেছি। বলা বাহুল্য আমার বাহিরে অনাত্মীয় একটা জগৎ কল্পনা করা ভেদ দৃষ্টির ফল। আসলে আমি ছাড়া আর কিছুই নাই। আমার বাহিরে আর কিছু থাকার প্রমাণ নাই। যে বিরাট ভূতটিকে দেখিয়া আমি ভয়ে জড়সড় হইতেছি, আসলে সে ভূতটি আমারই খানিকটা অংশ, যেটিকে আমি আমার নয় ভাবিতেছি; সুতরাং আমার বাহিরে তফাৎ করিয়া সরাইয়া দিয়াছি। কেউ কেউ আপন ছায়া দেখিয়াও ভয় পাইয়া উঠে। আমি আমার এই বিরাট ছায়া স্বরূপ বিশ্বটিকে দেখিয়া সদাই সঙ্কুচিত হইয়াছি; সদাই ভয়ে কাঁপিতেছি কখন ঐ ছায়াটা আমার টুঁটি চাপিয়া ধরে। আমার ভিতর কশ্যপ ঠাকুর দিতির গর্ভে এই বিরাট ভূতটিকে উৎপাদন করিয়াছেন, অবশ্য সেই মূল যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া। এই বিরাট ভূতটি অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে নাই; করিলে আমি সত্য সত্যই ইহাকে আমা হইতে পর ভাবিতাম না, সুতরাং ইহাকে দেখিয়া ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিতাম না।

পূর্বেই বলিয়াছি, যে আমার ভিতরে কশ্যপ ঠাকুর যেমন দিতিকে লইয়া ঘরকন্না করিতেছেন তেমনি আবার তিনি অদিতিকে লইয়াও ঘরকন্না করিতেছেন। অভেদ

দৃষ্টির পরিচয়টি আমার ভিতরে সচরাচর অস্পষ্ট হইলেও, একেবারে নাই এমন নয়। বিবেকের ও অনুশীলনের দ্বারা এই পরিচয়টি স্পষ্ট ও পাকা করিয়া লওয়া আবশ্যক। করিতে পারিলে আমাদের ভিতরে দৈত্যদের এলেকা আর থাকিবে না। সুতরাং আমাদের ভিতরে সত্য সত্যই পর অনাত্মীয় বলিয়া কিছু থাকিবে না। তা যদি না থাকে তবে কোন কিছু হইতে ভয় ও পাইব না। বরং সবই আমি, সবই আত্মা, এই অনুভবে ব্রহ্মানন্দ আস্বাদ করিব। আমার ভিতরে অভেদ দৃষ্টির সন্তানগুলি, অর্থাৎ দেবতারা রহিয়াছেন, তাই তাঁহারা পরামর্শ করিয়া ইন্দ্রকে দিতির গর্ভটি নষ্ট করিতে নিয়োগ করিলেন। আমাদের ভিতরে ভেদ দৃষ্টি যে একটা বিরাট ভূত প্রসব করিয়া আমাদিগকে ভয়ে আড়ষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে, অভেদ দৃষ্টি সেই বিরাট ভূতের সর্বাঙ্গে প্রবেশ করিয়া, সেটিকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিবে যে, ও ভূত আমি ছাড়া আর কিছু নহে, সুতরাং ও ভূত আমার উদ্দেশ্যের বাধক ও অন্তরায় না হইয়া বরং সাধক ও সহায়। যেটি হইতে ভয় পাইব ভাবিয়াছিলাম, সেটিকে আত্মীয়, আপন করিয়া লইয়া অফুরন্ত আনন্দ পাইবার আয়োজন করিলাম। অভেদ দৃষ্টির আত্মজ যে ইন্দ্র, তাই ভেদ দৃষ্টির আত্মজ বিরাট বিশ্ব ভূতটিকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া (অর্থাৎ কাটিয়া) আমাকে দেখাইয়া দেন যে, বিশ্ব আমার পর নহে, বাধক নহে, আমার আত্মীয়, আমার সাধক ও সহায়। পর হইয়া ও বাধক হইয়া যে ভূতটি জন্মিতে যাইতেছিল, ইন্দ্র আসিয়া সেই ভূতটিকে আপন করিয়া ও সুহৃৎ করিয়া দিলেন।

বলা বাহুল্য, বিশ্বভূতটা যদি আমার আপন হইয়া যায়, "আমি" হইয়া যায়, তবে সে আর সত্য সত্যই দৈত্য থাকে না, ভয়ের ও বিরোধের একটা কিছু থাকে না। এইজন্য ইন্দ্র তন্ন তন্ন করিয়া কাটিয়া যে মহাসত্ত্বটিকে দিতির গর্ভ হইতে বাহির করিলেন, সে মহাসত্ত্ব আর দৈত্যের দলে গিয়া ভিঁড়িল না, ইন্দ্রের সহায় ও সুহৃৎ হইল এবং মরুদগণ আখ্যা পাইয়া, দেবতাদের মধ্যেই ঠাঁই পাইল। আরও মজার কথা, যখন ইন্দ্র দিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া গর্ভস্থ সেই সত্ত্বটিকে কাটিতেছিলেন, তখন ব্যথা পাইয়া সে সত্ত্বটি কাঁদিতেছিল। দেবতারা তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন—বাছা, তুমি কাঁদিও না, খণ্ডিত হইলেও তোমার পরাক্রম অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং তুমি আমাদেরই একজন হইবে। দেবতারা বলিয়াছেন "মা রুদ"—কেঁদ না। তাই তার নাম হইল "মারুত", মরুৎ, মরুদগণ। প্রকৃত প্রস্তাবে, আমি যতক্ষণ তোমাকে ও বিশ্বকে আমা হইতে পর ভাবিতেছি, ততক্ষণই তোমার ও বিশ্বের মধ্যে আমার ঠোকাঠুকি। তোমার সঙ্গে মাথা ঠুকিতে গিয়া আমি যে শুধু-ব্যথা পাই এমন নয়, তুমিও পাইয়া থাক। যেখানে ঘাত, সেখানে প্রতিঘাত, এবং ঘাত প্রতিঘাত তুল্য হবারই কথা। এইজন্য তুমি, সে এবং এই বিশ্বটা যতক্ষণ পর্যন্ত দিতি, কিনা ভেদ দৃষ্টির গর্ভে থাকে ততক্ষণ তোমার, তার, বা বিশ্বের গায়ে ছুরি চালাইতে গেলে, তোমরা ব্যথা পাও, কাঁদিয়া থাক। অভেদ

দৃষ্টির আত্মজকে তাই সব মিলাইয়া দিবার সময় এই বলিয়া আশ্বাস ও অভয় দিতে হয়—ওগো তোমরা তো আমার পর নও, তোমাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া কিসের, তোমাদিগকে যে আমি নিজের ভিতর টানিয়া লইতেছি; এর ফলে তোমাদের সঙ্গেও সকল ঝগড়া আমার আপোষ হইয়া গেল, তোমরা আমার আপন হইলে, "আমি" হইলে; কাঁদিও না।

আমরা এই আখ্যায়িকাটি এত খোলসা করিয়া ভাঙিয়া বলিলাম এইজন্য যে, ইহার ভিতর প্রজাপতির মূলযজ্ঞের তত্ত্বটি বেশ সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। আমরা আগেই দেখিয়াছি যজ্ঞের সঙ্গে ঋতের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং নির্ঋতিই বা যজ্ঞের সঙ্গে কোন্‌ভাবে কি সম্পর্ক পাতাইয়া আসিয়া থাকে। আমাদের ভিতরে অদিতির সন্তানেরাও যজ্ঞ করিতেছেন, দিতির সন্তানেরাও যজ্ঞ করিতেছেন। পুরাণাদিতে যে বার বার দেখিতে পাই দৈত্যগণ দেবতাদিগকে হঠাইয়া দিয়া নিজেরাই যজ্ঞফল ভোক্তা হইয়াছিলেন—এ কথাটির তাৎপর্য আমরা আগেকার ঐ ব্যাখ্যাটি ভালমতে বুঝিলে ধরিতে পারিব। "আমি" ভেদ দৃষ্টি লইয়া যদি এই অনুভব ও কল্পনার যজ্ঞটি করিতে বসে, অভেদ দৃষ্টিকে তেমন আমোল না দেয়, তবেই দেবতারা স্ব স্ব অধিকার হইতে বিতাড়িত হইলেন এবং দৈত্যরাই যজ্ঞের ফলভাগী হইল। বলা বাহুল্য দৈত্যদের দ্বারা অনুষ্ঠিত ও দৈত্যদের দ্বারা আস্বাদিত এই যজ্ঞফল আপাততঃ প্রেয় হইতে পারে কিন্তু কদাপি শ্রেয়ঃ নয়। ফল শ্রেয়ঃ নয় বলিয়া দৈত্যদের যজ্ঞানুষ্ঠান ঋতি না হইয়া নির্ঋতি—ঠিকপথ না হইয়া বেঠিক, ভুল পথ। মানুষের ভিতরে এই বেঠিক ভুলপথে চলিবার সম্ভাবনা খুবই রহিয়াছে; মানুষকে সতর্ক হইয়া, ঋতজ্ঞ হইয়া ও ঋতনিষ্ঠ হইয়া নির্ঋতি হইতে আবার ঋতিতে ফিরিয়া আসিতে হয়। ঋতি সত্যও বটে, সৌভাগ্যও বটে। ইন্দ্র দেবতাদের পরামর্শে দিতির জঠরস্থ মহাসত্ত্বটিকে যেমন বুঝাইয়া আপন করিয়া লন, মানুষকেও প্রতিনিয়ত তাহাই করিতে হয়। ভারতবর্ষ ব্যক্তির জীবন ও জাতির জীবনের ভিতর দিয়া ঋতজ্ঞ ও ঋতনিষ্ঠ হইয়া জাগিবেন আবার কবে? ভারত-নিয়তির গর্ভে এক মহাবল সত্ত্ব প্রসব-ব্যথায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। যুগ ইতিহাস প্রতীক্ষা করিতেছে—কি সন্তান প্রসব হইবে—দানব না দেবতা? ভারতের সত্য ও পুণ্য সাধনা কি একে 'আপন' করিয়া লইবেন?

মনের ভূত

ঋগ্‌বেদ সংহিতার ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তটিকে অধ্যাপক ম্যাকডোনেল প্রমুখ বিলাতী পণ্ডিতেরা "Song of Creation" বলিয়া তারিফ করিয়াছেন,—অবশ্য বেশ একটুখানি কিন্তু রাখিয়া। History of Sanskrit Literature. Arthur A. MacDonell. Page 137—"Apart from its high literary merit the poem is most noteworthy for the daring speculations which find utterance in so remote an age. But even here may be traced some of the main defects of Indian philosophy—lack of clearness and consistency, with a tendency to make reasoning depend on mere words. Being the only piece of sustained speculation in the 'Rigveda' it is the starting point of the natural philosophy, which assumed shape in the evolutionary Sankhya system. It will, moreover, always retain a general interest as the earliest specimen of Aryan philosophic thought. With the theory of the song of creation, that after the non-existent had developed into the existent, water came first, and then intelligence was evolved from it by heat, the cosmogonic accounts of the Brahamanas substantially agree. Here too the non-existent becomes the existent of which the first form is the waters. On these floats Hiranya-garbha, the cosmic golden egg whence is produced the spirit that desires and creates the universe.

এসব উপর উপর দেখা। তত্ত্বের চেহারা দেখিতে এবং কথা শুনিতে আমরা পাইলাম না। দেখার চোখ এবং শোনার কাণ আমরা একেবারে খোয়াইয়াছি কি? চতুর্থ মন্ত্রে "কাম" এই শব্দটি সহজভাবেই রহিয়াছে; কিন্তু "রেতঃ" এই শব্দটি সোজাসুজি নাই। "মনসো রেতঃ" এই পদ দুইটি রহিয়াছে। "রেতঃ" বলিতে যে সাধারণ "রেতঃ" বুঝাইতেছে না তার প্রমাণ ঐ মন্ত্রের মধ্যেই রহিয়াছে, "মনসঃ" এই পদটি থাকায় আমরা বুঝিতেছি, ইহা স্থূল "আটপৌরে" সামগ্রী নয়। সায়নাচার্য রেতঃ মানে করিয়াছেন বীজ। ইহাতে বুঝায় যে এই নিখিল সৃষ্টির বীজ বা মূল কারণ কাহারও মনের ভিতরে বীজভাবে বিদ্যমান ছিল।

"কাহারও মন" বলিতে গিয়া আমরা যেন অকারণ গোল বাধাইয়া না ফেলি। দর্শন শাস্ত্রে "মন" কথাটী সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—ন্যায় বৈশেষিক দর্শনেও বটে, আবার সাংখ্য বেদান্তেও বটে। দর্শন শাস্ত্রের এই যে পারিভাষিক মন, এটিকে সৃষ্টির একেবারে গোড়ায় স্বীকার করিতে অনেকেই হয়তো নারাজ হইবেন। সাংখ্য-বেদান্ত মন পদার্থটিকে খানিক পরে আনিয়া সৃষ্টির আসরে হাজির করিয়াছেন; অভিনয়ের গোড়াতে মনের কোন "পার্ট"—নাই। অথচ দেখিতে পাই শ্রুতি অনেক স্থলে এবং বেদান্ত দর্শন সঙ্গে সঙ্গে, ব্রহ্মের সঙ্কল্প, কামনা অথবা ঈক্ষা হইতে এই অভিনয়ের সূত্রপাত করিয়াছেন। এখন মনে সমস্যা জাগে যে মন যদি কোন আকারে এবং কোন ভাবে গোড়াতে না ছিল তবে মূলের এই সঙ্কল্প, এই কামনা, এই ঈক্ষা কোথায় কেমন করিয়া জাগিল? মানসিক সত্তা ছাড়া এ সকল জাগিতে পারে কি? এসব মনের ধর্ম নয়তো কার ধর্ম? অতএব আমাদের বলিতে হয় যে, গোড়াতেই একটি বিরাট মন বিদ্যমান ছিল; সেই মনেরই সঙ্কল্প কামনা অথবা ঈক্ষা হইতে এই সৃষ্টির চাঞ্চল্য জাগিয়াছে। তবে এ কথাটি আমাদের খুব সতর্ক হইয়া বলিতে হয়। প্রথমতঃ আমাদের ভিতরে যে বস্তুটি মন রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সে বস্তুটি সসীম বস্তু—ন্যায় বৈশেষিক বলিবেন, সেটি একেবারে অণু। পক্ষান্তরে যে মনে সঙ্কল্প জাগিয়া এই বিশ্ব সৃষ্টির সূচনা হইয়াছে, সে মন সসীম, পরিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র কোন বস্তু নয়। দ্বিতীয়তঃ সেই মন আর এই মনে স্বভাবেও অনেক বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। আমাদের কারবারী মন স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন নহে। সে যে শুধু নিজের সংস্কারের দাস এমন নয়; সে আবার বাহিরের জড়েরও গোলাম; বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতি তাকে যে ভাবে নাচাইতেছে সে সেই ভাবেই নাচিতেছে, অবশ্য আপন সংস্কারের শিকল পায়ে দিয়াই। সেই শিকলটিই হইল আমাদের এই "পুঁতুল নাচে" পায়ের নূপুর—হয় ত সাধ করিয়াই পায়ে আমরা পরিয়াছি।

মন স্বরূপে আনন্দসত্তা সন্দেহ নাই। সুতরাং লীলার মালিক সেও বটে। কিন্তু অবস্থার ও সংস্কারের দশচক্রে পড়িয়া সে ভগবান ভূত বনিয়া গিয়াছে। এই ভূতগ্রস্ত মনের ভূত ছাড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে সাধন। এইখানে একটি গল্প মনে পড়িল—কোন ব্যক্তি পিশাচসিদ্ধ হইয়াছিল। পিশাচ তাহাকে বর দিল—তোমার সকল হুকুমই আমি তালিম করিব কিন্তু এক মুহূর্তের তরেও আমাকে বসাইয়া রাখিতে পারিবে না। বসাইয়া রাখিয়াছ কি তোমাকে ধরিয়া কিলাইতে থাকিব। মোট কথা একটা না একটা কাজে সবসময়ে আমাকে বহাল করিয়া রাখা চাই। এই সর্ত্তে আমি তোমার গোলাম হইব। পিশাচসিদ্ধ ব্যক্তিটি এই গোলামটিকে লইয়া অতি সত্বরই বিষম ফাঁপড়ে পড়িলেন। দুই চারিটি ফরমাইজ করেন; আর মুখ হইতে ফরমাইজ বাহির হইতে না হইতে কাজ হাসিল হইয়া যায়। বেচারির ফরমাইজের তহবিল

সত্বরই শূন্য হইয়া পড়িল। ভূতের যত কিল খাইতে খাইতে তার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হয় আর কি! কাজেই ওস্তাদের শরণাপন্ন হইতে হয়। গুরুজী বলিলেন, এক উপায় কর—উঠানের মাঝখানে একটা তেলালো বাঁশ পুতিয়া রাখ। যখনই বেগার বসিয়া থাকিয়া তোমাকে কিলাইতে আসিবে, তখনই বাঁশটি দেখাইয়া বলিবে—ঐ বাঁশে একবার উপরে ওঠো, আর একবার নীচে নাম,—যতক্ষণ না অপর ফরমাইজ করি ততক্ষণ এইরূপই করিতে থাক। বলা বাহুল্য এ অবস্থায় ভূতবাবাজী জব্দ হইয়া গেল। সাধকেরা এই গল্পের মধ্যে ষট্‌চক্রভেদের রহস্য হয়ত লুক্কায়িত দেখিতে পাইবেন। ঐ তেলালো বাঁশটি আমাদের সুষুম্না মার্গ মধ্যস্থ ব্রহ্মনাড়ী। আমাদের মনটিকে একবার সেই নাড়ীপথে ব্রহ্মধামে লইয়া যাইতে হয়,—তখন হইল "সোঽহম্"। আবার সেই ব্রহ্মলোক হইতে এই স্থূল প্রপঞ্চের মাঝখানে ফিরাইয়া আনিতে হয়—তখন হইল "হংস"। চঞ্চল প্রমাথী মনটিকে এই কর্মে লাগাইয়া দিতে পারিলে, সেও বেগার বসিয়া থাকে না, আমাকেও তাহার কিল খাইয়া বিব্রত হইতে হইল না।

সাধকের এই সব গুহ্য কথা বাদ দিলেও, আমরা সোজাসুজিই এই গল্পের মধ্যে একটি মহা সত্য আবিষ্কার করিতে পারি। সেটি হইতেছে এই—মন আসলে আনন্দস্বরূপ, লীলা-রসিক, সুতরাং স্বাধীন স্বতন্ত্র বটে, অর্থাৎ সৃষ্টির মূলে যে বিরাট চৈতন্য সত্তা, তার সঙ্গে আমাদের এই ক্ষুদ্র মন বেচারির স্বরূপে পার্থক্য নাই। ব্যবহারে, ঘটনাচক্রে পার্থক্য আসিয়া পড়িয়াছে। সে ঘটনাচক্র আর কিছুই নয়, মনের ভূতগ্রস্ত হওয়া; যেটা আপন ছাড়া আর কিছুই নয় সেটাকে পর ভাবিয়া, সেই পরের গোলামী স্বীকার করা। ইহারই ফলে মন বিরাট হইয়াও ক্ষুদ্র হইয়াছে, স্বাধীন হইয়াও পরাধীন হইয়াছে, শুদ্ধ হইয়া মলিন হইয়াছে। আবার যদি কোন উপায়ে এই ভূতের বাতিকটি মনের স্কন্ধ হইতে ঝাড়িয়া নামাইতে পারা যায়, তবে আবার মন স্বরূপে যা ছিল, তাই হইল; অর্থাৎ আবার স্বাধীন ও সত্য-সঙ্কল্প হইল। সেরূপ হইলে দুনিয়ার গোড়াকার সেই মনের সহিত এ মনের তফাৎ চলিয়া গেল। এই ভৌতিক বন্দোবস্তের ফলে যে মন পয়দা হইয়াছে, সে মন লইয়া অবশ্য সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের নিদান দেখা যায় না; এ বন্দোবস্তের আগে যে মন ছিল, সেই মনই আসল; এবং সেই মনের "রেতঃ ও কাম" হইতে এই নিখিল সৃষ্টির সূচনা হইয়াছে। এইভাবে দেখিতে পারিলে একটি হেঁয়ালীর সমাধান হইয়া যাইবে—মন ত মূলে ছিল না; যদি না ছিল, তবে মনের ধর্ম সঙ্কল্প প্রভৃতি আমরা মূলে পাইতেছি—কেমন করিয়া?

গোড়ায় মন ছিলনা, এ কথাও যেমন এক হিসাবে ঠিক, মন ছিল একথাও তেমনি অন্য হিসাবে ঠিক। দুইটা আলাদা হিসাব, গুলাইয়া ফেলিলেই গোল; নচেৎ কোন গোল নাই। গোড়ায় যে স্বতন্ত্র লীলাময়, অসীম চৈতন্য সত্তা, সেটিকে আমরা "মন" বলিলেও বলিতে পারি, আবার না বলিলেও পারি। তবে মনে রাখিতে হইবে যে,

যে নামেই অভিহিত হউক না কেন সেই মূল অখণ্ড চিৎ সত্তা হইতেই মন, প্রাণ এবং জড়ের নিখিল ধর্মই জাগিয়া উঠিয়াছে, আবার একদিন হয়ত এ সমস্ত তাতেই আবার লয় পাইবে। আমরা যে ছিন্নমস্তা মূর্তির ধ্যান করি, সে ধ্যানটি এই বিরাটের আসরেও আমরা পাইতেছি না কি? বিরাটের আসরে এ অভিনয় আছে বলিয়াই, সমষ্টির ভিতরে এ খেলা চলিতেছে বলিয়াই, ক্ষুদ্রের আসরে এবং ব্যষ্টির ভিতরেও এ খেলা চলিতেছে। অখণ্ড চৈতন্য সত্তা সৃষ্টির উপক্রমে আপন খড়্গে যেন আপনাকে বলি দিতেছেন; তিনি অখণ্ড হইয়াও অখণ্ড না হ'বার মত নিজেকে দেখাইতেছেন—খণ্ড খণ্ড করিয়া নিজেকে দেখাইতেছেন। ইহাই হইল তাঁহার আত্ম-বলিদান। এ মহা বলিদানের ফলে তাঁহা হইতে রুধির রূপে যে সৃষ্টির প্রবাহ নির্গত হইতেছে, সে প্রবাহের মুখ্যতঃ তিনটি ধারা—মন, প্রাণ, জড়; অথবা অন্যভাবে দেখিতে গেলে, শব্দ, অর্থ, প্রত্যয়। এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চ তিনের "ত্রিবেণী" সঙ্গম বই আর কিছু নয়। তাঁহা হইতে এই তিনটি ধারা নির্গত হইয়া অনন্তের পথে নিরুদ্দেশ মহাযাত্রা করিয়া থাকে না কি? ঘুরিয়া ফিরিয়া সে তিনটি ধারা আবার সেই অখণ্ড সত্তাতে গিয়া বিশ্রাম করে না কি? কোনওদিন বিশ্রাম করিবে বলিয়াই ত আমাদের মনে হয়; এবং তা যদি করে, তবে সেইদিনই হইল এ প্রপঞ্চের প্রলয়; যাহা হইতে এসব আসিয়াছিল, তাহাতেই আবার এ সব ফিরিয়া গেল। ছিন্নমস্তার ধ্যানে এই ব্যাপারটিই হইল আপন রুধির আপনি পান। সে যাহা হউক, গোড়াকার সেই অখণ্ড চৈতন্য সত্তা, সেটিকে "মন" বলিতে আমাদের আপত্তি হয় হো'ক, কিন্তু একথা ঠিক যে, সেই সত্তা হইতে মনের যা কিছু ধর্ম, সে সব ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, এবং তাহাতেই গিয়া সে সমস্ত লয় পাইতেছে—অথবা পাইবে।

এখন আমাদের এই ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন মনটিকে সেই বিরাট মনের মত করার প্রয়োজন হইলে আমাদের একটি ফন্দি বাহির করিয়া লইতে হয়। সে ফন্দি আর কিছুই নয়,—যে ভূত আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে, সেই ভূতটিকে তাড়াইয়া দেওয়া। তাকে তাড়ানর উপায় হইতেছে দুইটি—যদি তাকে গিলিয়া একেবারে হজম করিতে পারি, তবে ত তার হাত হইতে আমি খালাস হইলাম; আর যদি তাকে একেবারে উগলাইয়া ফেলিতে পারি, তাহা হইলেও রেহাই পাইলাম। সাপে ছুঁচা গেলার অবস্থা ঘটিয়া থাকিলে যত গোল। হয় গিলিয়া ফেলিতে হইবে, নয় উগলাইয়া ফেলিতে হইবে। গিলিয়া ফেলার ব্যবস্থা করিয়াছেন অদ্বৈতবাদী বেদান্ত। তিনি বলিতেছেন—ওটিকে ভূত ভাবিতেছ কেন? ভূত ভাবিয়া ভয়ই বা পাও কেন? তুমি ছাড়া যখন আর দ্বিতীয় কিছুই নাই, সবই যখন আত্মা অথবা ব্রহ্ম, তখন ভূতই বা কি আর ভূতের ভয়ই বা কি? অতএব এক কাজ কর, ভূতটিকে ধরিয়া স্বচ্ছন্দে গিলিয়া ফেল, আত্মসাৎ করিয়া ফেল; ভাব ওটি চিন্ময় আত্মা বই আর কিছুই নয়। এই ভূত গিলিবার ব্যবস্থা

অবশ্য চমৎকার ব্যবস্থা. তবে তিমিঙ্গিল ছাড়া এই বিশ্ব ভূতটিকে গিলিয়া ফেলার স্পর্দ্ধা কে রাখে? এ ভাবে মুক্ত হইয়াছেন কয়জন? শাস্ত্র তাই জেরা তুলিতেছেন—"শুকো বা ব্যাসো বা বশিষ্ঠো বা"—শুকদেব কি মুক্ত হইয়াছেন, ব্যাস কি মুক্ত হইয়াছেন, বশিষ্ঠ কি মুক্ত হইয়াছেন? তা কে জানে? সে যাই হ'ক, এই একভাবে মনের ভূতের অপসারণ চলে। তাহা হইলে সেই মনে, আর স্থষ্টির গোড়াতেই যে মন, তাহাতে আর তফাৎ থাকিল না। ভেদাভেদ-বাদী এবং দ্বৈতবাদী আচার্যগণ হয়ত ঠিক এই কথাটিতে সায় দিবেন না। তবে মোটামুটি এ কথাটিতে তাঁহাদেরও বিশেষ আপত্তি নাই। সে আলোচনা এক্ষেত্রে করিব না, তবে একটি কথা সর্ববাদি-সম্মত মনে করা চলিতে পারে—শক্তি সঙ্কোচ হইয়াছে বলিয়া গণ্ডীবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, আমাদের মন আর সেই বিরাট মন এক জিনিষ নয়; গণ্ডীমুক্ত হইলে এবং শক্তি অপরিমিত হইলে, দুই মনের সমীকরণ হইয়া গেল। সুতরাং আমাদের এই মনের আদর্শ এবং মূল হইতেছে—সেই গোড়াকার মন। আমাদের এই মনের নমুনা দিয়াই সেই গোড়াকার মনটি ধরিবার, বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়। গত্যন্তর নাই। আমাদের মনেই সঙ্কল্প কামনা ইত্যাদি জাগিয়া যেমন ধারা আমাদের ক্ষুদ্র এলেকার ভিতরে স্থষ্টি স্থিতি লয়ের খেলা করিতেছে, তেমনি ধারা আমরা ভাবিতে পারি যে, প্রকৃতির রাজ্যেও একটি বিরাট মনের ভিতর হইতে সঙ্কল্প কামনা প্রভৃতি জাগিয়া এই বিশ্ব-ভুবনের স্থষ্টি, স্থিতি, লয় করিয়া যাইতেছে। প্রতিবিম্ব দেখিয়া যেমন আমরা বিম্বকে বুঝি, ফটো দেখিয়া যেমন ধারা আসল মানুষকে আমরা চিনি, তেমনি ধারা আমাদের মনের ভিতরে সেই বিশ্বাত্মার অন্তর-সত্তার যে কণিকাটুকু রহিয়াছে, সেই মহাবহ্নির যে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গটুকু আমাদের ভিতরেও জ্বলিতেছে, সেই কণিকা, সেই বিস্ফুলিঙ্গের সাহায্যে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি, সেই বিরাট অখণ্ড চিৎসত্তা কেমন ধারা, এবং কেমন করিয়া এই স্থষ্টির নিখিল অবয়বের ভিতরে তাহার মহাপ্রেরণা চিরসজীব করিয়া রাখিয়াছে। নমুনা কেবল যে আমাদের ভিতর রহিয়াছে তাহা নয়, ছোট বড় যা কিছু স্থষ্ট হইয়াছে তার ভিতরেই ব্রহ্ম অনুপ্রবেশ করিয়াছেন; সুতরাং সে সবের ভিতরেই ব্রহ্ম-বস্তু নিজের নমুনা রাখিয়াছেন। সকল কারবারীই এই ভবের হাটে সেই নমুনা কিছু না কিছু নিজের দোকানে রাখিয়াছেন। নমুনাগুলির পরস্পরের মিল নাই। সকল মানুষের মধ্যে মন ও বুদ্ধি একরকম হইয়া নাই। আবার মানুষে যে ভাবে আছে, পশু-পক্ষীতে সে ভাবে নাই; এ সমস্তে যে ভাবে আছে—গাছ পালায় অথবা মাটি পাথরে সে ভাবে নাই। গাছপালায় অথবা মাটি পাথরে মনের সত্তা বলিতে আমাদের শাস্ত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না। বিজ্ঞানের কুণ্ঠাও বোধ করি শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যাইবে। এখন এই যে হরেক রকমের নমুনা কারবারীদের দোকানে দোকানে মজুদ রহিয়াছে, সে

আসল চিজটি কি? মূল বস্তুটি কি? তত্বটি কি? সেই আসলটি আবিষ্কার করিতে পারিলেই সেই Common denominatorটি বাহির করিতে পারিলে, আমরা সৃষ্টির গোড়াকার সেই বিরাট মনের রূপটি ধরিয়া ফেলিতে পারিলাম।

আসলটি চিনিয়া ফেলার উপায় হইতেছে দুইটি—দোকানে দোকানে ঘুরিয়া যাচাই করিয়া দেখিতে হয়, এই হরেকরকম মালের মিলই বা কোন জায়গাটায় আর গরমিলই বা কোন জায়গাটায়। সকল নমুনার সাদৃশ্য যেখানটায়, সেইখানেই হইল আসলের স্থান। তবে এভাবে আসলকে চিনিয়া বাহির করিতে হইলে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বিস্তর মেহনৎ করিতে হয় এবং খাটিয়া হয়রাণ হইতে হয়। শেষ পর্যন্ত হয় ত ধরি ধরি করিয়াও আসলটিকে ধরিতে পারিনা। পাশ্চাত্ত্য দেশের বিজ্ঞানবিদ্যা এইরকম ধারা ঘুরিয়া, এক দোকানের নমুনা অন্য দোকানে যাচাই করিয়া, আসলটি বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কস্মিনকালেও আসল ধরা পড়িবে কিনা, তা ভবিতব্যতাই বলিতে পারেন। ইহারই নাম হইল Inductive Method। শ, দুই আড়াই বছর হইতে বাজারে ইহার বড়ই পশার হইয়াছে, সম্প্রতি পশার একটু কমিবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। আসল ধরিবার অপর উপায়টি হইতেছে—"ডুব দে রে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে। রত্নাকর নয় শূন্য কখন দু চার ডুবে ধন না মেলে। তুই দম সামর্থ্যে ডুব দেরে মন, কুল কুণ্ডলিনীর মূলে"। নমুনা হাতে করিয়া দোকানে দোকানে ঘুরিয়া হয়রাণ হওয়ার আবশ্যকতা নাই, নিজের ঘরে বসিয়াই নিজের নমুনা লইয়াই গুরূপদেশ মত নাড়াচাড়া করিতে থাক; নমুনাটিকে ঘষিয়া মাজিয়া ঝাড়িয়া লও। কাঁচা মাল হইলে একটুখানি জাল দিয়া পাকা করিয়া লও। দেখিবে তোমার নমুনার ভিতরেই সেই আসল ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বড় বেশী গরজী হইলে চলিবে না, সবুরে মেওয়া ফলাইতে হইবে। আমাদের দেশের বাউল কর্তাভজারা তাহাদের দেহ-তত্ত্বের গানে আসলটি নিংড়াইয়া বাহির করার কৌশল খাসা করিয়া শুনাইয়া দিয়াছেন। এই দেহের খোলায় কি জানি কোন রসের পাক হইতেছে, কিসের জ্বালে পাক, তাহা গুরুই জানেন কিন্তু গাদ উঠিতেছে বিস্তর। সকল গাদ কাটিয়া গিয়া জানিনা কবে এই খোলার রস সাফ্ হইয়া যাইবে! খোলার ভিয়ান চাপাইয়া বেশী গরজী হইতে না কি গুরুর নিষেধ, যেমনটি রয় সয়, যেমন করিলে সহজে হয়, তেমনি ভাবে চলিতে গুরুর আজ্ঞা। এ প্রসঙ্গে এ কথার আর বিস্তার করার আবশ্যকতা নাই; তবে আমরা দেখিতেছি যে আসলটি ধরিয়া ফেলার একটি "ঘরাও" ফন্দিও আছে, সকল দেশেই আছে, আমাদের এই ঋষিমহাজনজুষ্ট কর্মভূমিতে বিশেষভাবে। ভূতটিকে গিলিয়া হজম করার ব্যবস্থা হইল এইরূপ। ভূতটিকে উগলাইয়া ফেলার ব্যবস্থা করিয়াছেন সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র। তাঁরা বলেন, ও ভূত ত তুমি নও, মিছে ও ভূতের বোঝা তুমি বহিতেছ কেন—ভূতের ময়লা তুমি গায় মাখিতেছ কেন? ভূত ও ভূতের গর্ভধারিণী প্রকৃতিকে তুমি বনবাস দাও, তুমি

যেমন একা ছিলে তেমনি একা থাক "কেবল" হও, দেখিবে তুমি শুদ্ধ নিরঞ্জন চৈতন্য মাত্র। তুমি কর্তা নও, ভোক্তা হবারও প্রয়োজন নাই ইহাকে বলে প্রকৃতি—বিবিক্ত—"পুরুষ সাক্ষাৎকার"। এইটিই হইলে নাকি মোক্ষ হয়। এ সিদ্ধান্তে ভূতটিকে গিলিয়া ফেলার ব্যবস্থা নাই, কেননা পারা যেমন হজম হয়না, ভূতও সেইরূপ হজম হয় না, জোর করিয়া খাইলে গরহজম হয়, সে গরহজমের ফল হইতেছে ত্রিতাপ, যে ত্রিতাপে আমরা সংসারের জীব নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি। যাহা কিছু উদরস্থ হইয়াছে তাহা উগলাইয়া ফেলাই সুযুক্তি।

সে যাই হোক, এ সিদ্ধান্তে সৃষ্টির গোড়ায় কোনও রকম একটি বিরাট মন আমরা পাইনা—যে মন হইতে সঙ্কল্প জাগিয়া এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু তিনি "ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ"। সৃষ্টির মালিক তিনি মোটেই নন। হাল বাঙ্গালী সাংখ্যদর্শনে ত প্রমাণের অভাব বলিয়া ঈশ্বর অসিদ্ধ।

কাজেই এই সিদ্ধান্তে সৃষ্টির সূচনাতেই একটি বিরাট মন এবং সেই মনের সঙ্কল্প কামনা ইত্যাদি করা চলে না; কেননা সেরকম কল্পনা করিতে গেলে ঈশ্বরকে টানিয়া আনা হইল, যে ঈশ্বর সাংখ্য-শাস্ত্র-তত্ত্বাবলীর নূতন বৈঠকে বসিবার জন্য এককোণে একখানা ভাঙ্গা ইঁটও পান নাই। অথচ সাংখ্য-শাস্ত্র হইতেছে আস্তিক দর্শন—ঈশ্বর মানে বলিয়া আস্তিক নহে, বেদ বা শ্রুতি মানে বলিয়া আস্তিক। এখন বেদে সৃষ্টির গোড়ায় কাম, সঙ্কল্প-তপস্যা, ঈক্ষা, এ সকলই আছে আমরা দেখিয়াছি। নিরীশ্বর সাংখ্যকে এ সকল লইয়া কিঞ্চিৎ ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের পুরাণগুলি সৃষ্টি প্রকৃতি বর্ণনায় অনেকটা সাংখ্যের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন; স্বয়ং গীতাও সেই দিকে ঝুঁকিয়াছেন দেখিতে পাই। কিন্তু "সাংখ্যযোগ" আর "সাংখ্যদর্শন"—একজিনিষ নহে। বলাবাহুল্য যে, যেমন ধারা গীতায় ঈশ্বর বাদ যান নাই, পুরাণগুলিতেও তেমনি ধারা ঈশ্বর বাদ পড়েন নাই, বরঞ্চ গোড়াকার সেই একই তত্ত্ব সৃষ্টি কামনায় নিজেকে দুই করিয়া সব পয়দা করিয়াছেন। লয়েও বিলোম ব্যবস্থা। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—"অত্রত্য পুরুষে ব্রহ্মণিষ্কলে সম্প্রলীয়তে"।

আমরা দেখিলাম যে, ঋগ্‌বেদ সংহিতা দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে যে মনের কাম ও রেতের কথা বলিয়াছেন সে মনের হিসাবই আলাদা। তবে আমাদের এই মন লইয়াই গোড়াকার সেই মনটিকে ধরিতে বুঝিতে হয়। বিশেষতঃ গোড়াকার কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধে কোন কিছু-বলা-কহা করিতে গেলে, আমাদের আপন হিসাব লইয়াই বলা-কহা করিতে হয়। ইহাতে যদি—"anthropomorphism" হয় ত নাচার। জড়বাদীর হিসাবের চাইতে চিদ্‌বাদীর হিসাব পাকা। সে কথা আজ ও-দেশের দার্শনিক বলিয়া নয়, খোদ বৈজ্ঞানিকেরাও বুঝিতেছেন। Matter and Motion লইয়া আর

কোনমতেই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া লেখা চলিতেছে না। জড়ের চাইতে প্রাণ, প্রাণের চাইতে মন খাঁটি আসল তত্ত্ব। শক্তির দিক দিয়া এই কথা। শক্তির মূল মালেক হইতেছে আত্মা, অথবা আত্মার প্রতিনিধি অন্তঃকরণ। আত্মায় বা চৈতন্তে যেটি স্বতন্ত্র শক্তি, মূল মালিকানা স্বত্ব, অন্তঃকরণে সে মূল স্বত্বের পত্তনি-স্বত্ব বর্তিয়াছে, প্রাণে দরপত্তনি এবং জড়ে ছে-পত্তনি। আমাদের সাধারণ হিসাবের নিম্ন আদালতে ইহাদের মধ্যে এইরূপ স্বত্ব সাব্যস্ত হইয়া যাইতেছে; তত্ত্ববিদ্যার উচ্চ আদালতে আপীল করিলেও এ বন্দোবস্ত একেবারে উল্টাইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। তবে সে আদালতের রায় একটু অদ্ভুত রকমের হইতে পারে। উচ্চ আদালতের রায়—কেন, তোমরা মিছে ঝগড়া করিতেছ, মূলে তোমরা যে সকলে একই বস্তু, অদ্বয় ব্রহ্মবস্তু, যে ভূত সেই প্রাণ, সেই মন, যে মন সেই আত্মা। একই মূল মালেক নানান মুখোস পরিয়া বিভিন্ন বাদী এবং নিজেই প্রতিবাদী; তিনি নিজেই মূল মালেক এবং নিজেই পত্তনিদার, দরপত্তনি ছে-পত্তনি প্রভৃতি এহাত ওহাত করিবার, বেনামী করিবার ফিকির বই আর কিছু নয়। পাশ্চাত্য দেশেও সম্প্রতি উচ্চ আদালতে মামলা রুজু করিয়া দিয়াছে; বড় বড় জাঁদরেল পণ্ডিতের সওয়াল জবাব একরকম প্রায় শেষ হইতে চলিল; এখন জজ উঠিয়া গিয়া তাঁর খাস কামরায় বসিয়া যে কি রায় লিখিবেন, তাই শুনিতে সকলে উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ভিতরকার খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা রায় অনেকটা আঁচও করিতে পারিতেছেন; রায় আর কিছুই নয়—"সর্ব্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানীতি; শান্তম্ উপাসীত"—ছান্দোগ্য শ্রুতির সেই প্রসিদ্ধ মন্ত্র। জড়ের ভিতরে জড়শক্তিরূপে প্রাণীর ভিতরে প্রাণশক্তিরূপে—বুদ্ধিজীবির ভিতরে চিৎশক্তিরূপে যে মূল তত্ত্বটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে তত্ত্বটি বৃক্ষের মূল কাণ্ডটির মত একই—নানা নহে; শাখা-প্রশাখা যতই বিবিধ বিচিত্র হ'ক না কেন, তাদের উদ্গম হইয়াছে, এবং তাদের নির্ভর রহিয়াছে, একই মূল কাণ্ডের স্কন্ধে।

গোড়াকার সেই মূল কাণ্ডটিকে বেদ "মন" বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এই-জন্যই বেদমন্ত্রে "মনসো রেতঃ" এই পদটি আমরা দেখিতেছি। আমরা দেখিলাম যে, এই মন আমাদের সব ছোট ছোট মনের কেবল যে সমষ্টি এমন নয়, এদের আদর্শ এবং মূল স্বরূপ (Prototype)। আমাদের মনের নমুনা দিয়া সে মন বুঝিতে হইলে, কতকটি নিষেধ মুখে "নেতি নেতি" করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা হয়। যেমন, আমাদের মন ছোট; সে মন ছোট নয়; আমাদের মন পরিমিত, সে মন পরিমিত নয়; আমাদের মন পরাধীন (অবশ্য একান্তভাবে নয়), সে মন পরাধীন নয়; আমাদের মনে আনন্দস্বরূপ ও লীলাস্বরূপ যেমন ঢাকা পড়িয়াই রহিয়াছে (অবশ্য একেবারে ঢাকা পড়ে নাই); এ মন হইতেছে কার্য; সে মন কার্য নয়, কারণ, আমাদের মন হইতেছে বিকৃতি, সে মন হইতেছে প্রকৃতি; আমাদের মন হইতেছে নমুনা, সে মন হইতেছে আসল; আমাদের মন হইতেছে কলা,

সে মন হইতেছে পূর্ণ। এইরকম ধারা আমাদের মনের চারিধারে যা কিছু গণ্ডী রহিয়াছে সে গণ্ডীগুলি দূর করিয়া দিয়া সেই মনকে আমাদের ধারণা করিতে চেষ্টা করিতে হয়। আমাদের মনের কাম, সঙ্কল্প প্রভৃতির দ্বারা ঈশ্বরের সিসৃক্ষা এবং সৃষ্টিকল্পনা এই প্রণালীতে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়। দুইদিক বাঁচাইয়া হুঁসিয়ার হইয়া আমাদের চলিতে হইবে।—একদিকে এমন ভাবিলে চলিবেনা যে, গোড়ায় মন টন বলিয়া কিছুই ছিলনা, কেবল জড়ই ছিল, অথবা রাত্রি ছিল, মন প্রাণ ইত্যাদি সব পরে দেখা দিয়াছে। এইটেই হইল জড়বাদ বা অজ্ঞেয়বাদ। বেদে জড়বাদ ত নাই-ই, অজ্ঞেয়বাদ যে আকারে আছে সে আকার দেখিয়া, সেটিকে পাশ্চাত্য agnosticism অথবা sepcticism মনে করা কোন ক্রমেই চলে না। ঋগ্‌বেদের সেই "নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ" ইত্যাদি মন্ত্রের মানেও ওরকম ধারা নয়, তা আমরা অন্যত্র দেখিয়াছি। এই গেল একদিকের কথা। অন্যদিকে, আমাদের এও ভাবিলে চলিবে না যে, গোড়াকার সেই মনটি এবং তাহার কাম রেতঃ প্রভৃতি ঠিক আমাদের এই "আটপৌরে" মনের এবং তাহার বৃত্তিগুলির মতন একটি কিছু। আসলে যে তাহা সেরূপ নয়, তা আমরা কটাক্ষে দেখিয়া লইলাম। বেদমন্ত্রের ভিতরের কোঠায় আমরা এই সবে একটুখানি উঁকিঝুঁকি মারিয়া দেখিতেছি।

কাম এবং রেতের মধ্যে আত্যন্তিকভাবে কোন্‌টি যে আগে এবং কোন্‌টি যে পরে, কোন্‌টি যে কার্য এবং কোন্‌টি যে কারণ তা নিরূপণ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে বীজাঙ্কুরের ন্যায় কল্পনা করাই ভাল। সৃষ্টির ধারা অনাদি, সৃষ্টির মূলীভূত কাম এবং রেত: এই দুইই হইতেছে শক্তির দুইটি অবস্থা ; তার মধ্যে কাম হইল শক্তির ব্যক্ত অথবা পরিস্ফুট অবস্থা (Kinetic Condition), আর রেতঃ হইল শক্তির অব্যক্ত অবস্থা বা অস্ফুট অবস্থা (Potential Condition)। একটি ছাড়িয়া যে অপরটা থাকেনা, তা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। জড়ে প্রাণে ও মনে সর্বত্রই এই দুই আকারে শক্তির খেলা চলিতেছে। তলাইয়া দেখিতে গেলে এ ব্যাপারটিও হইতেছে ছিন্নমস্তার অভিনয়। রেতোরূপিণী শক্তি নিজেকে কামরূপে অভিব্যক্ত করিয়া, আবার সেটিকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিতেছে। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মূল ব্যাপারটিও তাই। কামের 'বর্ণ' হইতেছে লাল, এই জন্য কামের অভিব্যক্তিকে আমরা রুধিরস্রাবরূপে সহজেই কল্পনা করিতে পারি। ছিন্নমস্তাভিনয়ের মূল রহস্য যে ইহাই তা আমরা ছিন্নমস্তার পদতলে রতিকামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই বুঝিতে পারি। প্রকৃত প্রস্তাবে দেবীর পদতলে যেটা রহিয়াছে সেইটাই হইল তত্ত্বের প্রকৃত চেহারা ; আর দেবী নিজে হইতেছেন সেই তত্ত্বেরই রহস্য অথবা সাঙ্কেতিক মূর্তি। সত্য সত্যই পদতলের দিকে তাকাইয়াই তত্ত্বের রহস্য আমাদের বুঝিতে চেষ্টা করিতে হয়। গণপতি বিনায়কের বাহন হইতেছেন ইঁদুর। ঐ নেংটি ইঁদুরকে তুচ্ছ করিলে আমাদের চলিবেনা। ঐ ইঁদুরের সাহায্যেই আমরা গণপতি রহস্যের গোপন কক্ষে লব্ধ-প্রবেশ হইতে পারি। ঐ ইঁদুরটি ঐখানে না থাকিলে আমরা রহস্যের কোনই

কুলকিনারা করিতে পারিতাম না। ইনি সাক্ষাৎ কালরূপী শ্বাসানিল। দেবীর বাহন সিংহ, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, ব্রহ্মার বাহন হংস—এইরকম ধারা সকল রহস্য প্রতীক বুঝিতে হইলে আমাদের ঐ বাহনটির পানে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়। কালীর পদতলে শব-শিব রহিয়াছেন বলিয়াই আমরা কালীর কালরূপের ভিতরেও নিগূঢ় তত্ত্বের আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত দেখিতে পাই; নহিলে সে কালরূপের অকূলে আমরা আদপেই যাইতে পারিতাম না। ঋষিরা এক একটি রহস্য-সঙ্কেত বা প্রতীক ধ্যান করিয়া একপাশে চাবিকাটিটির মত তার গূঢ় মর্মের ইঙ্গিতটি ফেলিয়া রাখিয়াছেন। গণেশ মূর্তির রহস্য-গুহা উদ্ঘাটন করিতে হইলে যে চাবিকাটিটির সাহায্যে আমরা উদ্ঘাটন করিতে পারিব, সে চাবিকাটিটি ঐ মূষিকরূপে ধ্যান করিয়া ঐ ধ্যানের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ মূষিকও আমাদের মহাপূজার একজন বখরাদার।

ছিন্নমস্তার পদতলে যেটি রহিয়াছে, তারই পানে সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমরা এই "বিপরীত" রতে রতা রতি-কামকে জড়, প্রাণ এবং মন এই ত্রিবিধ পদার্থের অন্দর-মহলেই গোপনে বিহার করিতে দেখিতেছি, এমন কি অণুর অন্দর-মহলে পর্যন্তও। বেদমন্ত্র যে কাম এবং রেতের কথা বলিলেন, সেই কাম এবং রেতঃকেই আমরা পরস্পরের সহিত বিহারে প্রবৃত্ত দেখিতেছি। শক্তির অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত ফুটিয়া ওঠে, এই হিসাবে অব্যক্ত শক্তি হইতেছে জননী, আর ব্যক্ত হইতেছে অপত্য। পক্ষান্তরে আবার ব্যক্ত শক্তি হইতে অব্যক্ত শক্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। জোর করিয়া একটি ধনুকের ছিলা পরাইয়া দিলে এই রকম ধারা একটি ঘটনা ঘটে। আমি যে জোরটুকু ধনুকের উপর প্রয়োগ করিলাম, সে জোর গেল কোথায়? লোপ পাইল কি? না; শক্তির অক্ষর, শাশ্বতী তনু। সে বলটুকু ছিলা পরাণ ঐ "ধনুকের" ভিতরেই অব্যক্তভাবে থাকিয়া গেল। যদি কোন কারণে ধনুকের ছিলা আবার খসিয়া যায়, অথবা কেহ যদি ছিলাটি কাটিয়া দেয় তবে, সেই গোপন শক্তি আবার প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এইভাবে দেখিতে গেলে ব্যক্ত হইল অব্যক্তের জনক। এ কথাটায় খেয়াল রাখিলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব, কেন বেদের ঋষিরা ইন্দ্র অথবা অগ্নিকে আপন আপন মাতৃগণের জনকরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কথাটা শুনিতে হেঁয়ালি মত, কিন্তু এ হেঁয়ালি সৃষ্টির সর্বত্র সদাক্ষণ চলিতেছে। এ হেঁয়ালির শেষ এইখানেই নয়।

এক হিসাবে যে দুইটির ভিতরে মাতাপুত্রের সম্বন্ধ, অন্য হিসাবে দুইটির ভিতরে আবার স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক। ক হইতে খ জন্মিতেছে; জন্মিয়া ক-কে উপভোগ করিতেছে। সমঝদারের পক্ষে এতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। শক্তি লইয়া যেখানে কথাবার্তা সেখানে নানান দিক দিয়া নানান সম্পর্ক পাতাইয়া কথাবার্তা চলিতে পারে। প্রাচীন পুরাণকারের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যত সব অদ্ভুত কল্পনা, সে সব একেবারে আজগুবি বলিয়া উড়াইয়া দিবার আবশ্যক নাই। পুরাণে এমন কথা আছে, আদ্যাশক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিনজনকে

গর্ভে ধারণ করিয়া প্রসব করিলেন। পরে নিজেই আবার তিন দফা শক্তি সাজিয়া নিজের সেই সন্তান তিনটিকে পতিভাবে ভজনা করিলেন। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে ব্রহ্ম সৃষ্টি কামনায় নিজেকে দুই করিলেন ; সে রমণের ফলে নিখিল প্রজাবর্গ সৃষ্টি হইল— এই রকম কথা দেখিতে পাই। পুরাণকারের আগেকার ঐ কল্পনা এবং শ্রুতির কল্পনা মূলে একই ছাঁচে ঢালাই।

তত্ত্বটি সোজাসুজি বুঝিতে গেলে এইরূপ—শক্তি অথবা শক্তিমান্ একই অখণ্ড অদ্বৈত সত্তা। সেই সত্তা হইতেই সৃষ্টি স্থিতি লয়ের অভিনয় চলিতেছে। সেই অখণ্ড অদ্বিতীয় সত্তাকে বহুধা বিভক্ত করিতে গেলে, নিজেকে নানাভাবে বিভক্ত করিতে হয় ; আমরা সৃষ্টির ব্যাপারের মাঝে যত প্রকার সম্বন্ধ দেখিতে পাইতেছি সেই সকল রকম সম্বন্ধেই তাঁকে নিজেকে বিভক্ত করিতে হয়। তিনিই যখন এ কারবারের মূল কারবারী, এ সংসারের মূল সংসারী তখন তাঁকে এই সংসার পাতিবার জন্য শুধু এক সম্পর্কেই সেটি পাতিলে চলিবে কেন, শুধু মা ও ছেলে হইয়া বসিলেই চলিবে কেন, স্বামী ও স্ত্রীও তাঁহাকে সাজিতে হইবে।

এইরকম ধারা অশেষ সম্পর্ক পাতাইয়া নিজে নিজেই সাজিয়া না বসিলে, এই বিরাট বিচিত্র সংসারে আসর জমিয়া উঠে কি করিয়া ? গাছের বীজ যদি সঙ্কল্প করিয়া থাকে—আমি বীজ হইয়াই থাকিব, নিজেকে আর কিছু হইতে দিব না, তাহা হইলে বীজ হইতে গাছের জন্ম হইতে পারে কি ?

গাছের জন্ম হইতে গেলে বীজকে দুই ভাগে কেন, নিজেকে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করিতে হয় এবং সেই অসংখ্য রকমের সম্পর্ক পাতাইয়া লইতে হয়। গাছের মূল কাণ্ড শাখা প্রশাখা পাতা ফুল ফল—এ সকল কতই না বিচিত্র এবং এদের সম্পর্কও কত না বিচিত্র রকমের। যে মূল বস্তু এই সৃষ্টিরূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁকেও এই বৈচিত্র্যের খাতিরে নিজেকে নানান সাজে সাজাইতে হইয়াছে ; কখনও বা মা ও ছেলে, কখনও বা স্বামী ও স্ত্রী, এই রকম আরও কত কি ! যিনি কারণ রূপে কার্যকে প্রসব করিতেছেন, তিনিই আবার ভোক্তা হইয়া সৃষ্টকে ভোগ করিতেছেন।

ঋগ্‌বেদ সংহিতার (৬।৪৭।১৮) সেই—

"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্য রূপং প্রতি চক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে, যুক্তাহ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ॥"—স্মরণ করা উচিত।

যে বেদমন্ত্রে কাম ও রেতের কথা আছে তার পরের মন্ত্রে এই কথা কয়টি রহিয়াছে— "রেতোধা আসন্ মহিমান আসনৎ স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ॥"—(ঋগবেদ্, ১০ম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত পঞ্চমী ঋক)। সেই মূল তত্ত্ব কেবলমাত্র যে রেতঃ অথবা বীজস্বরূপ এমন নহে ; আমরা ত আগেই বলিলাম, বীজ সঙ্কল্প করিয়া বীজ হইয়াই থাকিলে তা হইতে গাছ জন্মে না। এইজন্য যেটি রেতঃ সেটি শুধু রেতঃ হইয়াই রহেন নাই। পুরুষের

দেহে রেতোরূপী যে বীজটি রহিয়াছে, সেটি নারীর যোনিতে নিষিক্ত হইয়াও যদি বীজ-রূপেই থাকিয়া যায়, তবে তা হইতে সন্তানের উৎপত্তি হয় না। এইজন্য মূল তত্ত্বটি রেতঃ হইয়াও নিজেকে নানা ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিতেছেন। একভাগে তিনি হইয়াছেন "রেতোধা"—অর্থাৎ রেতোকে যিনি ধারণ করিয়া থাকেন। বেদ এই রকম রেতোধার অন্য নাম দিয়াছেন—"বৃষ"—যিনি বর্ষণ করেন। মূলতত্ত্ব এইভাবে রেতোধা অথবা বৃষ সাজিয়া এই সৃষ্টির ব্যাপারটি চালাইতেছেন। জড়, প্রাণে মনে সর্বত্র এই ভগবান্ বৃষকে আমরা বিচরণ করিতে দেখিতে পাই। একটা চুম্বকের কাছে খানিকটা ইস্পাত আনিলে চুম্বক হইতে একটা শক্তি বাহির হইয়া আসিয়া ইস্পাতের ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার ফলে ইস্পাতও চৌম্বক শক্তিবিশিষ্ট হইল; অর্থাৎ নিজের ভিতরে চুম্বকের সংসর্গে লোহার "অন্তঃসত্ত্বা" হওয়ার ঘটনা বলিয়া সহজেই মনে করিতে পারি। চুম্বক এক্ষেত্রে হইলেন ভগবান্ বৃষ অথবা রেতোধা। যতক্ষণ তার ক্ষেত্র লৌহ নিকটে নাই ততক্ষণ তার ভিতরে শক্তিটি অব্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে। ক্ষেত্র নিকটে উপস্থিত হইলে সেই অব্যক্ত শক্তি অর্থাৎ রেতঃ কামরূপে অভিব্যক্ত হয়। সেই কামের অভিব্যক্তির ফল আমরা দেখিতে পাই চুম্বকের লৌহকে আকর্ষণ। এই আকর্ষণের ভিতর দিয়া চুম্বকের রেতঃ অভিব্যক্ত হইয়া লৌহের ভিতর গিয়া প্রবেশ করে; লৌহের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে শক্তি আবার অব্যক্ত অথবা রেতঃরূপে থাকিয়া যায়। চুম্বকের প্রভাবান্বিত লৌহের নিকট অপর আর একখানা ইস্পাত আনিলে সে ইস্পাতখানা হয় ক্ষেত্র, আর চুম্বক ধর্ম-বিশিষ্ট আগেকার সে ইস্পাতখানা হয় বৃষ অথবা রেতোধা। এক্ষেত্রে আমরা দেখিতেছি, পহেলা নম্বরের বৃষ হইতেছেন খোদ চুম্বক, আর দোসরা নম্বরের বৃষ হইতেছেন তৎ-প্রভাবান্বিত ইস্পাতখানা। যেমনধারা একটা দীপ হইতে অপর একটি দীপ জ্বালাইয়া লইতে পারা যায়, তেমনিধারা একটী বৃষ বা রেতোধা হইতে অপর একটা বৃষ বা রেতোধা সম্ভব হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সেই এক মূল বৃষ হইতে অসংখ্য বৃষের সৃষ্টি হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে রেতোনিষেক চলিতেছে।

আমরা জড়ের রাজ্য হইতে একটা দৃষ্টান্ত লইলাম; আরও অনেক দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যাইতে পারে কেমনধারা সেই মূল বৃষ জড়জগতের সর্বত্রই সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছেন। জল রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কিছুই সৃষ্টি হইতেছে না। যেই সেই জলের ভিতরে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগ হইল, অমনি সেই জড়ের মর্মস্থলে একটা গভীর চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিল। জল আর জল হইয়া থাকিতে পারিল না; তাকে দুই হইতে হইল: অক্সিজেন হাইড্রজেন গ্যাসে পরিণত হইতে হইল। এ দৃষ্টান্তে, যাহা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি আসিতেছে সেটি হইল বৃষ, আর জল নিজে হইল সেই বৃষের ক্ষেত্র। বাতাসে খানিকটা বাষ্প মিলাইয়া রহিয়াছে। এখনও জমাট বাঁধিয়া মেঘ হয় নাই। যতক্ষণ না অগ্নি তাড়িৎশক্তিরূপে সেই বাষ্পরাশির মধ্যে নিজের "বীর্য"

সেচন করিবেন ততক্ষণ সেই বাষ্প নিষ্ফল হইয়াই থাকিবে। বিদ্যুৎকণাগুলিকে কেন্দ্ররূপে না পাইলে জলীয় বাষ্পের বিন্দুরূপে জমাট বাঁধা হয় না একথা বৈজ্ঞানিকেরা ভালমতই জানেন; এবং আমরাও "বেদ ও বিজ্ঞান" গ্রন্থে সে কথা ভাঙ্গিয়া বলিয়াছি। এ দৃষ্টান্তেও বিদ্যুৎরূপী অগ্নি হইতেছেন বৃষ। আর জলীয় বাষ্প হইতেছে সেই বৃষের ক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রে বৃষ আপন রেতঃ সেচন করিয়া থাকেন। বেদের মধ্যে নানান জায়গায় আমরা এই তত্ত্ব কথাটি শুনিতে পাই। কোন জায়গায়—দেখি, অগ্নি শিশুরূপে গর্ভে বিরাজ করিতেছেন, দেবতারা তাঁকে খুজিয়া পাইতেছেন না। এখানে অপ্ হইতেছে অগ্নির মাতৃস্থানীয়া। আবার অপর কোনো কোন জায়গায় দেখিতে পাই, অগ্নি বৃষরূপে অপের গর্ভে আপন রেতঃ সেচন করিতেছেন। তারফলে মেঘ ও বৃষ্টি হইতেছে।

কথাটি হেঁয়ালির মত শোনায় কিন্তু কথাটি যে ঠিক তা আমরা "বেদ ও বিজ্ঞান" গ্রন্থে খোলসা করিয়া বলিয়াছি। কেবল জড় বলিয়া কেন, বিশ্বের ভিতরে বাহিরে, সদরে অন্দরে সর্বত্র বিশ্বনাথের "বাহন" বৃষভরাজ অবাধগতি, সর্বত্রগ হইয়া বেড়াইতেছেন।

বজ্রের কথা

বেদের অনেক যায়গায় গল্প আছে যে, বৃত্র বা অহি জলরাশিকে রোধ করিয়া রাখিয়াছিল,—চলিতে বা পড়িতে দেয় নাই। ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা বৃত্র বা অহিকে সংহার করিয়া জলরাশি মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তারা অবাধে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এখানে প্রশ্ন দুইটি—প্রথম সে জলরাশি রোধকারী অসুরটি কে? দ্বিতীয় ইন্দ্র যে বজ্রের দ্বারা সে অসুরটিকে বধ করিযাছিলেন, সে বজ্রই বা কি? আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে মেঘ হইলেই বৃষ্টি হয় না। অথচ মেঘ অগণিত জলবিন্দুর সমষ্টি, শূন্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। একটু জমাট বাঁধিয়া মোটা মোটা দানা বা ফোঁটা হইয়া পড়িতে তাদের বাধা কি? অথচ পড়ে না কেন? কোন একটা নৈসর্গিক শক্তি তাদের যেন ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, পরস্পর আলাদা করিয়া রাখিয়াছে; সংহত হইতে ও জমাট বাঁধিতে দিতেছে না। সেই নৈসর্গিক হেতুটিই হইতেছে বৃত্র। এ কথা আগের "বেদ ও বিজ্ঞান"-এ সবিস্তারে বলিয়াছি। মেঘে মেঘে যখন বিজলী খেলিয়া যায়, তখন তার ফলে যে কেমন-ধারা মেঘের দানাগুলি মিলিয়া জমাট বাঁধিয়া থাকে—সে বিবরণ বৈজ্ঞানিক আমাদের অনেকদিন হইল শুনাইয়া রাখিয়াছেন। বেদের ভাষায় বলিতে গেলে বৃত্রাসুর যেন মেঘের জলরাশিকে রোধ করিয়া রাখিয়াছে, চলিতে বা পড়িতে দিতেছে না; বজ্রায়ুধ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা সে অসুরকে নিহত করিয়া মেঘরূপী জলরাশিকে যেন মুক্ত করিয়া দিতেছেন, সে জলরাশির চলিবার বা ভূতলে পড়িবার বাধাটি দূর করিয়া দিতেছেন। এ'ত গেল আধিভৌতিক স্তরের ব্যাখ্যা। Nature myth, Vegetation myth ইত্যাদির পাণ্ডারা অনেকটা এইভাবেই কৈফিয়ৎ দিবেন।

বৃত্র যে কেবল মেঘের মধ্যে লুকাইয়া আছে এমন নহে। বজ্র যে কেবল জলদ-পটল-বিহারী বৃত্রাসুরের প্রতি উদ্যত হয় এমন নহে। বৃত্র নিখিল পদার্থেই বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং নিখিল পদার্থের ভিতরেই বৃত্র-সংহারের অভিনয় আবহমান কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। একটা ধূলিকণার ভিতরেও বৃত্র ইন্দ্র ও বজ্র এই ত্রিতত্ত্বই রহিয়াছে। জীবকোষে অথবা আমাদের অন্তঃকরণে এই ত্রিতত্ত্বই যে রহিয়াছে, সে বিষয়ে মোটেই সন্দেহ করা চলে না। যে শক্তিটি বাধা বা চাপ দিয়া ধূলিকণাটিকে সামান্য একটা ধূলিই করিয়া রাখিয়াছে, তার চাইতে বড় একটা কিছু হইতে দিতেছে না, সেই শক্তি হইতেছে বৃত্র। এবং সে বৃত্র যে তপঃশক্তির বিরোধী শক্তি তাহাও আমরা সহজে বুঝিতে পারি। মজার কথা এই যে, বৃত্রের উদ্ভবও একটা তপস্যা হইতে। তপস্যা হইতে জন্মিয়া সে তপস্যার বৈরী হইতেছে। যে তপস্যা হইতে তার উদ্ভব সে তপস্যার

মন্ত্রতন্ত্র এক হইতে গিয়া আর এক হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং শক্তি-ব্যূহরূপ যন্ত্রটিও এক না হইয়া আর এক হইয়া পড়িয়াছিল। সাদা কথায়, বেচাল বা বেতাল তপস্যা হইতে তপস্যার অন্তরায় সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য পুরাণকার সেই "ইন্দ্রশত্রুর" আখ্যায়িকা আমাদের শুনাইয়া গিয়াছেন। ইন্দ্রের উপর রাগ করিয়া কোন এক ঋষি ইন্দ্রের একজন প্রবল শত্রু সৃষ্টি করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সঙ্কল্পপূরণের জন্য তাঁকে অবশ্য যজ্ঞ করিতে হইল। কর্মের কৌশলকে যেমন যোগ বলে, তেমনি আবার প্রাচীনেরা তাকে যজ্ঞও বলিতেন। কৌশল ছাড়া কোনও কর্মেই সিদ্ধি হয় না। যজ্ঞে সেই কৌশলটির নাম মন্ত্র-তন্ত্র। কৌশলটি ঠিক হইলে মন্ত্র-তন্ত্র অবশ্য ঠিক হইল; মন্ত্র-তন্ত্র ঠিক হইলে যজ্ঞ বা শক্তিব্যূহ ঠিক হইল; আর যন্ত্র বা শক্তিব্যূহ ঠিক হইলে ফল বা সিদ্ধি না হইয়া যায় না। কিন্তু কৌশলের কলটি যদি বিগড়ায়, তবে উল্টা উৎপত্তি হইতে পারে। বৃত্রাসুরের জন্মে তাই হইয়াছিল। ঋষি ইন্দ্রকে জব্দ করিবার জন্য যজ্ঞরূপ কৌশলটি ত' করিলেন; কিন্তু সে কৌশলের কলটি বিগ্‌ড়াইয়া বসিল; মন্ত্র-তন্ত্র ঠিক না হইয়া বেঠিক হইয়া পড়িল। ঋষি "ইন্দ্রশত্রু" বলিয়া যজ্ঞে হোম করিতে লাগিলেন, কিন্তু "ইন্দ্রশত্রু" এই কথাটি যেখানে যেমন স্বর দিয়া উচ্চারণ করা আবশ্যক, তেমন স্বর দিয়া তিনি উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। ইন্দ্রশত্রু এ শব্দটি তৎপুরুষ সমাস, আবার বহুব্রীহি সমাসও হইতে পারে—ইন্দ্রের শত্রু এই একরকম.—ইন্দ্র হইয়াছে শত্রু যাহার, এই আর একরকম। বলা বাহুল্য বৈদিক শিক্ষার নিয়ম অনুসারে এই দুই স্থলে শব্দটির স্বরবিন্যাস দুইভাবে করিতে হয়। তৎপুরুষের বেলায় যেখানে জোর দিয়া শব্দটি উচ্চারণ করিতে হয়, বহুব্রীহির বেলায় সেখানে জোর দিয়া উচ্চারণ করিলে দোষ হয়। এমন কি কোথায় জোর পড়িয়াছে, সেইটি দেখিয়াই বুঝিতে হয় শব্দটি তৎপুরুষে নিষ্পন্ন অথবা বহুব্রীহিনিষ্পন্ন। এখন, ঋষি যজ্ঞে আহুতি দিবার কালে "ইন্দ্রশত্রু" এই কথাটি এমনভাবে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, যাহাতে ইন্দ্রের শত্রুর বধ হউক এ না বুঝাইয়া, ইন্দ্র যার শত্রু তার বধ হউক ইহাই বুঝাইতে লাগিল। ঋষি ভাবিলেন এক, আর উৎপত্তি হইল আর এক। স্বরের অপরাধবশতঃ এইরূপ উল্টা উৎপত্তি হইয়া বসিল। ইহারই নাম কৌশলের কলটি বিগড়াইয়া যাওয়া। যজ্ঞে উচ্চারিত মন্ত্রের স্বরবৈকল্য ঘটিলে, সে মন্ত্র বাগ্‌-বজ্র (শতপথ ব্রাহ্মণ ইত্যাদিতে বহু স্থলে) রূপে পরিণত হইয়া থাকে; এবং অনুষ্ঠাতার অভীষ্ট সাধন না করিয়া সংহার করিয়া থাকে। এইরূপ একটা বাগ্‌বজ্র হইতেই বৃত্রাসুরের উৎপত্তি। তপঃশক্তি হইতে জন্মিয়া বৃত্র যে কেন তপঃশক্তির বিরোধী হইয়াছে তাহার রহস্যটি এই উপাখ্যানের ভিতর রহিয়াছে।

আমরা বলিয়াছি যে, একটা ধূলির ভিতরেও ঐ ত্রিতত্ত্ব বিরাজ করিতেছে। কথাটা শুনিয়া বিস্মিত হইলে চলিবে না। আমরা যেভাবে চিনিয়াছি, তাতে এ স্থূল

আমাদের হইবে না যে, বৃত্র কোন এক মান্ধাতার আমলের অসুর, প্রবল হইয়া ইন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করিয়াছিল,—তারপর বজ্রের আঘাতে কোন্‌দিন পঞ্চত্ব পাইয়াছে। বৃত্র এখনও বাঁচিয়া আছে এবং বৃত্রের সঙ্গে ইন্দ্রের লড়াই এখনও চলিতেছে—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্র। জড়, প্রাণ, মন—এ সবের কোন এলেকাতেই সে লড়াই বাদ যায় নাই। সৃষ্টিতে এমন কোন কিছু ছোট নেই, যার সত্তার ভিতরে ঐ ত্রিতত্ত্বের খেলা অহরহঃ না চলিতেছে। আর বড়র ভিতরে, খোদ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকেও ঐ খেলা খেলিয়া যাইতে হইতেছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নাভিকমলে বসিয়া সৃষ্টির প্রারম্ভে মধুকৈটভকে লইয়া যে খেলাটি খেলিলেন, সে খেলাটি প্রত্যেক ধূলিরেণুর ভিতরে, এমন কি প্রত্যেক এটমের ভিতরেও অবিরত চলিতেছে। আচার্য জগদীশ বসুর ক্রেস্‌কোগ্রাফ প্রভৃতি যন্ত্রে প্রাণী-জগতের সূক্ষ্ম ঘটনাকে বহু লক্ষগুণ বড় করিয়া দেখানর ব্যবস্থা হইয়াছে; পুরাণকার আমাদিগকে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মধুকৈটভ, অথবা ইন্দ্র এবং বৃত্রের সংঘর্ষের যে বিরাট চিত্রখানি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, সে চিত্রখানি আর কিছুই নয়, ঐ ধূলিকণা অথবা এটমের ভিতরের ত্রিতত্ত্বের সূক্ষ্মাভিনয়টিকে বিরাট্ বিপুলাকারে আমাদিগকে দেখানো।

যদি কোনদিন সৃষ্টি বলিয়া একটা কিছু হইয়া থাকে, তবে অবশ্য সেদিন বৃত্রাসুর-সংহারের পালার মত একটা পালার অভিনয় হইয়াছিল। রাত্রি বা তমের মত একটা অবস্থা হইতে এই বিশ্বটা ফুটিয়া উঠিয়াছে—এইরকম একটা কল্পনা আমরা প্রায় সকলেই করিয়া থাকি। সৃষ্টির আগে তাই একটা মহারজনী। সেই মহারজনীতে বৃত্র-সংহার বা মধুকৈটভ-সংহারের পালার অবশ্য অভিনয় হইয়াছিল। এক অজানা আসরে, এক অজানা বন্দোবস্তে সে অভিনয় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। সে অভিনয়ের প্লাকার্ড ছাপাইয়া টাঙ্গাইয়া দিবার কোন ব্যবস্থা তখন হইয়াছিল কিনা আমরা তা বলিতে পারি না। পুরাণকার সে অভিনয়ের রিপোর্ট আমাদিগকে কিছু কিছু শুনাইয়াছেন বটে, কিন্তু কোনও রিপোর্টেই এটা দেখি না যে, সেই রজনী অভিনয়ের শেষ রজনী হইয়াছিল। সৃষ্টিরও যেমন বিরাম নাই, সৃষ্টির মূল তত্ত্বগুলির খেলারও তেমনি বিচ্ছেদ নাই। যে ত্রিতত্ত্বের কথা আমরা এতক্ষণ বলিতেছি, সে ত্রিতত্ত্ব সৃষ্টির মূলতত্ত্বের সামিল। সুতরাং সে ত্রিতত্ত্বের খেলারও বিচ্ছেদ নাই; এখনও চলিতেছে। একটা অণুর ভিতরও চলিতেছে। এ কথা শুনিলে আনাড়ী লোক হয়ত হাসিতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক আর হাসিবেন না। কিন্তু বিশ ত্রিশ বছর আগে এক এক রকম অণুকে এক এক জন অক্ষয়, অব্যয়, অজর, অমর সত্তা ভাবা হইত। একটা অক্সিজেনের অণু চিরকালই তাই রহিয়াছে, তাই থাকিবে, তার আর মার নাই, অদল বদল নাই। এই দৃষ্টিতে একটা অণু জড়ত্বের পূর্ণ বিগ্রহ। আমরা বৃত্রাসুরের যে পরিচয় পাইয়াছি, তাতে বলিতে পারি যে এক একটা জড় পরমাণুতে বৃত্র যেন মূর্তিমান্ হইয়া বিরাজ করিতেছে।

এক একটা জড় বস্তু বৃত্রের যেন অভেদ্য কায়া বা দুর্গ; কোন কিছু দ্বারা সে কায়া বা দুর্গের ভেদ হয় না। সাবেক বৈজ্ঞানিকেরা ভাবিতেন, এমন কোন বজ্র নাই, যে বজ্র এটমের ভিতরে বৃত্রের ঐ কায়া বিদ্ধ করিতে পারে। "এটম" কথাটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে,—এর ভাগ হয় না, অথবা ছেদ হয় না।

হালের বৈজ্ঞানিক কিন্তু বৃত্রের ঐ দুর্গটিকে তেমন পাকা মনে করিতেছেন না। ও-দুর্গের ভিতরে বৃত্রই বাস করে, ইন্দ্র অথবা তার আয়ুধ বজ্রকে আদৌ আমল দেয় না,—এ কথাটা আর হালের বৈজ্ঞানিক মানিতে চান না। সে-দুর্গের ভিতরেও ঐ ত্রিতত্ত্ব বিরাজ করিতেছে; ইন্দ্র ও বৃত্রের অহরহঃ সংগ্রাম চলিতেছে। সুতরাং এটম্ আর আজকালকার দিনে ঠিক এটম্ নয়; তার ঘরে ছিদ্র বাহির হইয়া পড়িয়াছে; তার ভিতরে এই ব্রহ্মাণ্ডের ষোল আনা বন্দোবস্তটাই একরকম বাহাল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ফলে এটম আর অক্ষয়, অব্যয়, অজর, অমর সত্তা নহে। অন্য জিনিষের মত সেও ভাঙ্গিতেছে চুরিতেছে,—এক ভাঙ্গিতেছে আর এক গড়িয়া উঠিতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা যেগুলিকে "রেডিওএকৃটিভ্" বস্তু বলেন, সেই বস্তুগুলির ভিতরে অবশ্য এই বিপ্লবের সাড়া আমরা বেশী পাইতেছি; কিন্তু এটা আমরা যেন মনে না করিয়া বসি যে, বিপ্লব কেবলমাত্র ঐ দুই চারিটা বস্তুতেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, বাকি সব জিনিষ একেবারে ঠাণ্ডা, চুপচাপ। আমরা অন্যত্র শিষ্ট প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি যে, এই বিপ্লবরূপী অগ্নিকাণ্ড নিখিল বস্তুর অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত চলিতেছে। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যেখানে শুধু বৃত্রই বিরাজ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বজ্রও হাজির নাই। শুধু বৃত্রের এলেকা হইলে, বস্তু সেই সাবেক এটমের মত হইয়া থাকিত। তবে এ কথা ঠিক যে, জড়ের রাজ্যে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় যে, বৃত্রই যেন প্রবল, ইন্দ্র অথবা অগ্নি থাকিলেও, যেন কতকটা গা-ঢাকা দিয়া রহিয়াছেন।

প্রাণের ও মনের রাজ্যে আসিয়া আমরা ইন্দ্র অথবা অগ্নিকে সদরে বসিতে দেখিতে পাই। সময় সময় মনে হয় যেন বৃত্র সেখানে হাজির নাই। এটা অবশ্য আমাদের দেখার ভুল। সেখানেও অবশ্য বৃত্র একটু আড়ালে থাকিয়া লড়াই চালাইতেছে। জড়ের রাজ্যে বাধা বা চাপই যেন সব হইয়া আমাদের কাছে দেখা দেয়, আসলে কিন্তু তা নয়। প্রাণে ও আত্মায় স্ফূর্তি বা বিকাশই যেন সব বলিয়া আমাদের মনে হয়; কিন্তু আসলে তাও নয়। জড়ে বাধার সঙ্গে সঙ্গে বাধা সরাইবার একটা যেমন কিছু না কিছু দেওয়া আছে, প্রাণে ও আত্মায় সেই রকম স্ফূর্তি বা বিকাশের পথে অল্প বিস্তর বাধাও দেওয়া রহিয়াছে। এসব কথার মানে এই যে জড়, প্রাণ ও আত্মা এ তিন ক্ষেত্রেই ঐ ত্রিতত্ত্বের খেলা চলিতেছে। মাত্রায় বেশি কমি আছে বই আর কিছুই নয়।

সৃষ্টির নিখিল পদার্থে ত্রিতত্ত্বের পরিচয় আমরা লইলাম; তপঃশক্তির সঙ্গে এ ত্রিতত্ত্বের যে সম্পর্ক, সাধক অথবা বাধক, সেটাও আমরা মোটামুটি বুঝিয়া লইলাম। এখন যে কথাটায় আমরা বিশেষভাবে খেয়াল করিতে চাই, সে কথাটা এই—বজ্রই হইতেছে তপঃশক্তির মূর্ত্তি অথবা প্রতীক। বজ্র বলিতে এমন একটা জিনিষ আমরা বুঝি, যার চাইতে দৃঢ় বা কঠিন আর কোন জিনিষ আমরা কল্পনা করিতে পারি না। আমাদের জ্ঞানে বস্তুগুলি নরম গরম সব রকমই হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাই। ক এর চাইতে খ দৃঢ়; দৃঢ় বলিয়া খ ক'কে ভেদ করিতে পারে; যেমন লোহা কাঠকে ভেদ করিতে পারে। আবার দেখি খ এর চাইতে গ বেশি দৃঢ়; সুতরাং গ খ কে ভেদ করিতে পারে। এই ভাবে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর, তা' হইতে আরও দৃঢ়তর, এইরকম সব জিনিষ আমরা অনুভবে পাইতেছি। পাইয়া একটা কল্পনা করিয়া থাকি—এমন একটা বস্তু হয় ত আছে যার পর দৃঢ় আর কোনও বস্তু নাই; সুতরাং সে বস্তু আর সকল বস্তুকেই ভেদ করিতে পারে। সেই নিরতিশয়রূপে দৃঢ় ও ভেদক হইতেছে বজ্র। কাচ এক হিসাবে খুব শক্ত জিনিষ সন্দেহ নাই, কিন্তু হীরার ধারে কাচও কাটে। আবার হীরা বা অন্য মণি-মাণিক্য হার করিয়া গাঁথিতে হইলে, তাদের ভিতরে ফুটা করিয়া লইতে হয়। যে জিনিষের দ্বারা মণিকেও উৎকীর্ণ করিয়া লইতে হয় সে জিনিষকে আমরা সাধারণ কথায় বজ্র বলিয়া থাকি—"মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ"—কালিদাসের মুখেই এই কথা আমরা শুনিয়াছি। বলা বাহুল্য, জহুরীদের এই বজ্র আমাদের লক্ষণমাফিক বজ্র নহে; কেন না তার চাইতেও শক্ত কোন কোন বস্তু আছে বা থাকা সম্ভব।

'শক্ত' কথাটাকে আমরা যেন চলিত অর্থে না লই। অপর জিনিষের জমাট ভাঙ্গিয়া যেটি তার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে, সেটিকে আমরা তার তুলনায় শক্ত বা সমর্থ বলিতেছি। সপ্তরথীতে মিলিয়া কুরুক্ষেত্র সমরে একটা ব্যূহ রচিত হইয়াছিল, বালক অভিমন্যু সে ব্যূহটি ভেদ করিয়া ভিতরে ঢুকিতে পারিয়াছিলেন; কাজেই সেই ব্যূহটির পক্ষে অভিমন্যু শক্ত বা সমর্থ। কিন্তু অভিমন্যু আগম-নিগম এ দু'য়ের কৌশল জানিতেন না; সুতরাং তিনি সে-ব্যূহটা সম্বন্ধে আধখানা বই পুরা শক্ত হইতে পারেন নাই। বাতাস বা জলের ভিতর দিয়া আলোক-রশ্মি অবাধে চলিতে পারে; অতএব আমরা বলিতে পারি যে, ঐ সব পদার্থ সম্বন্ধে আলোক-রশ্মি শক্ত বা সমর্থ। অথচ আলোক-রশ্মি, যাকে কঠিন দ্রব্য বলে, তা ত মোটেই নয়। কাঠের ভিতর বা হাড়ের ভিতর সাধারণ আলোক-রশ্মি ঢুকিতে পারে না, কিন্তু 'X-রে' উহাদের মধ্যে ঢুকিতে পারে। অতএব এ ক্ষেত্রে সাধারণ আলোকের চাইতে 'X-রে' বেশি শক্ত বা সমর্থ। এইরকম সাধারণ আলোকে বিদ্ধ হয় না, অদৃশ্য কোন কোন আলোকে বিদ্ধ হয় এমন সব জিনিষ রহিয়াছে।

প্রত্যেক জিনিষই এক একটা দুর্গ বা গুহার মত। সকলে তাহার ভিতর ঢুকিতে পারে না। যে ঢুকিতে দেয় না তাকে বেদ অনেক জায়গায় পণিঃ, বৃত্র, অহি ইত্যাদি বলিয়াছেন। যে, যে শক্তি, সে গুহাটি বিদীর্ণ করিতে পারে, সে, অথবা সেই শক্তি, সে গুহাটির পক্ষে বজ্র। বাতাস কাচ বা জলের পক্ষে সাধারণ আলোক-রশ্মি বজ্র বটে, কিন্তু কাঠ, পাথর মাটি ইত্যাদির পক্ষে বজ্র নয়। X-ray কিন্তু এসবের পক্ষে বজ্র। হালের বিজ্ঞান আমাদের শুনাইয়াছেন যে, একটা এটমের ভিতরেও একটা জগৎ রহিয়াছে; বিপুল শক্তি সেই আণবিক জগতে খেলা করিতেছে। কখনও কখনও বা সেই বিপুল ভাণ্ডার হইতে কিছু কিছু শক্তি বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতেছে (যে ব্যাপারটির নাম রেডিও-একটিভিটি); এক কথায়, অণুর ভিতরে অনবরতঃ একটা বিপ্লব চলিতেছে। কিন্তু তাপ, আলোক, রাসায়নিক শক্তি ইত্যাদি যে সব শক্তি লইয়া আমরা সচরাচর এই সব সাধারণ কারবার করিতেছি, সে সব শক্তির কোনটাই (যতই প্রবল হোক না কেন) ঐ অণুর গুহা বিদীর্ণ করিতে সমর্থ নহে। তাহা হইলে আমাদের বলিতে হয় যে, অণুর পক্ষে এই সব শক্তি বজ্র নহে। আমরা যদি কোন শক্তি-বিশেষের দ্বারা ঐ সকল অণুর গুহা বিদীর্ণ করিয়া তাদের ভিতরকার বিপুল শক্তিরাশিকে মুক্ত করিয়া দিতে পারি, তবে, সেই শক্তি-বিশেষ অণুর পক্ষে বজ্ররূপে পরিগণিত হইতে পারিবে। অধ্যাত্ম-বিদ্যা সে শক্তি-বিশেষটি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন; হয়ত কালে বিজ্ঞানাগারেও সে শক্তি-বিশেষটি ধরা পড়িতে পারে। সে যাহাই হউক, অণুর পক্ষে বজ্র যে কি হইতে পারে, তার পরিচয় আমরা লইলাম।

প্রাণের রাজ্যে আসিয়াও এই বজ্র বস্তুটিকে আমরা নানা আকারে দেখিতে পাই। জীব দেহ নানারকম আহার গ্রহণ করিতেছে। এমন কোন কোন আহার আছে যেগুলি উদরস্থ হইয়া পাকস্থলী ও অন্ত্রের ভিতর দিয়া প্রায় অবিকৃত আকারে বাহির হইয়া যায়, আমাদের দেহের পেশীগুলি সে সব জিনিষ শোষণ করিয়া লইতে পারে না; অথবা অন্যরূপে বলিতে গেলে, সে সব জিনিষ আমাদের দৈহিক কোষগুলির গুহা যেন বিদীর্ণ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে, এমন অনেক আহার আছে, যেগুলি খুব সামান্য মাত্রায় দেহস্থ হইলেও দেহের সকল কোষগুলিতে, সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবয়বে ঢুকিয়া ছড়াইয়া পড়ে; যেমন কর্পূর, রসুন, তীব্র বিষ ইত্যাদি। সুতরাং এই সব জিনিষ আমাদের দেহের কোষগুলির পক্ষে বজ্র। ভাইজ-ম্যান সাহেব ও তাঁহার শিষ্যদের মতে আমাদের দেহের মধ্যে জনন-কোষটি (Germ Plasm) একরকম দুর্ভেদ্য গুহা বলিলেই হয়। আমাদের ভিতর দিয়া পুরুষানুক্রমে একটি বীজ-সত্তা প্রায় অক্ষুণ্ণভাবে যেন চলিয়া আসিতেছে (ইহাকে বলে Continuity of the Germ-plasm); আমাদের ব্যক্তিগত কাজকর্ম ও ধর্মাধর্মের সঙ্গে সেই কুলক্রমাগত বীজসত্তাটির তেমন কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

নাই ; অর্থাৎ আমাদের নিজেদের আচার ব্যবহার দ্বারা উপার্জিত ধর্মগুলি (Acquired characters) সে বীজসত্তাটির সম্বন্ধে সাধক অথবা বাধক একরকম হয় না বলিলেও চলে। অবশ্য একথা লইয়া পণ্ডিতেরা এখনও বিবাদ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। কিন্তু সে যাই হউক, এটা একরকম সর্ববাদিসম্মত যে সে বীজসত্তাটি একেবারে অভেদ্য না হইলেও, অনেকটা দুর্ভেদ্য বটে।

বর্তমানে আমাদের দেহের মধ্যে কয়েকটা গ্রন্থির লীলা-রহস্য কতকটা উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে; যেমন আমাদের কণ্ঠদেশে 'থাইরয়েড্' গ্রন্থি ইত্যাদি। এখন আমরা জানিতে পারিতেছি যে, এই সকল গ্রন্থির ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া অদৃশ্য রসস্রাব আমাদের দৈহিক বীজসত্তাটির উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলে—জীব যে অতিকায় হয়, অথবা বামন হয়, তাদের দৈহিক গঠন এবং মানসিক স্ফুরণ যে স্বাভাবিক হয়, অথবা অস্বাভাবিক হয় (normal or abnormal)—এ সকল ব্যাপারের মূলে আমাদের ঐ সব ছোট ছোট গ্রন্থিদের হাত রহিয়াছে। সেই গ্রন্থি এক একটা রহস্য-ভাণ্ডার। সে রহস্য-ভাণ্ডার এখনও আমরা যেমন খুসী তেমন করিয়া পুরা ব্যবহার করিতে শিখি নাই ; তার চেষ্টা চলিতেছে। যেদিন কোন উপায়বিশেষের দ্বারা আমাদের এই দৈহিক গ্রন্থিগুলির গুহা আমরা ভেদ করিতে সমর্থ হইব, সেদিন সেই উপায়বিশেষ এই গুহাগুলির পক্ষে বজ্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে। এখনও সে বজ্রের হদিশ আমরা পাই নাই। কোন কোন রকমের খাদ্য (যথা ভাইটামিন্) এই সকল গুহার ভিতরে কাজ করিতে সমর্থ দেখা যাইতেছে ; যদি তা হয়, তবে এরা ঐ গুহাগুলির পক্ষে বজ্র।

আমাদের দেশের যোগীরা যে ষট্চক্রের কথা বলিয়া থাকেন, তাদের সঙ্গে এই গ্রন্থিবর্গের যে কি সম্পর্ক তা আমাদের খুঁজিয়া দেখা উচিত। সম্ভবতঃ যোগীদের চক্রগুলি সূক্ষ্মগ্রন্থি, স্থূলগ্রন্থি নয়। কিন্তু আসল জায়গাটায় চমৎকার মিল রহিয়াছে। যোগীদের চক্রগুলিও এক একটা রহস্য-শক্তির ভাণ্ডার। সে ভাণ্ডার লুটিতে পারিলে ভূতজয় এবং অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি আমাদের নাকি করায়ত্ত হইতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান যেমন বলিতেছেন যে থাইরয়েড্ গ্ল্যাণ্ডের কাজটা কিছু গোছাইয়া দিতে পারিলে বুড়া মানুষ আবার যুবা হইতে পারে, কুরূপ সুরূপ হইতে পারে, বামন দীর্ঘাকৃতি হইতে পারে, সেইরকম ধারা যোগীও বলিয়া থাকেন যে, আমাদের দেহের কোন কোন চক্রে বা কেন্দ্রে 'সংযম' করিতে পারিলে জরা, রোগ, অঙ্গবৈকল্য, এমন কি মৃত্যু—এ সকলই জয় করিতে পারা যায়। তন্ত্রশাস্ত্রের পুঁথিগুলিতে এ রকম ফলশ্রুতি বারবার খুব জোরের সহিত আমাদের শোনান হইয়াছে দেখিতে পাই। আজকালকার ডাক্তারেরা যেমন আশা করিতেছেন, গ্ল্যাণ্ডগুলির সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাঁরা মানসিক ব্যাধিও (উন্মাদ প্রভৃতি) আরাম করিতে পারিবেন, যোগীরাও সেইরকম ঠিক গ্লাণ্ড না হউক, চক্রগুলির কাছ হইতে সকলরকম মানসিক ঐশ্বর্য্য এবং বিভূতি দোহন করিতে

পারিবার ভরসা আমাদের বহুদিন হইতে দিয়া রাখিয়াছেন। তফাৎ এই যে ডাক্তারেরা এখন পর্যন্ত গ্রন্থিগুলি ভেদ করার পক্ষে সমর্থ তেমন কোন উপায় বা শক্তি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বজ্রায়ুধ এখনও তাদের তরে নির্মিত হয় নাই। পরবর্তী কালে কিছুটা হইয়াছে, যোগীরা সে আয়ুধ লাভ করিয়াছেন—যে আয়ুধের প্রসাদে ষট্‌চক্রভেদ হইয়া থাকে। সকলেই জানেন সে আয়ুধটি আর কিছুই নয়—জাগ্রত কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, যে শক্তি সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা হইয়া স্বয়ম্ভুলিঙ্গ-বেষ্টন-পূর্বক মূলাধার-চক্রে সচরাচর নিদ্রিতা হইয়া রহিয়াছেন। এই শক্তিটিকে জাগাইতে পারিলেই, সেটি ষট্‌চক্রের পক্ষে বজ্রস্বরূপ হইল। সে যাহাই হউক, ডাক্তারেরা সম্প্রতি গ্রন্থিগুলির ভিতরে যে শক্তিটিকে ধরিতে পারিয়াছেন, সে শক্তিটি আমাদের বীজসত্তার পক্ষে যে অনেকটা বজ্রেরই মত, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই।

অন্তঃকরণের রাজ্যে আসিয়াও বজ্রকে আমাদের চিনিয়া বাহির করিতে বেগ পাইতে হয় না। স্বাভাবিক বন্দোবস্তের ফলে প্রত্যেক জীবের অন্তঃকরণে এমন একটা গুহা হইয়া রহিয়াছে, যে গুহার ভিতরে অন্য কোন জীব সরাসরি ঢুকিতে পারে না। তোমার মনে কি রহিয়াছে বা হইতেছে, তার সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে আমার কোন জ্ঞান নাই। তোমার কথা শুনিয়া অথবা তোমার আকার ইঙ্গিত দেখিয়া, তোমার মনের ভাব আমাকে আন্দাজ করিয়া লইতে হয়। আমার মনের সম্বন্ধেও তোমার ঠিক সেই কথা। প্রত্যেকেরই মন এক একটা দুর্ভেদ্য গুহা। অভেদ্য না বলিয়া দুর্ভেদ্য বলিলাম এই কারণে যে, কোন উপায়বিশেষ দ্বারা হয় ত অপরের মনটিকে আমি নিজেরই সাক্ষাৎ অনুভূতির ভিতরে টানিয়া লইতে পারি। পরকায়-প্রবেশের মত পর-মন-প্রবেশও যোগীদিগের একটা বিভূতি বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।

আজকালকার অনেক পরীক্ষিত সত্য এ বিষয়ে নূতন করিয়া প্রমাণ হাজির করিতেছে। এক আমারই ভিতরে হয়ত একাধিক চৈতন্য-সত্তা পরস্পরকে আড়ালে রাখিয়া কাজ করিতেছে। আমার অবশ্য একটা সাধারণ চৈতন্য-সত্তা আছে, যেটাকে আমি 'আমি' বলিয়া জানি; এ 'আমি'র এলেকা আমার বাস্তব জীবনের কতকটায়, সবটায় নয়। আমার বাস্তব জীবন হয় ত একাধিক আমির মধ্যে বিলি করিয়া দেওয়া রহিয়াছে; প্রত্যেক আমির ইজারা আলাদা,—একজন ইজারাদার আর একজন ইজারাদারের খোঁজ রাখে না; কেহ কাহার সঙ্গে সল্লা পরামর্শ করিতেছে না; অথচ মোটের উপর জীবন-যাত্রাটি একরকম নির্বিবাদেই চলিয়া যাইতেছে। রোগবিশেষে অথবা হিপনোটিক অবস্থায় এই সকল আলাদা 'আমি' হয় ত একটু অসাধারণ রকমে নিজেদের জাহির করিয়া বিচারকদিগকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। সাধারণতঃ আমাদের কারবারি 'আমি'টাই সদর কাছারিতে বসিয়া কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করিতেছে; বাকি আমিগুলা মফঃস্বলে গা-ঢাকা দিয়া রহিয়াছে, সদর-কাছারিতে হাজির হইতে নারাজ।

এই গেল সাধারণ ব্যবস্থা। কিন্তু রোগবিশেষে অথবা হিপনোটিজ্‌মে এ অবস্থার ব্যতিক্রম দেখা যায়। একজন 'আমি' কাছারিতে বসিয়া কিছুক্ষণ কাজকর্ম করিলেন; তারপর তিনি সরিয়া পড়িলেন। আর একজন 'আমি' আসিয়া গদিতে বসিলেন এবং কাজকর্ম দেখিতে লাগিলেন; কিছুক্ষণ বাদে তিনিও সরিয়া পড়িলেন। এই দুই 'আমি'র কোনটাই অপরটাকে আমল দিতে চায় না; এক নম্বর 'আমি'র দস্তখত দুই নম্বর 'আমি' আসিয়া নিজের বলিয়া সনাক্ত করিতে নারাজ হয়। এ রকম ঘটনা কদাচিৎ দেখা গিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এ সকল 'আমি' যেন এক একটা গুহা; একের গুহার ভিতরে অপরের প্রবেশ নিষেধ। যোগীরা তাড়াতাড়ি ভোগক্ষয়ের জন্য কায়ব্যূহ ধারণ করিয়া থাকেন; একই সময়ে অনেক কায়া ধারণ করিয়া সেই সকল কায়াতে নানাবিধ ভোগ এক সময়ে করিয়া থাকেন। অবশ্য বিভিন্ন কায়াতে আলাদা আলাদা অন্তঃকরণ থাকে। কিন্তু সেই বিবিধ কায়ায় এবং বিবিধ অন্তঃকরণে বিবিধ ভোগ যে একজনেরই হইতেছে, সে একজন যে আমি—এ বোধ অবশ্য যোগীর অটুট থাকে। তা না হলে কায়ব্যূহ ধারণ নিষ্প্রয়োজন। অপরের ভোগে আমার ভোগক্ষয় হইবে কিরূপে? এইজন্য কায়ব্যূহে বর্তমান সকল অন্তঃকরণের নিয়ামক একটা অন্তঃকরণ আমাদের স্বীকার করিতে হয়। যোগী সেই নিয়ামক অন্তঃকরণটি বজায় রাখিতে পারেন বলিয়াই কায়ব্যূহের ভিতর দিয়া এক সময়ে নানাবিধ ভোগ করিয়া ভোগক্ষয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাহা হইলে, যোগীর কাছে কায়ব্যূহস্থিত ঐ সকল আলাদা আলাদা অন্তঃকরণগুলির কোনটাই দুর্ভেদ্য গুহা নহে। সে সকল গুহা বিদীর্ণ করার হাতিয়ার তাঁর মজুত রহিয়াছে। সে হাতিয়ারটি হইতেছে বজ্র।

আমাদের আটপৌরে মানসিক জীবনেও এই হাতিয়ারের প্রয়োগ কিছু না কিছু হামেশাই আমাদের করিতে হইতেছে। কোন একটা জিনিষ ঠিক মনে করিতে পারিতেছি না; কিছুক্ষণ স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখি; অমনি সে জিনিষটি আমাদের মনে পড়ে। এখানেও একটা গুহা আমরা বিদীর্ণ করিলাম;—যে বজ্র দ্বারা বিদীর্ণ করিলাম, তার নাম মনঃসংযোগ, যেটিকে আমরা তপঃশক্তির প্রতিনিধিরূপে সহজেই চিনিতে পারি। কোনও একটা জিনিষ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না; চঞ্চল মনটিকে স্থির করিয়া কিছুক্ষণ গাঢ়ভাবে ভাবিয়া দেখিলে, সে জিনিষটি বুঝিতে পারি। এখানেও গুহাভেদ হইল—বজ্র-শক্তিতে। বৈজ্ঞানিক তাঁর মাথা হইতে নূতন একটা তত্ত্ব বাহির করিলেন, অবশ্য অনেক গবেষণা ও চিন্তার পর। এখানেও বজ্রশক্তিতে অজানার একটা গুহা ভেদ হইয়া গেল। কবি তাঁর অনন্য-সাধারণ প্রতিভায় এক অভিনব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিলেন; বেসুরার মধ্যে সুরটিকে বাছিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন। যে কাজটি তিনি করিলেন, সে কাজটি আসলে গুহা-ভেদ, এবং কবির প্রতিভা আমাদের সেই বজ্রশক্তিরই রূপান্তর মাত্র। আর বেশী দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক।

আমরা জড়, প্রাণ ও মন এ সকল ক্ষেত্রেই বজ্রকে এক না এক আকারে চিনিতে পারিলাম।

এ সকল কিন্তু বজ্রশক্তির কারবারী রূপ। বাজারে কারবার চালাইতে গিয়া নানান্ কারবারীকে অবশ্য নানান্ বাট্‌খারা লইয়া কারবার করিতে হয়। এ সকল বাটখারা মোটামুটি এক ওজনের সন্দেহ নাই; কিন্তু সূক্ষ্ম হিসাবে এক কারবারীর বাটখারার সঙ্গে অপরের বাটখারার ওজনে একটু গরমিল হইয়াই থাকে। এমন কি একই জনের বাটখারা অবস্থাবিশেষে ওজনে কম বেশী হইতে পারে। এই সকল বাটখারা লইয়াই কারবার চলিতেছে। কিন্তু বিলাতের কোন সরকারী ভবনে কোন একটা নির্দিষ্ট ধাতুখণ্ড নির্দিষ্ট অবস্থায় সুরক্ষিত রহিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যে সেই প্লাটিনাম খণ্ডটির ওজনই হইতেছে আদর্শ বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড। যেখানেই মাপ লইয়া কারবার, সেইখানেই নানা জনের নানান্ মাপের গরমিলগুলি সারিয়া লইবার জন্য, একটা আদর্শ আমাদের নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হয়। সময়ের হিসাবেও ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের অপেক্ষা রহিয়াছে। না থাকিলে কার ঘড়িটিকে আমরা প্রমাণ বলিব? যে বজ্রশক্তির কথা আমরা আলোচনা করিতেছি, সে শক্তির কারবার আমরা সকল ক্ষেত্রেই দেখিতে পাইতেছি সন্দেহ নাই—কিন্তু সে শক্তি নানা আকারে নানা ভাবে কাজ করিতেছে। ক এর পক্ষে খ বজ্র, কিন্তু গ এর পক্ষে নয়—এই রকম সব দেখিতেছি। এইজন্য বজ্রশক্তির একটা আদর্শ লক্ষণ আমাদের ঠিক করিয়া লইতে হয়। মোটামুটি যে শক্তি কোন কিছুর গুহা ভেদ করিতে সমর্থ, সেই শক্তিকেই আমরা এতক্ষণ বজ্র বলিয়া আসিতেছি। কিন্তু বজ্র আসলে কি? দিল্লীশ্বরকে আগে লোকে "জগদীশ্বরো বা" বলিত। কোন অসাধারণ পণ্ডিতকে লোকে এখনও "সর্বজ্ঞ" বলিয়া থাকে। কিন্তু দিল্লীশ্বর যেমন জগদীশ্বর ছিলেন, না, পণ্ডিত মহাশয়ও তেমন সর্বজ্ঞ নহেন। আমরা মুনি-ঋষিদিগকে সর্বজ্ঞ বলিয়া থাকি; কিন্তু পাতঞ্জল-দর্শনে স্পষ্টতঃ সূত্র করিয়া বলা হইয়াছে যে, একমাত্র পরমেশ্বরই সর্বজ্ঞ হইতে পারেন, আর কেহই না। একমাত্র পরমেশ্বরেই সর্বজ্ঞতা নিরতিশয় ভাবে রহিয়াছে; আর সকলে সর্বজ্ঞের অনুকল্প বা কাছাকাছি একটা কিছু থাকিতে পারে মাত্র। এইভাবে মুনি-ঋষিরা সর্বজ্ঞ-কল্প, সর্বজ্ঞ নহেন। যে বস্তুতে মণি-মুক্তাও ফুটা করিতে পারা যায়, সেই বস্তুকে বজ্র বলার দস্তুর রহিয়াছে। কিন্তু ঠিক দস্তুরমত বজ্র জিনিষটা কি?

আমরা এ প্রসঙ্গে আলোচনার গোড়াতেই এক কথায় বজ্রের লক্ষণ দিয়া রাখিয়াছি। এখন সেই কথাটা আবার বলি। জড়ে হউক, প্রাণে হউক অথবা মনে হউক, যেখানে যত সূক্ষ্ম অথবা সুদৃঢ় গুহা থাকুক না কেন, যে শক্তিতে সে সব গুহাই ভেদ করিতে পারা যায়, কোন কিছুতেই সেটি পরাহত হইয়া ফিরিয়া আসে না, সেই শক্তিটি হইতেছে বজ্র। অন্যরকমে দেখিলে সেইটাই শ্রীভগবানের নৃসিংহরূপ বা নারসিংহী শক্তি। সে শক্তিটির আসল চেহারা ধরিয়া ফেলা শক্ত; কিন্তু সেরকম একটা শক্তি আমরা

কল্পনা করিতে পারি। শুধু কল্পনা করিতে পারি কেন সেরকম একটা শক্তি সত্য সত্যই থাকা সম্ভব বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। বৈজ্ঞানিক যাহাকে তাড়িত-শক্তি বলেন সেইটাই কি বজ্র? আমাদের ভিতরে যে শক্তি তৈজস অন্তঃকরণরূপে অহরহঃ কত চিন্তার জগৎ গড়িতেছে, ভাঙিতেছে, সেইটাই কি বজ্র? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। শক্তি মূলে এক; জড়শক্তি, প্রাণশক্তি ও চিৎশক্তি বলিয়া আলাদা আলাদা ভাগ করা আমাদের কারবারি বাতিক বই আর কিছুই নয়। সে যাইই হউক, যে শক্তিটি জড়ের ক্ষেত্রে এটম, করপাস্‌ল্‌ ইত্যাদি সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম গুহাগুলিও ভেদ করিতে সক্ষম; প্রাণের ক্ষেত্রে জীবকোষ, গ্লাণ্ড, চক্র এ সকল কোন ব্যূহ হইতে পরাহত হইয়া যে শক্তি ফিরিয়া আসে না; মনের ক্ষেত্রে, অন্তঃকরণের ক্ষেত্রে নিখিল গুহা, অথবা কোষের মধ্যে সঞ্চারী সত্তাটিকে, যে শক্তি গিয়া স্পর্শ করিতে পারে, আত্মীয় করিয়া লইতে পারে,—সেই শক্তির নাম বজ্র।

পুরাণাদিতে গল্প আছে (ঋগ্বেদ সংহিতায় তার "মূল" আছে) যে ইন্দ্র বৃত্রকে সহজে দমন করিতে পারেন নাই। এমন একটা আয়ুধ সকলকেই বিদ্ধ করিতে পারে, এমন কি বৃত্রের মত মহাবল অসুরকেও। দেবতাদের পরামর্শে তাঁহাকে দধীচি ঋষির শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। কেন না দধীচি তাঁহার অস্থি না দিলে নাকি বজ্র তৈয়ারি হইতে পারে না। দধীচি তাঁহার অস্থি দান করিলেন; বিশ্বকর্ম্মা সেই অস্থি লইয়া বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সেই বজ্রে বৃত্র সংহার হইল। আমরা বজ্রের যে লক্ষণ এতক্ষণ দিয়া আসিলাম তাতে দধীচি ঋষি এবং তাঁর অস্থির স্থান কোথায়? এ প্রশ্নের স্থান আমাদের দিতে হইবে। তার আগে একটা কথা আমাদের স্মরণ করা দরকার। বজ্র সবই ভেদ করিতে পারে, কেবল একটা জিনিষকে পারে না। সে একটা জিনিষ হইতেছে অমৃত; অর্থাৎ অক্ষয়, অব্যয়, অজর যে সত্তা, সেইটি। অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত শরগুলি কিরাতরূপী শিবের অঙ্গে ঠেকিয়া ঠিক্‌রাইয়া আসিয়াছিল, বিদ্ধ হয় নাই। কেন না, শিব সাক্ষাৎ অমৃত-স্বরূপ; মৃত্যুঞ্জয়। সুতরাং কোন কিছুতে বিদ্ধ হওয়ার বস্তু তিনি নহেন। অর্জ্জুনের শর বলিয়া কেন, সাক্ষাৎ বজ্রও ওখানে হার মানিয়া আসে; ওই একটা মাত্র বস্তুতে, আর কিছুতে নয়। অমোঘ শক্তির নাম বজ্র; কিন্তু এমন একটা বস্তু অথবা ধাম আছে যেখানে এই অমোঘ শক্তিও পরাহত হইয়া আসে। সেই বস্তু অথবা ধামটিকে আমরা অমৃত বলিতেছি। অথবা সেটিকে আমরা বজ্রও বলিতে পারি। তাহা হইলে বজ্র এমন একটা বস্তু হইতেছে, যেটা কোন শক্তিতেই বিদ্ধ হয় না; সুতরাং যেটা নিরতিশয় দৃঢ়—যেমন, কিরাতরূপী শিবের কলেবর। বজ্রকে শাস্ত্র অন্য আকারেও কল্পনা করিয়াছেন। মৃত্যু বজ্রের একটি রূপ, কেন না মৃত্যু সকল বস্তুকেই বিদ্ধ করিয়া ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে। কেবল একটিমাত্র বস্তুকে মৃত্যু স্পর্শ করিতে পারে না—সেই বস্তুটিই হইতেছে অমৃত। বজ্রকে কালরূপে অথবা কালাগ্নি-রুদ্র

রূপে শাস্ত্র কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। শিবের হস্তে ত্রিশূল রূপে অথবা বিষ্ণুর হস্তে সুদর্শন রূপে বজ্র বিরাজ করিতেছেন। যাহা কিছু কৃত্রিম বা ক্ষয়শীল, তাহাই এই বজ্রের অধীন। অথর্ববেদ সংহিতার (১৯।৫৩) কাল—"স এব সংভুবনান্যারভৎ, স এব সংভুবনানি পর্যৈৎ। পিতা সন্নভবৎ পুত্র এষাং, তস্মাদ্বৈ নান্যৎ পরমস্তি তেজঃ॥" পরমতেজঃ কাল—বজ্র।

তপঃশক্তি কার্যকরী করিতে হইলে, তাহাকে ঘনীভূত করিয়া লইতে হয় এবং একতান অথবা একাগ্র করিয়া লইতে হয়। শক্তি ছড়াইয়া থাকিলে কাজ হয় না; আবার শক্তির একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে প্রবণতা না থাকিলেও কাজ হয় না। জড়ে, প্রাণে, মনে সর্বত্র আমরা এই সত্যের পরিচয় পাইতে চেষ্টা করিয়াছি। দধীচির উপাখ্যানের মধ্যে আসল কথা তিনটি। প্রথম, দধীচির অস্থি; দ্বিতীয়, দেবতাদের কল্যাণে দধীচির নিজ দেহাস্থি ত্যাগ; তৃতীয়, বিশ্বকর্মা কর্তৃক বৃত্র-বধের জন্য সেই দেহাস্থির বজ্ররূপে নির্মাণ। এখন যে সত্যটির কথা পূর্বে আমরা বলিলাম, সেই সত্যেরই তিনটি দিক্ এই তিনটি ব্যাপারের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেহ অবশ্য রস রক্তাদি নানা ধাতুতে নির্মিত। এই সকল ধাতুর মধ্যে সব চাইতে দৃঢ় ঘনীভূত ধাতু হইতেছে আমাদের দেহের অস্থি। অস্থির কাঠামো-খানাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের এই দেহ-যন্ত্রের সকল কল-কব্জা রহিয়াছে এবং চলিতেছে। অস্থির কাঠামো হইতেছে অথর্ববেদবিশ্রুত (১০।৭) সেই স্কন্দদেবতার প্রতিমূর্তি। সুতরাং অস্থি বলিতে দৃঢ় এবং ঘনীভূত একটা বস্তু বুঝায়। অতএব দধীচির দেহাস্থি তপঃশক্তির ঘনীভূত অবস্থার প্রতীক। এই গেল প্রথম কথা। তারপর দধীচি দেবতাদের কল্যাণে নিজের দেহাস্থি ত্যাগ করিলেন। এ কথার মানে এই যে ঘনীভূত তপঃশক্তি একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে একতান অথবা একাগ্র হইল। ত্যাগ মানে যা প্রত্যাহার মানেও তাই। অমুকের উদ্দেশে কোন কিছু বলি দিলাম বা ত্যাগ করিলাম—এ কথার মানে এই যে যেটা আগে লক্ষ্যহীন হইয়া পড়িয়াছিল, অথবা অন্য লক্ষ্যের দিকে ঝুঁকিয়াছিল, সেটাকে একটা নতুন লক্ষ্যের দিকে একাগ্র করিয়া দিলাম। বলি বা ত্যাগ করার এইটাই হইল আসল মানে। অথর্ববেদ (১০।৭।৩৯) কৌষীতকি উপনিষৎ (২।১) প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন একজন মহাদেবতার উদ্দেশে অন্য সকল দেবতারা প্রতিনিয়ত বলি আহরণ করিতেছেন। সে মহাদেবতাটি আমাদের প্রাণ অথবা আত্মা; আর বলি-সংগ্রহকারী অপর দেবতাগণ হইতেছেন আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাম। অন্যত্র এই ব্যাপারটিকে প্রাণাগ্নিহোত্র বলা হইয়াছে। অগ্নিহোত্রে যেমনধারা অগ্নিতে আজ্যাহুতি নিক্ষেপ করিতে হয়, আমাদের প্রাণরূপী অগ্নিতে তেমনিধারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ সদাসর্বদা রূপরসাদি আহুতি দান করিতেছে। এ অনুষ্ঠানেও চক্ষুরাদি দেবগণকে প্রত্যাহার ও সংযম, এ দুইই করিতে হয়। কোন

একটা নির্দিষ্ট রূপ আমাকে দেখাইতে হইলে, চক্ষুকে আর পাঁচটা রূপ হইতে নিজেকে ফিরাইয়া লইতে হয়, এবং একটা রূপেই নিজেকে একাগ্র করিতে হয়। চক্ষু সম্বন্ধে যে কথা, শ্রবণ প্রভৃতি অপরাপর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও সেই কথা। দধীচি দেবতাদের কল্যাণে নিজের অস্থি ত্যাগ করিয়াছিলেন, এ কথাটার মানে আমরা এইভাবে বুঝিয়া লইতে পারি।

খানিকটা শক্তি রহিয়াছে। অথচ আমি দেখিতেছি যে আমার অভীষ্ট কাজটি হইতেছে না। এখানে বুঝিতে হইবে যে শক্তিটা এলোমেলো ভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে। ঘনীভূত হয় নাই এবং আমার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে একাগ্র হয় নাই। কেবলমাত্র ঘনীভূত হইলে হয় না, একাগ্র হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেহে মুলাধার চক্রে যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি রহিয়াছেন, সে শক্তি ঘনীভূত শক্তি সন্দেহ নাই; কিন্তু সে শক্তি সাধারণতঃ লক্ষ্যহীন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়া থাকেন বলিয়া, তাঁর কল্যাণে আমাদের কোন সিদ্ধিলাভ হয় না। উপযুক্ত উপায়ে সেই ঘনীভূত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের দিকে একাগ্র করিয়া তুলিতে পারিলেই সে শক্তি দ্বারা ক্রমে ক্রমে সকল চক্রভেদ হইয়া থাকে এবং সঙ্গে সকল সিদ্ধি আমাদের করায়ত্ত হইয়া থাকে। অতএব এ ক্ষেত্রে আমাদের দেহের মধ্যে দধীচির অস্থি রহিয়াও কার্যকরী হইতেছে না এই-জন্য যে, কোন একটা লক্ষ্যের দিকে সে অস্থির ত্যাগ অথবা বিনিয়োগ হইতেছে না। সুতরাং আমরা বৃত্র বা কাল বা মৃত্যুর অধিকারেই রহিয়া গিয়াছি, সে অধিকার অতিক্রম করিতে হইলে যে বজ্রাস্ত্রের প্রয়োজন হয়, সে অস্ত্রের উপকরণ (অস্থি) আমাদের ভিতরে থাকিলে কি হইবে, বিশ্বকর্মা সে অস্থিটিকে এখনও গড়িয়া পিটিয়া বজ্র বানাইয়া লইতে পারেন নাই। কাজেই আমরা কালকে অথবা মৃত্যুকে জয় করিতে পারিতেছি না।

তন্ত্রশাস্ত্র শক্তির একান্ত ঘনীভূত অবস্থাটিকে বিন্দু বলিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্র (বৌদ্ধ ও হিন্দু) বজ্র তত্ত্বটিকেও বিশেষ করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছেন। যাহা হউক, বিন্দু শক্তির এমন একটা অবস্থা, যার চাইতে বেশী ঘনীভূত, সুতরাং কার্যকরী, অবস্থা শক্তির আর হইতে পারে না। এ বিন্দুর আমরা ভবিষ্যতে আলোচনা করিব। এখানে বক্তব্য এই যে, পুরাণকার যে বস্তুকে দধীচির অস্থি বলিতেছেন, আরও সূক্ষ্মভাবে লইয়া সেই বস্তুটিকে আগম বলিতেছেন বিন্দু। দুইই শক্তির ঘনীভূত অবস্থা—বিক্ষিপ্ত, বিরল, বিমুখ অবস্থার বিপরীত অবস্থা। তন্ত্রশাস্ত্র এই বিন্দুকেই সৃষ্টির গোড়ায় বসাইয়াছেন। সে যাহাই হউক, আমরা দেখিতেছি যে কেবল মাত্র দধীচির অস্থি বিদ্যমান থাকিলে হইল না, কোন এক উদ্দেশ্যে সে অস্থির ত্যাগ হওয়া আবশ্যক। দধীচি তাই ত্যাগের প্রতিমূর্তি। শুধু যে ত্যাগের প্রতিমূর্তি এমন নহে, সংযমেরও প্রতিমূর্তি। আমরা দেখিয়াছি যে সংযম ছাড়া ত্যাগ হয় না; যে রিক্ত সে দাতা হইবে কিরূপে? শ্রেষ্ঠ

ত্যাগের মূলে শ্রেষ্ঠ সংযম অবশ্য রহিয়াছে। এই সংযমকে আমরা শক্তির ঘনীভূত অবস্থা বলিতেছি। বাতাসে জলীয় বাষ্প কিছু না কিছু সর্বদাই রহিয়াছে, সচরাচর সেটিকে আমরা দেখিতে পাই না। সে জলীয় বাষ্পের বৃষ্টিরূপে অথবা শিশিররূপে ত্যাগ হয় কখন? যখন বাতাসে বিক্ষিপ্ত সেই জলীয় বাষ্পরাশি শৈত্য অথবা অন্য কোন কারণে ঘনীভূত হইয়া ছোট ছোট জলবিন্দুতে পরিণত হয়, তখনি। যতক্ষণ ঘনীভাব নাই, ততক্ষণ ত্যাগও নাই। পৃথিবীতে তাড়িত-শক্তি রহিয়াছে, মেঘও রহিয়াছে। মেঘ তাহার তাড়িত-শক্তি পৃথিবীর দিকে ত্যাগ করে কখন? যখন মেঘের সেই বিক্ষিপ্ত তাড়িত-শক্তি ঘনীভূত হইয়া থাকে, তখনই। একটা ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারি এবং অপর একটা ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারির মধ্যে তাড়িত-শক্তির আদান-প্রদান হবার আগে উভয়ের শক্তি কতকটা ঘনীভূত (condensed) হওয়া আবশ্যক। আমরা দুটো একটা দৃষ্টান্ত দিলাম। জড়ের রাজ্যে বহু দৃষ্টান্ত লইয়া এটা দেখান যাইতে পারে যে, শক্তির ঘনীভাব না হইলে বিশেষ কোন কাজ হয় না।

প্রাণের রাজ্যেও এই কথা। পুংজীব স্ত্রীজীবের দেহে নিজের বীর্য ত্যাগ করিয়া থাকে, বিন্দুর আকারে। সেই বিন্দু হইতেই নূতন জীবের সৃষ্টি হয়। এখন এই যে ত্যাগ, এর পশ্চাতেও শক্তির ঘনীভাব রহিয়াছে। বীর্য অথবা বিন্দু অস্বাভাবিক রকমে তরল হইয়া গেলে, ধাতুদৌর্বল্য হইল। সে ক্ষেত্রে ত্যাগ নিষ্ফল। তা ছাড়া আমাদের দেহের শুক্র ধাতু সকল ধাতুর সার। আমরা যা কিছু আহার করিয়া থাকি, সে সকলের শক্তির চরম পরিণতি ও ঘনীভাব হইতেছে ঐ বিন্দু। আমাদের মনে কাম অথবা জননেচ্ছা হইলে সর্বদেহে ওতপ্রোত ওজঃশক্তি ঘনীভূত হইয়া বিন্দুরূপে শুক্রকোষে সঞ্চিত হয়। বাতাসে অদৃশ্য জলীয় বাষ্প শৈত্যপ্রভাবে ঘনীভূত হইয়া যেমন মেঘরূপে জমাট বাঁধে এবং বৃষ্টিরূপে পতিত হয়, অনেকটা যেন তেমনি ধারা। এই কথাটি স্মরণ করিয়া বেদের ঋষিরা বর্ষণকারী দেবতাটিকে 'বৃষভ' বলিয়া গিয়াছেন। অন্য অনেক প্রাচীন দেশেও বটে—ঈজিপ্টের Apis Bull একটা মাত্র নজির। সে দেবতাটি কেবল যে বৃষ্টিই বর্ষণ করেন এমন নয়, সৃষ্টিতে যা কিছু অন্নরূপে কল্পিত হইয়াছে বা হইতেছে, সে সমস্তই তিনি বর্ষণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। সে দেবতাটি বৃষরূপে এই বিশ্বের নিখিল ঘনীভূত শক্তি বীর্যরূপে নিজের দেহে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন; অর্থাৎ যে দধীচির অস্থির কথা আমরা এতক্ষণ বলিতেছি, সে অস্থি বীর্যরূপে সেই বৃষ-দেবতার দেহে বিরাজ করিতেছে। এই পৃথিবী অথবা সৃষ্টি হইতেছে গাভী। বৃষরূপী দেব এই গাভীতে নিজের বীর্য নিক্ষেপ করিয়াছেন। অথর্ববেদ ৯।৪ ইত্যাদিতে এই প্রাচীন ঋষভ-দেবতার প্রশস্তি-বাণী রহিয়াছে। তার ফলে গাভী সবৎসা হইয়াছে, এই নিখিল প্রজাপুঞ্জের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। এই বৃষ-দেবতাটি প্রাচীন যুগে সকল দেশেই পূজিত হইতেন দেখিতে পাই। এ বৃষ যে কার প্রতীক, তা এতক্ষণে আমরা বুঝিতে

পারিলাম। ইনি স্বয়ং ইন্দ্র, প্রজাপতি অথবা বিশ্বকর্ম্মা। দধীচির অস্থিকে এই বিশ্বকর্ম্মাই বজ্ররূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তবে না বৃত্রের সংহার হইয়াছিল। তপঃশক্তির বিরোধী শক্তিটি যে বৃত্র তা আমরা আগেই বলিয়া রাখিয়াছি। এ বিরোধী শক্তিটিকে ক্ষয় করিতে হইলে তপঃশক্তি ঘনীভূত হওয়া আবশ্যক এবং একাগ্র হওয়া আবশ্যক। দধীচির অস্থি তপঃশক্তির ঘনীভূত অবস্থা; দধীচির অস্থি ত্যাগ এবং বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক সেই অস্থিতে বজ্র-নির্মাণ ঘনীভূত তপঃশক্তির একতান একাগ্র অবস্থা। ঘনীভূত শক্তি একাগ্র হইলেই সেটি বজ্র হইল; কেন না তখন সেটি গুহা বা ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ।

আমরা মেঘে মেঘে অথবা মেঘে পৃথিবীতে তাড়িতশক্তির যে আদান প্রদান দেখিয়া থাকি, তার নাম সচরাচর দিয়া থাকি বজ্র; কেননা বজ্রের কয়েকটা মোটামোটা লক্ষণ এখানে আমরা দেখিতে পাই। প্রথম, আমাদের বাহিরে শক্তিকে আমরা নানা আকারে খেলিতে দেখিতেছি—যেমন মাধ্যাকর্ষণ, ঝড়, বাতাস প্রভৃতির বেগ, তাপ, আলোক ইত্যাদি। এ সকল শক্তির মধ্যে আমরা তাড়িতশক্তিকে মুখ্য বলিয়া সহজেই ধরিতে পারি; অর্থাৎ বাহিরে আমরা যত আকারে দেখিতেছি, সে সকলের ভিতরে তাড়িত হইতেছে শক্তির আসল রূপ। বলা বাহুল্য, জড়-বিজ্ঞান এ কথাটিতে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিবেন। দ্বিতীয়, যখন মেঘ হইতে পৃথিবীতে বাজ পড়ে, তখন শক্তির মূল চেহারাখানিই যে আমরা দেখি এমন নয়, তখন আমরা শক্তিকে যারপর নাই তীব্র ও ঘনীভূত একটা মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। শক্তির ঘনীভাবের এর চাইতে স্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি আমরা আর বড় একটা দেখি না। তৃতীয়, সে তীব্র এবং ঘনীভূত বৈদ্যুতিক শক্তি সকল পদার্থই ভেদ করিতে সমর্থ বলিয়া আমরা দেখিতে পাই; যে বস্তুর উপর বাজ পড়ে, সে বস্তুটি যেমনই হউক না কেন, উহার দ্বারা সে সর্ব্বতোভাবে বিদ্ধ হইয়া যায়। বাজে মোটামুটি এই সকল লক্ষণ রহিয়াছে বলিয়া আমরা বাজকে সচরাচর বজ্র বলিয়া থাকি; বজ্র বলিলে ঐ বাজকে আমাদের মনে পড়ে। আসলে কিন্তু বজ্র শক্তির নিরতিশয় ঘনীভূত অবস্থা এবং একাগ্র অবস্থা।

দেবতারা বৃত্রের ভয়ে দধীচির তপস্যাশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন, এবং তাহার অস্থি ভিক্ষা করিয়াছিলেন দধীচি দেবতাদের কল্যাণে নিজের অস্থি দান করিয়াছিলেন; বিশ্বকর্ম্মা সেই অস্থি লইয়া বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন; ইন্দ্র সেই বজ্রায়ুধে বৃত্রকে সংহার করিয়াছিলেন;—এ সকল কথার তাৎপর্য আমরা এতক্ষণে বোধহয় বুঝিলাম। বজ্র-সৃষ্টির কথা আর বিন্দু-সৃষ্টির একই কথা। বজ্র অথবা বিন্দু এ দুয়ের মধ্যে একটা না হইলে সৃষ্টি মোটেই হয় না। সৃষ্টি হইতে গেলে শক্তিগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সংহত করিয়া ব্যূহ রচনা করিয়া লইতে হয়। ইহার বিরোধী অবস্থাটির নাম বৃত্র। বজ্র বৃত্রের সংহারক এবং সেই বজ্র তপঃশক্তির নিরতিশয় ঘনীভূত এবং একাগ্র অবস্থা।

প্রজাপতিকে সৃষ্টির সূচনায় এই তপস্যাটি অবশ্যই করিতে হইয়াছিল। এখনও প্রত্যেক খণ্ড সৃষ্টিতে অথবা নিত্য সৃষ্টিতে এই তপস্যা চলিতেছে—, প্রাণে, মনে সর্ব্বত্র।

বৃত্রের সংহার এই কথাটিকে আমাদের সাবধানে লওয়া উচিত। বৃত্রের সংহার হয় এ কথার মানে এ নয় যে, বৃত্রের লোপ হইয়া যায়। বৃত্রের সত্তা শক্তির সত্তা। শক্তির ধ্বংস নাই। শক্তি এক আকার হইতে অন্য আকারে রূপান্তরিত হইতে পারে মাত্র। আমরা এঞ্জিনে যে কয়লা পোড়াইয়া থাকি তার শক্তি ডাইনামো যন্ত্রের সাহায্যে তাড়িত-শক্তিতে পরিণত হয়, সেই তাড়িত-শক্তি আবার ইলেকট্রো-মোটর যন্ত্রের সাহায্যে অন্যরূপে পরিণত হইয়া ট্রাম চালাইয়া থাকে, আমাদের মাথার উপর পাখা ঘুরাইয়া দেয়। এইভাবে শক্তির রূপান্তর অহরহঃ চলিতেছে। শক্তি এক আকারে অন্তর্হিত হয়, অন্য আকারে আবির্ভূত হয়। মোটামুটি হিসাবে শক্তির জমা-খরচে গরমিল না হওয়াই দেখিতে পাই। এ কথাটা অনেকদিন হইতে বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষিত সত্য হইয়া রহিয়াছে। বৃত্র যখন আসলে শক্তিস্বরূপ, তখন আমাদের মানিতে হইবে যে বৃত্রের ধ্বংস নাই। বজ্রের প্রভাবে বৃত্রের ধ্বংস হয় না, রূপান্তর হয় মাত্র। সে রূপান্তরের নামই মৃত্যু। বন্য হস্তী অথবা মহিষ বেজায় দুর্দান্ত পশু ; ছাড়া থাকিলে তারা আমাদের সর্বনাশ করিতে পারে। কিন্তু উপায়বিশেষের দ্বারা যদি তাদের পোষ মানাইতে পারা যায়, তবে তাদের দ্বারা আমাদের প্রভূত ইষ্ট সাধন হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে বন্য হস্তী বা মহিষ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল না, অথচ তাহাদের বন্য উচ্ছৃঙ্খল ভাবটি ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। যে শক্তি বন্য উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় থাকিয়া আমাদের উপর উপদ্রব করিতেছিল, সে শক্তি আমাদের বশে আসিয়া আমাদের উপকারক হইয়া দাঁড়াইল। পোষ মানাইয়া আমরা শক্তিটির মোড় ফিরাইয়া দিই মাত্র। যে শক্তি আগে আমাদের প্রতিকূল ছিল, সে শক্তিকে আমরা অনুকূল করিয়া লই। শক্তি প্রতিকূল থাকিলে তার নাম আমরা দিই দৈত্য অথবা দানব। বৃত্র এই হিসাবে দৈত্য বা দানব। শাস্ত্র অনেক জায়গায় "অসুর" শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। এক ঋগবেদ-সংহিতায় প্রায় সত্তর জায়গায় অসুর শব্দটির প্রয়োগ আছে দেখিতে পাই। প্রাচীন পারসিকদের ধর্ম্মশাস্ত্রে (জেন্দ্ আবেস্তায়) এই অসুর "অহুর" হইয়াছেন। দৈত্য ও দেবতা এই দুই পর্য্যায়েই অসুর শব্দের প্রয়োগ আমরা দেখিতে পাই। যাস্ক, সায়ণাচার্য প্রভৃতি আচার্য্যেরা 'অসুর' কথাটির যে নিরুক্তি দিয়াছেন, তাতে মনে হয় যে বলবান্ অথবা প্রাণ-শক্তি-সম্পন্ন সত্তাকে অসুর বলিয়া অভিহিত করার দস্তুর এককালে ছিল। এইজন্য দেবতারাও অসুর, আবার দৈত্যরাও অসুর। অসুর শব্দে কেবল দৈত্য বুঝাইবে, দেবতা বুঝাইবে না—এ নিয়ম করিতে গেলে আমাদের বলিতে হয় যে, শক্তির প্রতিকূল অবস্থাই অসুরত্ব। শক্তি অনুকূল হইলে সেটিকে আর আমরা অসুর বলিতেছি না।

অনুকূল অথবা প্রতিকূল এ সকল কথা ব্যবহার করিতে হইলে সৃষ্টির মূলে কোন

একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আছে ইহা আমাদের বলিতে হয়। লক্ষ্য ছাড়া অনুকূল বা প্রতিকূল এ দুইটি কথার কোন মানে হয় না। সৃষ্টির গোড়াকার সেই লক্ষ্যটি যে কি তার বিচার করা এ ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। আমরা বৃত্রকে যে অসুর বলিয়াছি তাহার ভিতরে মতলব রহিয়াছে দুইটি : প্রথমতঃ, বৃত্র বল বা শক্তিস্বরূপ ; ইন্দ্র অথবা অগ্নি যেমন বলের পুত্র বলিয়া বেদে কথিত হইয়াছেন, বৃত্রকেও আমরা সেই রকম মনে করিতে পারি। বৃত্রকে অসুর বলার এই একটা মতলব। দ্বিতীয়তঃ, শক্তি অনুকূল হইতে পারে, অথবা প্রতিকূল হইতে পারে, এই ভেদটি মনে রাখিয়া আমরা বৃত্রকে শক্তির প্রতিকূল অবস্থার প্রতিমূর্তি ভাবিতেছি। যে উপায়-বিশেষের দ্বারা সেই প্রতিকূল অবস্থাটিকে লক্ষ্যের অনুকূল করিয়া লওয়া যায়, সেই উপায়-বিশেষের নাম দিয়াছি তপস্যা এবং বজ্র। অতএব আমরা দেখিতেছি যে বন্য উচ্ছৃঙ্খল হস্তী পোষ মানিলে যেমন হয়, বজ্রের দ্বারা বৃত্র সংহার হইলে বৃত্রেরও তেমনি অবস্থা হয় ; অর্থাৎ যে শক্তিটি প্রতিকূল ছিল, সেটি অনুকূল হয়, যেটি বাধক ছিল সেটি সাধক হয়। আসলে বৃত্ররূপ শক্তির একটুখানিও অপচয় বা ধ্বংস হয় না।

জড়ে, প্রাণে, মনে সর্বত্র শক্তির খেলা চলিতেছে। এ খেলায় শক্তি-বিশেষের হার-জিত আছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শক্তি মাত্রেই অমর। যে শক্তিটি হারিয়া গেল, সে শক্তিটি চেহারা বদলাইয়া ফেলিল মাত্র ; তার মোড় ঘুরিয়া গেল। ইস্পাত লোহা চুম্বকের সংসর্গে আসিয়া চুম্বকত্ব পাইয়া থাকে ; সে চুম্বকত্ব অবস্থা-বিশেষে স্থায়ী হইতে পারে অথবা না হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে চুম্বকের প্রভাবে অথবা তাড়িত-শক্তির প্রভাবে লৌহের নিজস্ব শক্তি কিছুকালের জন্য অথবা কায়েমি ভাবে রূপান্তরিত হইয়া যায়। কিন্তু এ কথা মনে করা চলে না যে সে ক্ষেত্রে লৌহের নিজস্ব শক্তিটি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আগুনে পোড়াইয়া অথবা অন্য উপায়ে আগন্তুক চৌম্বক-শক্তি তাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তখন আবার যে লোহা সেই লোহাই হইল। বেশী উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই—আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, শক্তি বিজিত হওয়া মানে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া নহে। বরং তপঃশক্তি প্রয়োগের পূর্বে যে শক্তিটি কোন মতে বাগ মানিতে ছিল না, এবং আমাদের লক্ষ্যের সাধক হইতেছিল না, তপঃশক্তির প্রয়োগের ফলে, সেটিকে আমরা বাগ মানাইয়া লইতে পারি। প্রজাপতিকে সৃষ্টির সূচনায় তাহাই করিতে হইয়াছিল। তখন বিশ্বের শক্তিপুঞ্জ এমন একটা অবস্থায় ছিল, যে অবস্থায় সেটি থাকিলে বিশ্বের সৃষ্টির আনুকূল্য না হইয়া বরং বাধাই হইয়া থাকে। সেই বাধা বা অন্তরায়ের ভাবটিকে কখনও "রাত্রি" কখনও বা "তমঃ" ইত্যাদিরূপে বলা হইয়াছে। সেই বাধা বা অন্তরায়টি দূর করার জন্যই প্রজাপতির তপস্যা। তপস্যা যেমন যেমন সফল হইতে থাকে, গোড়াকার সেই বাধা বা অন্তরায়টিও তেমন তেমন তাহার বৈরভাব পরিহার করিয়া সাধক ও সহায়ভাবে পরিণত হইতে থাকে।

এইভাবে দেখিতে গেলে আমরা বলিতে পারি যে, গোড়াকার সেই অসুরের ধ্বংস হইবার পর তার দেহটা সৃষ্টির উপাদান অথবা উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইবার যোগ্য হইয়া থাকে। কেবল আমাদের দেশে বলিয়া নয়, সকল দেশেরই পুরাণকারেরা সৃষ্টির কথাটিকে এইভাবে বলিয়া গিয়াছেন। গোড়ায় যেন এক মহাদৈত্য এই বিশ্বটাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছিল; আদিদেবতা বজ্র বা ঐ রকম একটা কিছু আয়ুধ দ্বারা সেই দৈত্যটাকে সংহার করিলেন, এবং সেই দৈত্যটার দেহপিণ্ড লইয়াই এই বিশ্বের কাঠামোখানা তৈয়ারি করিলেন। গোড়াতে যেটি ছিল বৈরী, পরে সেইটিই হইল সৃষ্টির উপাদান বা উপকরণ। সৃষ্টির যাহা উপাদান বা উপকরণ তাহার একটা স্বাভাবিক বাধা দিবার শক্তি আছে। সেই শক্তিটাকে আমরা কখনও বলি বস্তুর জড়তা, কখনও বলি দৃঢ়তা ইত্যাদি। মাটি হইতে ঘট কলস তৈয়ারি হইয়া থাকে বটে; কিন্তু মনে করিলেই হয় না। তারজন্য মাটিকে ভাল করিয়া ছানিয়া নরম করিয়া লইতে হয়। নরম না করিয়া লইলে তাতে কোন রূপ বা আকার দেওয়া যায় না। মাটির একটা স্বাভাবিক জড়তা আছে বলিয়াই আমাদের এই কর্মটি করিতে হয়। মৃত্তিকার ভিতরে জড়তার আড়ালে বৃত্রাসুর বাস করিতেছে, কুম্ভকারকে ইন্দ্রের মত সেই বৃত্রাসুরটিকে বধ করিয়া লইতে হয়; করিলে মৃত্তিকাই নিজের জড়তা পরিহার করিয়া কুম্ভকারের সৃষ্টির উপাদান বা উপকরণ হইয়া থাকে। কুম্ভকার সম্বন্ধে যে কথা, সূত্রধার অথবা ভাস্কর প্রভৃতি শিল্পী সম্বন্ধেও সেই একই কথা। কাঠ হইতে নানারকম আসবাব তৈয়ারি হইতে পারে বটে, কিন্তু অনেক চেষ্টা-চরিত্র করবার পর। করাত, বাটালি, রঁ্যাদা প্রভৃতি হাতিয়ারের সাহায্যে কাঠের স্বাভাবিক জড়তা ও বৈরূপ্য দূর করিয়া লইতে হয়; তাতে মেহন্নৎ বড় কম হয় না, কম কৌশলের আবশ্যকতা হয় না। ভাস্কর পাথর খুদিয়া মূর্তি নির্মাণ করে; মূর্তি পাথরের ভিতরেই রহিয়াছে বটে; কিন্তু তার আবরক অংশগুলি বাদ দিয়া তাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য ভাস্করকে কম যত্ন করিতে হয় না। সকল ক্ষেত্রের এইরকম সব দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এই কথাগুলি মনে রাখিলে আমরা বুঝিতে পারিব কেমন করিয়া প্রজাপতির সৃষ্টির সূচনায় সৃষ্টির অন্তরায়স্বরূপ দৈত্যটির সংহার করিয়া তাহার দেহটিকেই আবার সৃষ্টির উপাদান বা উপকরণরূপে পাইয়াছিলেন। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, গ্রীস, মিশর, ব্যাবিলন চীন—এই সকল দেশেরই পুরাণ-কথায় এই রকমের একটা গল্প চলিয়া আসিয়াছে; নাম হয়ত আলাদা, কিন্তু বস্তুতত্ত্ব এক। কোথাও বা দেখিতে পাই পরাজিত টাইটানের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া বিশ্বকর্মা এই বিশ্ব নির্মাণ করিতেছেন; কোথাও বা টাইটনের স্থলে টিয়ামাট্, কোথাও বা আর কিছু।

আমাদের মধুকৈটভের উপাখ্যানের মূলেও এই তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। আমাদের এই পৃথিবীর নাম মেদিনী হইয়াছে কেন? মধুকৈটভের সংহারের পর

তাহাদের মেদো দ্বারা বিধাতা ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া এর নাম হইয়াছে মেদিনী। ব্রহ্মার সৃষ্টির উপক্রম এবং মধুকৈটভের আবির্ভাব সম্বন্ধে রহস্যটি আমরা অন্য প্রসঙ্গে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানের রহস্যের যে অংশটি আমরা দেখাইতে চাই, সেটি এই: যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু পাঁচ হাজার বছর ধরিয়া দৈত্যযুগলের সঙ্গে লড়িলেন; কিন্তু কাহারও হার-জিত হইল না। তখন ভগবানের যুদ্ধে প্রীত হইয়া দৈত্যযুগল তাঁহাকে বর দিতে চাহিল। ভগবান্ বর চাহিলেন—তোমরা উভয়ে আমার বধ্য হও। দৈত্যযুগল বলিল, তথাস্তু; কিন্তু একটা সর্ত্ত তোমাকে পালন করিতে হইবে; "আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা"—এ সমস্তই জলময় দেখিতেছি; জলে আমাদের মরিতে সাধ নাই; যে জায়গাটায় জল নাই, সেইখানে তুমি আমাদের উভয়কে বধ কর। মূলে "বধ" কথাটি নাই, "জহি" অর্থাৎ, জয় কর, এই কথাটি আছে। এতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শক্তি-বিগ্রহ মধুকৈটভের আসলে বধ বা ধ্বংস হয় না; পরাজয় হয় মাত্র; যেমন বন্য হস্তী বা মহিষের পোষ মানার ফলে পরাজয় হয়, তেমনিধারা। পুরাণকার যে সময়ে এই লড়াইয়ের রিপোর্ট লিখিতেছেন, সে সময়ে নিখিল জগৎ একার্ণবীকৃত হইয়াছিল; জল ছাড়া তখন আর কিছুই ছিল না। এ জল মানে যে জগতের একটা একাকার নির্বিশেষ অবস্থা, তা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি। আমরা যেটাকে জল বলি, সেইটিই সত্য সত্য যে সব ছাইয়া ফেলিয়াছিল, এমন নয়। সে যাই হউক, মধুকৈটভ সর্ত্ত করিলেন—আমাদিগকে তুমি জলে মারিতে পারিবে না। এ অতি মজার সর্ত্ত। জল ছাড়া যেখানে কিছুই নাই, সেখানে জলে মারিতে পারিবে না, এ কথা বলায় প্রকারান্তরে অবধ্য রহিবারই সর্ত্ত করিয়া লওয়া হইল। কিন্তু মধুকৈটভের হিসাবে ভুল হইয়াছিল; এবং সেই ভুলেই তাহাদের মৃত্যু অথবা পরাজয়।

বিশ্ব তখন জলমগ্ন সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহাতে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে, সেই পরম পুরুষ মহাবিষ্ণু স্বয়ং ত' জল হইয়া ছিলেন না। পুরাণে দেখিতে পাই, তিনি জলের উপর শেষ-শয্যায় শুইয়াছিলেন। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, বিশ্বের লয়ে, অর্থাৎ, একার্ণবীভূত অবস্থায়, তাঁর লয় হয় না, তিনি নিজে জল বা জলের মতন একটা কিছু হইয়া যান না। আমার সামনে খানিকটা জল রহিয়াছে। সেই জলকে আমি উপায়-বিশেষের দ্বারা কখনও বা বরফের চাপ বানাইতে পারি, কখনও বা অদৃশ্য বাষ্প বানাইতে পারি; বরফের চাপকে ইচ্ছা করিলে গলাইয়া আবার জল করিতে পারি। এ খেলায় জল নানা আকারে রূপান্তরিত হইতেছে। কিন্তু আমি যে খেলিতেছি, আমার ত রূপান্তর হইতেছে না; আমি যে সেই-ই আছি। এ জগৎ সম্বন্ধেও সেই কথা। এ জগতের সূক্ষ্ম

উপাদানটি (প্রকৃতিই হউক, আর ঈশ্বরই হউক) কখনও বা চাপ বাঁধিয়া বিশ্বের এই বিচিত্র অবয়ব নির্ম্মাণ করে, কখনও বা আবার সে চাপ গলিয়া গিয়া সব "জলময়" হইয়া যায়। যাঁর এই খেলা এবং যিনি এই খেলা করিতেছেন, তিনিই তাঁর পূর্ণ সত্তায়, কখনও চাপও বাঁধেন না, আবার কখনও গলিয়া জলও হইয়া যান না। এ জগতের সত্তাটিকে তাঁর সত্তা হইতে তফাৎ করিতেছি না; তফাৎ করিলে, তাঁর সত্তা পূর্ণ সত্তা হয় না। কিন্তু যেমনধারা দেহের মধ্যে লোমকূপ, কিন্তু লোমকূপের ভিতরে দেহটা নয়, তেমনি তাঁর পূর্ণ সত্তার এক অংশে এই জগতের সত্তা। এই মহাসত্যটি ঋগ্‌বেদের এবং অথর্ব্ববেদের পুরুষ সূক্তে, গীতায় এবং আরও নানা জায়গায় অতি সুন্দর করিয়া বলা হইয়াছে। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—আমি এই সমগ্র জগৎ আমার একাংশে ব্যাপিয়া রহিয়াছি। পুরুষসূক্ত (ঋগ্‌বেদ ১০।৯০, অথর্ব্ববেদ ১৪।৬) বলিতেছেন,—আমি এ চরাচর বিশ্ব সর্ব্বতোভাবে স্পর্শ করিয়াও ইহাকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছি। কেবল সৃষ্টির সময়ে নয়, প্রলয়ের সময়েও তিনি এই প্রপঞ্চকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। থাকেন বলিয়াই সৃষ্টি হয়, প্রলয় হয়। কুম্ভকার নিজেই মৃৎপিণ্ড হইলে কুম্ভাকারে সৃষ্টি হয় না; উপাদান বা উপকরণ হইতে, যিনি কর্ত্তা বা নির্ম্মাতা, তাঁহার আলাদা হওয়া চাই। মাকড়সার মতো নিজের শরীর হইতেই সৃষ্টির উপকরণ বস্তুটি তিনি হয়ত বাহির করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু বাহির করিয়া, পৃথক করিয়া না দিলে, তা লইয়া কোনো কিছু সৃষ্টি করা যায় না। প্রলয়ের সময়ে তাঁরও যদি প্রলয় হয়, তবে সে প্রলয়ের আর ভঙ্গ হয় না; সে প্রলয় প্রলয়ই রহিয়া যায়। মহাবিষ্ণু মানে যে সত্তা নিরতিশয়রূপে সর্বব্যাপী। এ ব্রহ্মাণ্ড খুবই প্রকাণ্ড সন্দেহ নাই; কিন্তু মহাবিষ্ণুর পূর্ণ সত্তার এটি একাংশ, অথবা একটি কলা মাত্র। এই জন্য ব্রহ্মাণ্ডের যখন জলময় অবস্থা হয়, তখন মহাবিষ্ণু নিজে তাঁর পূর্ণ সত্তাতে জলময় হইয়া যান না। জলের উপরে একটা কিছু থাকে—যেটি বিশ্বে ওতপ্রোত থাকিয়াও বিশ্বাতীত ও বিশ্বাতিগ। সেই বস্তুটি আভাষে বুঝাইবার জন্য পুরাণকার কারণ-সলিল উপরি, অনন্ত শয্যায় বিষ্ণুকে শয়ান করাইয়াছেন। শয়ন এইজন্য যে, বিশ্বের সম্পর্কে তখন তিনি কিছুই করিতেছেন না; তখন লয়ের অবস্থা কিনা। শেষ শয্যা এই জন্য, এবং সে শেষ সাক্ষাৎ অনন্ত নাগ এই জন্য যে, তখন মহাবিষ্ণুর মহাশক্তি বিশ্বের সম্পর্কে যেন প্রসুপ্ত হইয়া থাকে—একটা মহানাগের মতো যেন কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া থাকে। শক্তির প্রসুপ্ত অবস্থা বুঝাইতে নাগের কুণ্ডলী অবস্থা কল্পনা করা প্রাচীনদের দস্তুর ছিল, কেবল আমাদের দেশেই নয়, অপরাপর অনেক দেশেই।

মধুকৈটভ এই তত্ত্বটির সাক্ষাৎ পায় নাই, সুতরাং ভাবিল বুঝি জল ছাড়া আর কিছুই নাই। তারা ভুলিয়া গেল যে, ব্রহ্মসত্তা জল, স্থল, অন্তরীক্ষ নানা আকারে

বিরাজ করিয়াও, ওই সকল আকারের উর্ধ্বে রহিয়াছেন। বিশ্বব্যাপী জলরাশি অথবা কারণ-সলিল সেই ব্রহ্মবস্তুর একদেশ অথবা একটি কলামাত্র। সেই একটি মাত্র কলাকে সব দেখিয়া ও ভাবিয়া মধুকৈটভ ভুল করিল, এবং সেই ভুলে মরিল। মধুকৈটভের সর্ত্ত পালন করিতে এ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কেহ অবশ্য পারগ হইত না; এমন কি স্বয়ং ব্রহ্মাও পারগ হইতেন না; কেন না ব্রহ্মারও ব্রহ্মাণ্ডের মত উদ্ভব ও বিলয় আছে; তিনিও এই ব্রহ্মাণ্ডের সামিল। স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল, নিখিল জীববর্গ—এ সকলই তখন কারণ-সলিলে বিলীন হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং, মধুকৈটভের সর্ত্ত মানিয়া চলিবার অধিকারী তখন ব্রহ্মাণ্ডে কেহই ছিলেন না। একা মহাবিষ্ণুই অথবা ব্রহ্মসত্তাই মধুকৈটভের সেই সর্ত্ত পালনে পারগ; কেন না, আমরা দেখিলাম যে, তিনি একটি মাত্র কলায় জলমগ্ন হইয়াও অপরাপর কলায় সেই জলরাশির উর্দ্ধে বিরাজ করিতেছেন, মধুকৈটভের ফাঁকি সুতরাং এ শক্ত পাল্লায় টিকিল না। তাদের সর্ত্ত মানিয়া লইয়া বিষ্ণু তাহাদিগকে সংহার করিলেন। কোথায়? জলমগ্ন ব্রহ্মাণ্ডের কোনোখানেও নয়, নিজের জঘন-দেশের উপর তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া। এ জঘন-দেশ বলিতে কি বুঝায়? বিষ্ণুর এমন এক ধাম অথবা কলা, যে ধাম বা কলা প্রলয়ের সময়েও মহার্ণবে বিলীন হইয়া যায় না, বা যায় নাই। কারণ-সলিল যেন তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছিল; বিষ্ণু যেন কারণ-সলিলে অবগাহন করিতে যাইয়া, তাঁহার পদতল ছাড়াইয়া উঠিতে পারে, এতখানি জল কোথাও দেখিতে পান নাই;—স্বর্গ-মর্ত্ত পাতাল কিন্তু তখন সব সেই জলে তলাইয়া গিয়াছিল। বিষ্ণুর জঘন হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তমাঙ্গ পর্য্যন্ত সকল অঙ্গ সেই জলরাশি হইতে উর্দ্ধে বিরাজ করিতেছিল।

শুধু মধুকৈটভ বধের বেলা নয়, হিরণ্যকশিপু বধের বেলাতেও (নরসিংহাবতারে) তাঁকে এই খেলাটি খেলিতে হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপু বর লইয়াছিলেন—তিনি যেন জল স্থল অন্তরীক্ষ এ তিনের কোন জায়গাতেই বধ্য না হন। কিন্তু হিরণ্যকশিপু ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, জল স্থল অন্তরীক্ষ ব্রহ্মবৈবস্তের একটা কলা বই আর কিছু নয়; সুতরাং তাঁর লব্ধ বরে তিনি ব্রহ্মের একটা মাত্র কলায় অবধ্য হইতে পারিয়াছিলেন; ব্রহ্মের যে অপরাপর কলা আছে, এবং সে সকল কলায় তাঁর যে লয় হইতে পারে, এ কথাটি তিনি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখেন নাই। গাছের ডালপালার হিসাব লইতে গিয়া তিনি গাছের গুঁড়িটা ও মূলটাকেই হিসাবে বাদ দিয়াছিলেন। তাই মধুকৈটভের মত বিষ্ণুর ক্রোড় দেশে স্থাপিত হইয়া তাঁর সংহার হইল। এ কথার অধিক বিস্তার এ ক্ষেত্রে আমরা আর করিব না।

হিসাবের এই ভুলের জন্য মধুকৈটভের সংহার হইল, তা আমরা দেখিলাম। কথাটা আর একটু স্থূল ভাবেও দেখা যাইতে পারে। মধু ও কৈটভ যে তমঃ ও রজঃ গুণ সে কথা স্বয়ং পুরাণকারই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। প্রলয়ের অবস্থায় বিশ্ব

যখন জলময়, তখন বিশ্বে তমের আধিপত্য। সেইটাকেই বলা হইয়াছে রাত্রি। অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই করিয়া অন্ধকারকে তাড়ান যায় না। একটা দীপ জ্বালিবা মাত্রই হাজার হাজার বছরের অন্ধকার এক নিমেষেই সরিয়া যায়। তমের দ্বারা তমের ধ্বংস হয় না। সত্ত্বের দ্বারা তমের ধ্বংস হইয়া থাকে। সত্ত্ব প্রকাশক, তম আবরক; প্রকাশ হইলে আর ঢাকা থাকে না। মধুকৈটভ ভাবিয়াছিল এখন রাত্রি বা তমঃ ছাড়া ত' আর কিছু নাই দেখিতেছি, রাত্রি বা তমঃই ত আমরাই; আমরা নিজেদেরই বধ্য হইব কিরূপে? অতএব সর্ত্ত করা যাক্ যেখানে তমঃ বা জল নাই, সেইখানে আমরা বধ্য হইব। সর্ত্ত করিবার সময় ভুলিয়া গেল যে সত্ত্বরূপী বিষ্ণু তখনও রহিয়াছেন, এবং তিনি আর যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াও নাই। সত্ত্ব উদ্রিক্ত হইলেই রজস্তমের পরাভব অবশ্যম্ভাবী। সবই তমোময় অথবা জলময়, সত্ত্বশক্তি বিদ্যমান নাই, সুতরাং, তাদিকে পরাভব করার মত কোন কিছুই নাই—এইটাই হইল মধুকৈটভের হিসাবের ভুল।

যাহা হউক, মধুকৈটভের সংহার ত হইল। এ সংহারলীলায় আরও কিছু রহস্য আছে, সে সকল আমরা প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করিব। যেমন মধুকৈটভের বিষ্ণুকে বর দিতে চাওয়া, বিষ্ণুর সেই বর অঙ্গীকার করা; ইত্যাদি, ইত্যাদি। এখানে আমরা বলিতে চাই, মধুকৈটভের দেহটা সৃষ্টির উপাদানরূপে কল্পিত হইয়াছিল। মধুকৈটভকে রজঃ ও তমঃ গুণ বলিয়া ধরিয়া লইলেও, এ কথাটী আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। সত্ত্বগুণ জাগরিত না হইলে, এবং সত্ত্বগুণের অধ্যক্ষতা না থাকিলে ছন্দোবদ্ধ ভাবে সৃষ্টির সম্ভাবনাই হয় না। এইজন্য রজঃ ও তমঃ গুণ সত্ত্বের অধীনে আসা দরকার। এরই নাম মধুকৈটভ পরাভব। কিন্তু তমঃ ও রজঃ গুণ একেবারে বিলুপ্ত হইতেও পারে না; হইলে, সৃষ্টি-ব্যাপারও নির্বাহ হয় না। খাঁটি সত্ত্বগুণ একা থাকিতে পারে না, থাকিলেও তা দ্বারা কোন কাজ হয় না। এইজন্য সৃষ্টির সূচনায় প্রবল তমঃ ও রজঃগুণকে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল করিয়া সত্ত্বগুণের অধীন করা হইয়াছিল; সত্ত্বগুণের অধীন ভাবেই ইহারা বিশ্বের বিচিত্র গঠনে বাধক না হইয়া সাধক হইয়াছে। সেই বন্য হস্তী বা মহিষ পোষ মানার ফলে যেমন হয়, তেমনই হইয়াছে। এইভাবে মধুকৈটভের দেহ এই বিশ্বের নির্ম্মাণে উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ও হইতেছে। বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে মধুকৈটভের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াছিলেন। সুদর্শন হইতেছেন সত্ত্বগুণোপেত কালশক্তির প্রতিমূর্ত্তি; চক্র দ্বারা খণ্ডিত শরীরের কতক কতক ভাগ সচল বা অস্থাবর; সেইগুলি বায়ু প্রভৃতি; আর কতকগুলি ভাগ যেন অচল বা স্থাবর, সেইগুলি হইল মধুকৈটভের মেদঃ ও অস্থি—যাতে এই জগতের কলেবরে গুরুত্ব, কাঠিন্য, জড়তা প্রভৃতি ধর্মগুলি প্রকাশ পাইয়াছে। এই মেদের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া আমাদের এই লোক মেদিনী আখ্যা পাইয়াছে।

বেদে, ব্রাহ্মণে, উপনিষদে, স্মৃতিতে, পুরাণে, তন্ত্রে ঐ একই কথা বারবার আমরা দেখিতে পাই—প্রজাপতি তপস্যা করিয়াছেন এবং তপস্যা করিয়া এ সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রজাপতির তপস্যা যে জ্ঞানময়, এ কথা স্বয়ং শ্রুতিই বলিয়াছেন। এ কথাটি খোলসা করিয়া না বুঝিলে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক পুরাণ আখ্যায়িকার রহস্য আমরা মোটেই বুঝিতে পারিব না। যাঁরা সেই সব আখ্যায়িকাগুলি কেবল উপর উপর বুঝিতে চান, তাঁরা প্রাচীন যুগের বিদ্যার প্রতি অবিচার করিয়া থাকেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

প্রাচীন যুগে স্মরণাতীত কালে একটি সত্য ও পরিণত বিদ্যা প্রচলিত ছিল। কালক্রমে সে বিদ্যার মর্ম্মলোকের প্রদীপটি নিভিয়া যাইবার ফলে, সে বিদ্যা উত্তরকালে অনেকটা প্রহেলিকার আকার ধারণ করিয়াছিল; অনেকানেক গল্প এবং রূপকের অন্তরালে সে বিদ্যা যেন আত্মগোপন করিয়াছিল। এই কথাটি মনে রাখিলে, আমরা অতীতের প্রতি সহসা আর অবিচার করিতে যাইব না। আমরা যে অনেক সময় অতীতের পুরাণ কাহিনীগুলিকে "আষাঢ়ে গল্প" বলিয়া উড়াইয়া দিতে যাই, অথবা তাদের ভিতরে নিতান্ত মোটা রকমের তথ্য ছাড়া আর কিছুই খুঁজিয়া পাই না, তার কারণ এই যে আমরা অতীতের বিদ্যাটিকে ধারণায় এবং কল্পনায় একপ্রকার তুচ্ছ করিয়া রাখিয়াছি। বড় বড় এবং গভীর যে সকল তত্ত্ব, সে তত্ত্বগুলি যেন বর্ত্তমান যুগেরই স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি। পুরাতত্ত্বের আলোচনায় একটা নূতন সূত্রের বর্ত্তিকা হস্তে করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। বেদ, ব্রাহ্মণ, পুরাণ প্রভৃতিতে মানব-মনের যে প্রতিকৃতি আমরা পাইয়া থাকি, সে প্রতিকৃতি যে শিশুর প্রতিকৃতি, অথবা "বর্বরের" প্রতিকৃতি, এ ধারণা লইয়া চলিতে নারাজ হইতে হইবে। প্রাচীন মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যানে এবং প্রাচীন গল্পরূপাদির রহস্যোদ্‌ঘাটনে আমরা তাই কোনোরূপ সঙ্কোচ, কুণ্ঠা অথবা কার্পণ্য লইয়া আসি নাই। যে সকল ঋষিরা বৈদিক ইন্দ্রের হস্তে বজ্রায়ুধ ন্যস্ত করিয়াছেন, তাঁরা যে ইন্দ্রকে বর্ষণকারী দেবতা, বৃত্রকে বৃষ্টির প্রতিবন্ধক এবং বজ্রকে কেবলমাত্র সাধারণ বাজই ভাবিয়া গিয়াছেন, তার বেশী আর তাঁদের চিন্তার দৌড় ছিল না, অথবা সম্ভব হয় নাই—হালের বেদব্যাখ্যার এ ধারায় সম্মতি দিতে আমরা অপারগ হইয়াছি। হালের সমালোচকদের সদাই ভয়, পাছে তাঁরা তাঁদের প্রবীণ ও উন্নত চিন্তা প্রাচীন যুগের সেই সব সরল "চাষাকবি"-দের মাথায় চাপাইয়া বসেন। আমদের মনে হয় যে, ভয়ের কারণ উল্টাদিকে রহিয়াছে। সে কালের বিদ্যা, আর এ-কালের বিদ্যার মধ্যে বড় বেশী মিল নাই। সে কালের বিদ্যায় মানুষের জ্ঞাতব্যের যে দিকটা ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, একালের বিদ্যায় সে দিক্‌টা একরকম অন্ধকারে পড়িয়া গিয়াছে, পক্ষান্তরে, একালের বিদ্যায় জ্ঞাতব্যের যে দিকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, কে জানে, সে কালের বিদ্যাতেও সে দিক্‌টা ঠিক এমনভাবে পরিস্ফুট

হইয়াছিল কি না। একালে প্রধানতঃ জড় বিদ্যার "মরসুম" দেখিতেছি। অধ্যাত্ম বিদ্যা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অস্পষ্ট ভাসা ভাসা, আন্দাজী রকমের; সেটাকে ঠিক বিদ্যা অথবা "সায়েন্স" বলা যায় না। সেকালে কিন্তু এ বিদ্যাটিকে "সায়েন্সের" আকারেই অনুশীলিত হইতে দেখিতে পাই। যিনি স্বয়ং প্রমাতা না হইয়া প্রমাণ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি গায়ের জোরে কেমন করিয়া বলিতে পারেন যে, প্রাচীন যুগের সে অধ্যাত্ম-বিদ্যা আদপে সায়েন্সই ছিল না, তার বেশীর ভাগই অনাবশ্যক এবং মিথ্যা জঞ্জালে ভরা? তপস্যা এবং বজ্ঞ সম্বন্ধে এবং আনুষঙ্গিক অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে আমরা যে মর্ম্ম-ব্যাখ্যা দিবার প্রয়াস পাইয়াছি, সে মর্ম্ম-ব্যাখ্যা যে আমাদেরই স্ব-কপোল কল্পিত, অথবা পরবর্ত্তী কালের দার্শনিকদের মস্তিষ্কে উদ্ভাসিত, এ কথা আমরা মানিতে নারাজ।

বর্বরের ব্রহ্মজ্ঞান

প্রাচীনদের দৃষ্টিতে বিদ্যার একটা অনাদি প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। জাহ্নবী-ধারা কখনও ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে, কখনও বা হরজটাজালে "গোপন" হইয়া পড়িলেও বিষ্ণুর পরমপদ হইতে আরম্ভ করিয়া সাগরসঙ্গম পর্যন্ত তার প্রবাহ যেমন হিন্দুর চক্ষে অক্ষুণ্ণ, অব্যাহত, বিদ্যার ধারাও (Tradition) তেমনি, যুগবিশেষে বা দেশবিশেষে গুপ্ত অথবা ব্যক্ত হইলেও, সত্তায়, সংস্কারে ও স্বরূপে অবিচ্ছিন্ন। বিদ্যার এই অবিচ্ছিন্ন ধারাই ভারতবর্ষে বেদপন্থী সমাজে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও আগম নামে বরণীয় হইয়া আসিতেছে। বিদ্যার মূল তত্ত্বগুলি কোন এক নির্দিষ্ট দিন হইতে মানুষের জিজ্ঞাসা ও মননের বিষয় হইয়াছে—এমন মনে করা যায় না। তত্ত্বচিন্তার বাহিরের পরিচ্ছদ, অর্থাৎ নাম ও রূপ, অবশ্য যুগে যুগে, দেশে দেশে, আলাদা হইয়াছে। কিন্তু এমন কোন যুগ দেখানো যায় না যে যুগে আমরা বলিতে পারি—কোনো পুরুষের মধ্যেই তত্ত্বচিন্তার স্ফূর্তি হয় নাই। উপনিষৎ যুগে যে তত্ত্বচিন্তার পরিচয় আমরা পাই, মন্ত্র বা ব্রাহ্মণযুগে সে তত্ত্বচিন্তা জাগে নাই, মানুষের আত্মা ততদূর বিকশিত হয় নাই,—এ অনুমানের কোনো দৃঢ় ভিত্তি আছে বলিয়া কোনো প্রাজ্ঞ হিন্দুই মনে করেন না।

উপনিষৎ রহস্যবিদ্যা। অতি উৎকৃষ্ট অধিকারী শিষ্যকে গুরু কর্তৃক এই বিদ্যা প্রদত্ত হইত,—স্বয়ং উপনিষৎই নানা প্রসঙ্গে এ-কথার সাক্ষ্য দিতেছেন। "উপনিষৎ" এ শব্দটাই গুপ্ত বা রহস্য অর্থ বুঝাইত—যেমন ব্রহ্মের উপনিষৎ "সত্যম্" ইত্যাদি। উপনিষৎ আরণ্যকের অন্তর্গত; আরণ্যকের বুৎপত্তিগত মানে—The Secret Doctrine. শঙ্করাচার্য প্রভৃতি উপনিষদের ভাষ্যকারেরা ভাষ্য-ভূমিকায় উপ+নি+সদ্—এই কয়টি উপাদান লইয়া যেমন ব্যাখ্যাই দেন না কেন, উপনিষৎ যে রহস্যবিদ্যা, ইহা তাঁহারাও মানিয়া গিয়াছেন। এখন, এই রহস্যবিদ্যা সমগ্র শ্রৌত বিদ্যার একটা অঙ্গ—উত্তমাঙ্গরূপে, বরাবরই বিদ্যমান ছিল। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ—এই চারিটি বেদরূপী বৃষের চারিটি পদ; বেদ-বৃষভ কোনো কালেই মাত্র একটি পায়ে বা দুইটি পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন না। উপনিষৎ বেদান্ত—এ কথার এ মানে নয় যে, "বৈদিক যুগের" চরম পরিণতিকালে ইহা দেখা দিয়াছিল। এ কথার এ মানে নয় যে, গোড়াতে যাজ্ঞিকেরা কেবল যজ্ঞই করিতেন, তত্ত্বচিন্তার কোনো ধার ধারিতেন না; পরে তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বা যজ্ঞানুষ্ঠানে বিরক্ত হইয়া তত্ত্বচিন্তার দিকে মন দিয়াছিলেন। অবশ্য যুগবিশেষে মানুষ-সমাজে

হয়ত আচার-অনুষ্ঠানেরই বাহুল্য ও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকিতে পারে; তত্ত্বচিন্তা তখন থাকিলেও, হয়ত' তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও তত্ত্বদর্শীদের সম্প্রদায় খুব সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। যে সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে বৎসরূপে কল্পনা করিয়া সর্বোপনিষৎ-রূপিণী গাভী হইতে, সুধী-সমাজের কল্যাণ-চিকীর্ষায়, মহৎ গীতামৃত দোহন করিয়াছিলেন, তখন খুব সম্ভবত ঐ প্রকার অবস্থা সমাজে হইয়াছিল। যে যজ্ঞ-বরাহের শাশ্বতী তনুর বন্দনায় পুরাণ-ভারতীর বীণা অক্লান্তবাণী, সে বরাহ সম্ভবত তৎকালে নিজ বরণীয় উত্তমাঙ্গ ও হৃদয় গোপন করিয়া চরণাঘাতেই মহীতল ক্ষুরক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। যজ্ঞীয় ধূমই তাঁর ক্ষুরোত্থিত পাংশুরাজি; সম্ভবত সেকালে সেই যজ্ঞীয় ধূমই সরল ভাবে "ঋতস্য পন্থানং" আশ্রয়ে আদিত্য-মণ্ডলাভিমুখে যাত্রা না করিয়া বেদীর চারিধারে ছড়াইয়া পড়িয়া সমবেত যাজ্ঞিকদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিটা আকুল ও কুণ্ঠিত করিয়া দিয়াছিল। সেই কারণে আবার শ্রীকৃষ্ণকে পাঞ্চজন্য শঙ্খ-নিনাদে জগৎকে এই বাণী শুনাইতে হইয়াছিল—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন; যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে। তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ"—ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু বলা বাহুল্য, সেদিনেও তত্ত্ববিদ্যা লুপ্ত হইয়া যায় নাই; সে বিদ্যা অনুশীলন করার একটি সম্প্রদায় অবশ্যই ছিল।

বিদ্যার শাখাগুলির অঙ্গাঙ্গিভাবটি (organic relation) ভুলিয়া যাই বলিয়াই, আমরা "এ বিদ্যার এই যুগ, ও বিদ্যার ওই যুগ"—এই বলিয়া বিদ্যার ঐতিহাসিক কুঠরী বিলি করিয়া দিতে সুরু করিয়া দিই। মানবাত্মার নানান্ বৃত্তিগুলির মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব আছে বলিয়াই বিদ্যার এই অঙ্গাঙ্গিভাব। মানুষ শুধু কর্মই করিয়া যাইবে, মর্ম বুঝিতে তার জিজ্ঞাসা জাগিবে না; "অয়ং লোকঃ" এর ভাবনাতেই ডুবিয়া থাকিবে, "অসৌ লোকঃ" এর পানে তার নয়ন কদাপি তুলিবে না;—এ অতি অসঙ্গত ও অবাস্তব কল্পনা। সময়ে সময়ে একটার দিকে একটু বেশি জোর পড়িতে পারে; কিন্তু পাশে পাশে আর একটা থাকিবেই; নহিলে যে মানুষ মানুষই হয় না।

অস্ট্রেলিয়ার ওয়ারমুঙ্গা অথবা তদনুরূপ বর্বরসমাজকেই মানুষের আদি সমাজ মনে করিতে হিন্দুরা রাজি ন'ন। কেন রাজি ন'ন, তার কৈফিয়ৎ আমরা অন্যত্র দিয়াছি। হিন্দুর দৃষ্টিতে আদি মানবের ভিতরে তত্ত্ববিদ্যার অঙ্কুরটিই কেবল ছিল, সে অঙ্কুরের ঋদ্ধি বা বিকাশ হয় নাই—এ কল্পনা অবাস্তব। যে ভাগবতী ইচ্ছা হইতে আদি মানবের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই ভাগবতী ইচ্ছাতেই আদি মানবের ভিতরে তত্ত্বের মননেরও স্ফুরণ হইয়াছিল। ভগবানের নিত্য অকুণ্ঠিত প্রজ্ঞা তারও ভিতরে, অধিকারানুরূপ ভাবে, সংক্রামিত হইয়াছিল। গীতার সেই "বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ"—বাক্যের উহাই অভিপ্রায়। যে "রাজগুহ্য" রাজযোগ তত্ত্ববিদ্যার চরম উৎকর্ষ, তাহাই আদি-মানব মনু স্বয়ং শ্রীভগবান্ হইতে ওয়ারিশসূত্রে পাইয়াছিলেন।

যদি হিন্দুর এই বিশ্বাসকে ভিত্তিহীন মনে করিয়া আমরা ভাবি যে, অষ্ট্রেলিয়ার ওয়ারমুঙ্গা প্রভৃতির মতন কোনো মানুষ পৃথিবীতে প্রথম দেখা দিয়াছিল, এবং লাখ লাখ বছর ধরিয়া বুনো অবস্থাতেই থাকিয়া সম্প্রতি কয় হাজার বছর হইল সভ্য হইতে সুরু করিয়াছে, তা হইলেও আমাদের খেয়াল রাখা দরকার একটা খুব প্রয়োজনীয় কথায়; সেটা হইতেছে এই—ওয়ারমুঙ্গা অথবা এমন কোনো বর্বর জাতি পৃথিবীতে নাই, যাদের ভিতরে তত্ত্বচিন্তা এমন কি ব্রহ্মচিন্তা, একভাবে না একভাবে না জাগিয়াছে। ব্যাস-শঙ্কর, অথবা কান্ট্-সোপেনহাওয়ারের ব্রহ্ম-চিন্তার মতন উহাদের ব্রহ্ম-চিন্তা তেমন মার্জিত ও পরিণত না হউক, এটা অস্বীকার করিবার জো নাই যে, উহাদেরও ভিতরে বিরাট্ একটা কিছুর, মহান্ একটা কিছুর, অনির্দেশ্য ও সূক্ষ্ম একটা কিছুর, বোধ ও চিন্তা আছে। এ সম্পর্কে ম্যাকস্‌মুলারের আঁচ ("Introduction to the Study of Religion" গ্রন্থে) বেঠিক হয় নাই। যাহা দেখা শোনা যায় না (beyond the senses), অথচ যেটি আমাদের দেখা শোনার জগৎটাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, চালাইতেছে, এমন একটা অগোচর, অবিজ্ঞেয়, অসীম মহাশক্তি (unseen, undefined infinite power)—ঐ সকল বর্বর মস্তিষ্কের চিন্তা ও কল্পনার বাহিরে নয়। Lord Avebury হইতে সুরু করিয়া Dr. Frazer পর্যন্ত পশ্চিমা পণ্ডিতেরা বর্বরের আধ্যাত্মিক আলেখ্যখানি উজ্জ্বল করিয়া না আঁকিলেও অনেকে একথাটা 'নিম'-স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; আজকালকার দিনে, 'ম্যাজিক' প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মর্ম্মটি একটু ভাল করিয়া বোঝার ফলে, কোন কোন পণ্ডিত এ কথাটা প্রায় পুরাপুরিই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এখন, এ কথাটা যদি সত্যই হয়, তবে কেমন করিয়া বলি যে, বর্বরের মাথায় বড় কোনো চিন্তা, ব্রহ্মের কল্পনা, গজায় নাই? যে অনির্দেশ্য, অগোচর, অসীম একটা কিছু বর্বর মানিতেছে, সেইটাই কি ব্রহ্ম নয়? বর্বর পলিনেশীয় ধর্মবিশ্বাসের মূল তত্ত্ব "mana"টিকে কোনো কোনো সাহেব পণ্ডিত এখনও তেমন তারিফ করিতেছেন না বটে, কিন্তু আসলে "mana" কি ব্রহ্মগোত্রীয় নয়? আর সে ব্রহ্মগোত্রীয় ধারণা শুধু কি প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জেই মিলে? ডাঃ কারপেন্টারের "Comparative Religion," "Religion in Lower Cultures," এবং ঐ জাতীয় অপরাপর লেখায় প্রচুর নজীর মিলিবে।

বর্বর শুধু যে সেই অনির্দেশ্য, অনির্বচনীয় একটা কিছু মানিতেছে এমন নয়; তার সকল ধর্মকর্ম, ম্যাজিক ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তার "ব্রহ্মজ্ঞানের" উপর। বর্বরের ব্রহ্মজ্ঞান—একথা শুনিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই। খোসা লইয়া, সভ্যতার বাহিরের সাজ-সরঞ্জাম লইয়া, বিচার করি বলিয়া, বর্ব্বর বর্ব্বর, আর আমরা সভ্য ভব্য। খোসার ভিতরে শাঁসের খবর লইলে হিসাব অন্য রকমের দাঁড়াইলেও দাঁড়াইতে পারে। নৈতিক চরিত্রের মূল উপাদানগুলি, সামাজিক আচার-ব্যবহারের আসল ভঙ্গীগুলি

লইয়া তুলনা করিলে, কে বড়, কে ছোট, সে পক্ষে সন্দেহ করার অবকাশ মোটেই নাই, একথা বলা চলে না। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ A. R. Wallace সাহেবের উক্তি কয়টি শোনানো উচিত মনে করিতেছি :—

"It is very remarkable that among people in a very low stage of civilization we find some approach to such a perfect social state. Each man scrupulously respects the rights of his fellow, and any infraction of these rights rarely or never takes place. In such community all are nearly equal. There are none of those wide distinctions, of education and ignorance, wealth and poverty, master and servant, which are the product of our civilization; there is not that severe competition and struggle for existence or for wealth which the dense population of civilized countries inevitably creates. It is not too much to say that the mass of our population have not at all advanced beyond the savage code of morals, and have in many cases sunk below it."

Edward Carpenter সাহেব ত' "Civilization"টাকে একটা "ব্যাধি" সাব্যস্ত করিয়া, তার নিদান ও চিকিৎসার পুঁথি লিখিয়াছেন। তুলনার ফল যাই হউক না কেন, দুইটা কথা বোধহয় না মানিয়া উপায় নাই। ১ম—"ব্রহ্ম" মানে যদি সব চাইতে বড়, সব চাইতে আত্মিক, সব চাইতে গোড়াকার একটা কিছু হয়, তবে বর্বর সে ব্রহ্মকে যতখানি সত্যভাবে ও খাঁটিভাবে মানিয়াছে, আমরা অনেকে, সভ্যতার বড়াই করা সত্ত্বেও, ততখানি সত্যভাবে ও খাঁটিভাবে জানিতেছি না।

আমাদের অনেকের বুদ্ধি-বিবেচনায় জগৎস্রষ্টা যিনি তিনি জগৎ হইতে আলাদা; বর্বরের ধারণায় তিনি ("তিনি" মানে একটা মহাশক্তি হউক আর যাই হউক) জগতের সর্বত্র ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছেন অথচ যেটুকুখানি জগৎ আমরা দেখিতেছি, শুনিতেছি, তার বাহিরেও (beyond) তিনি। আমরা কেহ কেহ হয়ত এই রকমের immanent transcendent তত্ত্বের বিবৃতি শুনিয়া তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিতে চাহিব; কিন্তু আমাদের প্রচলিত জ্ঞানবিশ্বাসে ও ধারণায় ব্রহ্মবস্তু আমাদের এই দেখাশোনার জগৎ হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছেন। "দূরে" ও "অস্তিকে"—এই দুইটা জড়াইয়া গোটা ব্রহ্মচিন্তা; সুতরাং ব্যবহারে আমাদের ব্রহ্ম-চিন্তা দ্বিধাভিন্ন "জরাসন্ধবৎ" হইয়া বসিয়া আছেন। অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন সত্তাই যদি ব্রহ্ম হয়, তবে আমাদের এই বাহালি চিন্তা ও ধারণা মোটেই ব্রহ্ম-চিন্তা নয়।

তারপর, ২য়—আমাদের চিন্তায় জড়, প্রাণ ও চৈতন্য আলাদা আলাদা হইয়া

পড়িয়াছে; একটা পাথর বা মাটির ঢেলা জড়, তার ভিতরে প্রাণ নাই, চৈতন্য নাই; সে আমাদের মতন একটা বস্তু নয়, আমাদের আত্মীয় নয়, আমাদের পর ও আমাদের চাইতে নিকৃষ্ট;—এই রকমের একটা ধারণা আমাদের পাইয়া বসিয়াছে, এবং আমাদের সকল ব্যবহারের নিয়ামক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আবার অনেকেই এই ধারণাটিকেই স্বতঃসিদ্ধের মতনই মানিয়া লইয়াছি। সুতরাং, যে ব্যক্তি বা সমাজ মাঠে পাথরে, জলে বাতাসে, আকাশে মেঘে, চন্দ্রে সূর্যে আমাদেরই মতন প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে বলিয়া মনে করে, সে ব্যক্তি বা সমাজকে "ফেটিশিষ্ট্" "এনিমিষ্ট্" ইত্যাকার অবজ্ঞাসূচক বিশেষণে লাঞ্ছিত করিয়া আমরা বর্বরের কোঠায় ঠেলিয়া দিই। স্বয়ং টেইলর সাহেবের মতে "Animism" নিতান্ত খাটো জিনিস নয় কিন্তু বর্বরের অপরাধ সে একটা ধূলিকণার ভিতরে, একটা অশনিসম্পাতে বা পবন-হিল্লোলের মাঝখানে, আমাদের চাইতে বড় একটা প্রাণসত্তা ও চিৎ-সত্তার "কল্পনা" করিয়া লইয়াছে। যে মহাশক্তি এই বিশ্বভুবনে ওতপ্রোত, সেই মহাশক্তিই যে প্রাণ-শক্তি ও চিৎশক্তি, এবং সে প্রাণ-শক্তি ও চিৎ-শক্তি যে বিশ্বের "তুচ্ছাদপিতুচ্ছ" কোনো কিছু হইতেও সত্য সত্যই সরিয়া নাই; সুতরাং বিশ্বের প্রত্যেক কেন্দ্রে, প্রত্যেক point-এ, সেই বিশ্বশক্তির সঙ্গে আমাদের সংযোগ সংঘটন করা সম্ভবপর;—এইটা মানা, এবং এইটা মানিয়া জীবনের সকল ধর্মকর্মে চলাফেরা করাই হইল তার অপরাধ! বর্বর নাকি সেই মহাশক্তিকে আবার নানান্ দেবতা অপদেবতা বানাইয়া দেখে, পূজা করে, খুসী করে; সে নাকি বহুর ভিতরে একের সন্ধান পায় নাই! বর্বরদের "প্রাণের ভাষা" এখনও আমরা বুঝিতে শিখি নাই—মিশর প্রভৃতি দেশের "হাইরোগ্লিফিক্স্", পারস্য বাবিলনের "কিউনিফর্ম্" লিপি পড়িতে শিখিলে কি হইবে? সুতরাং আমরা জোর করিয়া বলিতে পারিতেছি না, বর্বরদের দেবতা আসলে এক কি বহু। সম্ভবত পাতিত্যের ফলে, তাদের ভিতরে মানবীয়-সত্তাসিদ্ধ (Homotypal) ব্রহ্মজ্ঞান অনেকটা অবগুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ঢাকা পড়িয়া গেলেও বড় বেশি বিকৃত হয় নাই। বেদের মধ্যেও বহু দেবতা ও অপদেবতা আছেন; নিখিলের মধ্যে প্রাণের ও চৈতন্যের অনুভূতি রহিয়াছে এত স্পষ্টভাবে যে বিলাতি পণ্ডিতেরা এটাকেও সেই আদিম বর্বরোচিত এনিমিজ্ম্, টটেমিজ্ম্, ফেটিশিজম্ ইত্যাদির "জের" মনে করিয়াছেন। ম্যাক্সমূলার অবশ্য নাম রাখিয়াছিলেন—Henotheism কিন্তু আবার বেদের শুধু উপনিষৎ ভাগে কেন, সংহিতা ভাগেই, এবং সকল স্তরেই, ছেদহীন, খণ্ডহীন, সীমাহীন, দ্বৈতহীন, ব্রহ্মবস্তুও, কখনও বা বরুণরূপে কখনও বা অদিতিরূপে, কখনও বা ইন্দ্ররূপে, কখনও বা অগ্নিরূপে কখনও বা বিশ্বকর্মা বা প্রজাপতিরূপে, কখনও বা বিরাট্ বা কাম বা কাল বা স্কম্ভরূপে নিজের পরিচয় দিয়াছেন। বর্বর সমাজে হয়ত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক স্বচ্ছতার অভাবের ফলে, এই পরিচয়টি কতকটা গোপন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সেখানেও তত্ত্বের

তেমন বিকার হয় নাই : যেটি "শিব" সেটি সত্য সত্যই "বানর" বনিয়া যায় নাই। আমাদের সভ্য ধারণায় মাটি, পাথর, প্রাণরূপী ও চৈতন্যরূপী শিবশক্তি-বিগ্রহ হইলে কি হইবে,—জড় হইয়া গিয়াছে, তুচ্ছ ও ছোট হইয়া গিয়াছে। ও সকল "ভূত" আমাদের অনাত্মীয় পর; তাদের ভিতর দিয়া নহে, তা'দিগকে একেবারে বাদ দিয়া, প্রাণ, আত্মা বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপন করিতে হইবে, এবং তাহাতে আমাদের পৌঁছিতে হইবে। এ ধারণা সত্যকার ব্রহ্মজ্ঞানের কেবলমাত্র আবরণ নয়, বিক্ষেপ ও বিকৃতি। বর্বর হয়ত মধু কৈটভ এই দৈত্য দুটার মধ্যে একটার এলাকায় বাস করে; আমরা দুইটার এলেকাতেই একরকম মৌরশী প্রজা-স্বত্ব লইয়াছি! আর সেই পাট্টা-কবুলতির উপর হাল-সরকারের শীল-মোহর পড়িয়াছে—"Civilization and Culture".

এই দুইটা কথা ছাড়া আরও একটা কথা আছে; সেটা হইতেছে এই—আমরা আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে তত্ত্বজ্ঞান (Metaphysical Theory) এবং কাজের (Practice) মধ্যে যতটা মিল রাখিতে পারিতেছি, তার চাইতে বেশী মিল রাখিয়া চলিতে পারিয়াছে ঐ বর্বর। আমরা থিওরিতে হয়ত' অনেকেই ব্রহ্মবাদী, কিন্তু কাজে জড়বাদ ও দেহাত্মবাদকেই আমাদের সকল ব্যবহারের প্রতিষ্ঠা-ভূমি করিয়া রাখিয়াছি; আমাদের কাছে মাটি পাথর জড়, জড়ই বলবৎ, জড়ের উপাসনা করিয়াই সকল পুরুষার্থ সাধন করিতে হইবে। বর্বর-সমাজের থিওরিকে আমরা যতই গালি দিই না কেন, জীবনের সঙ্গে থিওরির সত্যকার যোগটি সেখানে এতটা শিথিল ও অসার হইয়া যায় নাই।

কথাটা দাঁড়াইতেছে এই যে, আমি মানুষকে বর্বর মনে করিলেও তত্ত্বচিন্তার দিক্ দিয়া তাহার খুব বেশী লজ্জিত হইবার কারণ নাই। একটু তলাইয়া অনুসন্ধান করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষ সভ্য অসভ্য সকল অবস্থাতেই, এক ভাবে না এক ভাবে ব্রহ্মকে অর্থাৎ সব চাইতে বড়কে জানিতে বুঝিতে ধরিতে চাহিয়াছে।

মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে, এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। আগেকার সাইকোলজিস্টদের সেই টুকরা টুকরা sensation জড়াইয়া অনুভূতি, ভাব, চিন্তা ইত্যাদির "পাকপ্রণালী" আজিকালিকার দিনে আর চলিবে না। আমাদের অনুভূতির জমি (background) যেটি, যেটিকে আশ্রয় করিয়া আমাদের সকল ব্যবহারিক অনুভব, ভাবনা, চিন্তা ইত্যাদি হইতেছে, সেটি নিজে টুকরা টুকরা অনুভবের জোড়াতালির ফলে জন্মে নাই; সেটি নিজে একটা অখণ্ড বিরাট্ অনুভূতি-সত্তা (an undefined and indefinable experience of being); আমরা ব্যবহারে এই বিরাট্ অনুভূতি-সত্তাটিকে কাটিয়া আমাদের দরকারমাফিক ছোট করিয়া লই, এবং বলি—"ঐ তারাটা দেখিতেছি, এই ব্যাপারটা ভাবিতেছি" ইত্যাদি। ব্যবহারে, বলা কওয়ায়, ছোট হইলেও, সেই বিরাট অনুভূতিসত্তা আসলে কিন্তু ছোট হয় না; সেটি যে বিরাট্ সেই বিরাট্ই রহিয়া যায়—অবশ্য, আমাদের কাজ-চালানো হিসাবের বাহিরে। সেই

বিরাট্‌ সত্তা—যাহা আমাদের সকল ব্যাবহারিক অনুভব, ভাবনা-চিন্তা, কল্পনা-জল্পনা বুকে ধরিয়া রাখিয়াও—স্বয়ং অনির্দেশ্য, তার সম্বন্ধে কোনোরূপ সীমা বা গণ্ডি টানিয়া বলা যায় না যে, সে এ-র মধ্যেই পরিসমাপ্ত, এ-র বেশী আর নহে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ "শক্বরী মন্ত্রে"র ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছেন, প্রজাপতির সৃষ্ট পদার্থসকল কেমন করিয়া "সীমা" পরিগ্রহ করিল; স্বয়ং প্রজাপতির শক্তি (শক্নোতি হইতে শক্বরী) কিন্তু কোন "সিম" বা দড়িতেই বাঁধা পড়ে নাই। এই যে প্রজাপতির শক্তি ইহাই আমাদের নিখিল জ্ঞানের আশ্রয় ও "পরায়ণ" সেই বিরাট অনুভূতি-সত্তা। এই সত্তার ক্রোড়ে যাহা কিছু জাগিতেছে, লয় পাইতেছে, সে সবই দড়ি দিয়া বাঁধা—সসীম। সে সবই নির্দিষ্ট (defined or definite) কেন না, নির্দিষ্ট একটা কিছু না পাইলে আমাদের যে কাজ চলে না, বলা কওয়া চলে না।

এখন, খেয়াল রাখিতে হইবে যে, এই যে আমাদের ভিতরের শাশ্বত অনুভূতি-সত্তা ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই আমাদের সকল বৃহত্ত্ব, মহত্ত্ব, ভূয়স্ত্ব জ্ঞানের মূল। আমাদের অনুভূতি আসলে বড় ও বিরাট্‌ বলিয়াই, আমরা ছোট ছোট দড়ি-মাপা ও দড়ি-বাঁধা অনুভবগুলি লইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। দড়িমাপা অনুভবগুলি লইয়াই আমরা কাজ চালাই, ভাবনা-চিন্তা, বলা-কওয়া করি; যেটি মোটেই বাঁধা পড়ে নাই ও মাপা যায় না, সেটি একরকম আমরা ভুলিয়াই থাকি, কিন্তু পুরাপুরি ভুলিয়া থাকিবার জো নাই;—কেন না, সে বিরাট-সত্তা আমাদেরি অনুভূতি-সত্তা। যেটি অনুভূতি, তাতে অমনোযোগ, খেয়ালের অভাব হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাকে অনুভব না করিয়া পারি না; যেমন আকাশের পানে তাকাইয়া একটা তারাই বিশেষ ভাবে দেখিয়াছি বলিয়া, সেকালে আর কিছু দেখি নাই, শুনি নাই বা অন্যভাবে অনুভব করি নাই এমন নয়।

এখন, এই যে প্রচ্ছন্ন (veiled and ignored) অনির্দেশ্য মহান্‌ অনুভবটি আমাদের সকল কাজ চালানো (pragmatic) জ্ঞানের পিছনে রহিয়াছে, যেটির "ভান" সেই "অধ্যেতৃবর্গ-মধ্যস্থ-পুত্রাধ্যয়ন্‌-শব্দবৎ" হইয়াও হইতেছে না, সেইটিকে খুঁজিয়া না ধরিতে পারিলে আমরা স্বচ্ছন্দ বোধ করি না। কি যেন কি একটা আমাদের মধ্যে রহিয়াও না থাকার মতন হইয়া রহিয়াছে; কি যেন কি একটা আমরা জানিয়াও জানিতেছি না, অথবা না জানিয়াও জানিতেছি;—সেই একটা-কিছুকে না খুঁজিয়া থাকি কি করিয়া? আকাশ, সমুদ্র, পৃথ্বী—যা কিছু বাহিরে বড় দেখি, তারই ভিতরেই মনে হয় সেই একটা-কিছুকে পাইলাম; অনেক সময় মানুষ বলিয়াছেও—সে 'অজানা' একটা কিছু ঐ আকাশের মতন, ঐ সাগরের মতন, দ্যাবা-পৃথিবীর মতন। কিন্তু বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে খট্‌কা জাগিয়াছে—না, সে বুঝি ওর চাইতেও বড়, ওরও অতীত (beyond) একটা কিছু হইবে। অসভ্য বর্বরের ভিতরেও এই রকমের খোঁজা, এটাকে সেটাকে দেখিয়া তারেই পাইলাম ভাবা, আবার সেই "এটা

সেটা” ছাড়াইয়া যাওয়া—এই গোটা সাইকোলজিটা বর্তমান রহিয়াছে। কেন না বর্বরও মানুষ, তার মনও মন। মন বলিয়াই, তাহা সকল দড়ি-মাপা কাজ-চালানো অনুভবের পিছনে তার আসল ধরা-বাঁধা-না-দেওয়া অনুভূতি-সত্তাটিকে খুঁজিতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে, এ আসল সত্তাটি অনুভূতি-সত্তা—এমন একটা বড় অনুভূতি, যার ‘ভান’ অবশ্যই হইতেছে, কিন্তু যেটায়, আমাদের কারবারী গরজ নাই বলিয়া, আমাদের খেয়াল হইতেছে না। এ জিনিসের খোঁজ আর টোটেন খামেনের কবরের খোঁজ, অথবা ‘অসীমের পরপারের’ একটা নক্ষত্রেরও খোঁজ এক কথা নয়। শেষ খোঁজ দু’টি মানুষ না করিলেও পারে; করিতে তার মানবত্বের ভিতরেরই কোনো “জোর তলব” নাই। কিন্তু প্রথম খোঁজটি হইতেছে নিজেরই যেটি আসল পুঁজি, তারই খোঁজ। সে খোঁজ না করিয়া কে পারিবে? শুধু কস্তুরী মৃগই নিজের নাভি-গন্ধে আকুল হইয়া ছুটিয়া বেড়ায় না; আমরা সকলেই নিজের নিজের আসল লুকানো পুঁজিটি ঢুঁড়িয়া বেড়াইতেছি—সভ্য, অর্ধ-সভ্য, অসভ্য, সকল অবস্থাতেই। আসলটি একেবারে লুকানো রহিলে গোল থাকিত না; আমরা “বিষয়কর্ম” নিয়াই থাকিতাম, তত্ত্বের কোনই হদিশ হয়ত পাইতাম না। কিন্তু আসলের লুকানো থাকা মানে সে সম্বন্ধে অজ্ঞতা নয়, খেয়াল না থাকা, এই পর্যন্ত। আমাদের খেয়ালের অভাবের ভিতরেও তার যে পরিচয়টুকু আমরা পাই, সে পরিচয়ের চাইতে নিবিড় ও মধুর পরিচয় আর কিছুই যে নাই! সে পরিচয়—আত্মপরিচয়, প্রাণের পরিচয়, রস ও আনন্দের পরিচয়, চিৎ-সত্তার পরিচয়। বলা বাহুল্য, পরিচয়টি বড়ই অস্ফুট, বড়ই গোপন। কিন্তু তবু যেটুকু পাই, তাতেই যে আকৃষ্ট না হইয়া পারি না! মানবাত্মার অন্তঃপুরে সে গোপন পরিচয়ের “মিষ্ট ব্যথা” কোন্ চির-বিরহিনীর অজানা মধুরের প্রতীক্ষার ভিতর দিয়া মিলনাভাসের মতই নিত্য ফুটিয়া উঠিতেছে—“এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি।”

বাঁশির রবে আকৃষ্ট হইয়া আমরা প্রথমে ঠিক ধরিয়া ফেলিতে পারি না, কে কোথা হইতে বাঁশি বাজায়। আত্মা বা ব্রহ্মের সেই দূরাগত অব্যক্ত “নিবেদন” আমরা ঠিক যেন “localize” করিতে পারি না; বুঝিতে পারি না, কোথা হইতে কার এই নিবেদন-সুর উঠিতেছে। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম, এবং চিন্তাবৃত্তির মুখটি যে বাহিরের দিকেই ফিরানো। সুতরাং প্রথমে খুঁজিতে সুরু করি বাহিরে। বড় যাহা, ভূমা যাহা, ব্রহ্ম যাহা তাহা যে আমারি নিজস্ব চিরন্তন অনুভব- ইহা গোড়ায় মনে করিতে পারি না। গোড়ায় দৃষ্টি যায়—এই বিপুল পৃথিবীর পানে, ঐ বিশাল সমুদ্রের পানে, ঐ উদার আকাশের পানে। মনে হয়, এই পৃথিবী, ঐ আকাশই ত’ সব ধরিয়া রাখিয়াছে—আমাদিগকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকল অনুভব, ভাবনা, চিন্তাকে। অতএব উহাই ব্রহ্ম।

এ নিরাকরণ একেবারে নিরর্থকও নহে, বাজে বাতিলও নহে। বড়কে, আসলকে, "পরায়ণ"কে খোঁজাও যেমন স্বাভাবিক, সেটিকে গোড়ায় বাহিরে খোঁজা এবং বাহিরের বড় কোনো কিছুর সাথে মিলাইয়া দেওয়াও, তেমনি স্বাভাবিক। সকল দেশে, সকল যুগেই দেখিতে পাই,—মানুষের চিন্তা এই স্বাভাবিক বর্ত্ম অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। কেবল থেলিস, আনাক্সাগোরাস, আনাক্সামন্দর বলিয়া কেন, সকল দেশের দার্শনিক চিন্তাই বড়র খোঁজ, আসলের খোঁজ কতক কতক করিয়াছে বাহিরে। বেদের সংহিতাভাগে অগ্নি, অদিতি, বরুণ, সবিতা, ইন্দ্র এবং উপনিষদেও, অধিকার বিশেষে, আকাশ, বায়ু, অপ্, প্রাণ, বিদ্যুৎ—এ সকল আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক 'মূর্তিতেও' যে ব্রহ্মই অন্বেষিত হইয়াছিলেন, সে পক্ষে সন্দেহ করা চলে না। শঙ্করাচার্য উপনিষদ্-ভাষ্যে ও ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে আকাশ, প্রাণ, তেজ ইত্যাদির নির্গুণ ব্রহ্মপর ব্যাখ্যা দিয়া উচ্চতম থাক বা সম্প্রদায়ের অনুবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, সত্যকার ব্রহ্মোপলব্ধির ক্ষেত্র জীবন, সুতরাং সম্প্রদায়, ছোট বড় মাঝারি সকল রকমেরই ছিল; এবং যার অধিকার অন্ন বা প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিবার, তিনি সেই ভাবেই ব্রহ্মকে বুঝিতেন। তাতে তত্ত্বদর্শী আচার্যদের অসহিষ্ণুতা বা বিরক্তি ছিল না।

কিন্তু আমাদের ভিতরের সত্তাকে গোড়ায়, বাহিরে খোঁজার যেমন একটা স্বাভাবিক প্রণোদন আছে, তেমনি আবার বাহিরকে "বাহিরে" রাখিয়া অখণ্ড ও পূর্ণকে খণ্ডিত ও অপূর্ণ রাখিয়া আত্মীয়কে "পর" করিয়া আমরা যে আখেরে সুস্থির থাকিতে পারিব না—এমন ব্যবস্থাও আমাদের ভিতরেই আছে। তাই দেখি, শুধু দার্শনিক বা সাধক বলিয়া কেন, বর্বরের ব্রহ্মান্বেষণও একান্তভাবে, সুস্থির ভাবে, বাহিরে পরিসমাপ্ত হয় নাই। সেও জানে, তার আসল 'চিজ্'টি রহিয়াছে—সে যাহা কিছু দেখিতেছে, শুনিতেছে, তাকে ছাড়াইয়া অথচ তার ভিতরেও রহিয়া। অসভ্যদের ধর্মবিশ্বাস ও ম্যাজিকের যতটুকু খোঁজ আমরা রাখিয়াছি, তাতেই এতটুকু দাবী তাদের তরফ হইতে আমরা করিতে পারি। অতএব আমরা যেন এমন মনে না করি যে, কোনো অসভ্য জাতি পৃথিবীকে অথবা আকাশকেই সকলের সেরা ভাবিয়া নিশ্চিন্তমনে আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। যেমন সকলের সেরাটিকে না খুঁজিয়া সে পারে না, তেমনি আবার সত্য সত্যই সকলের সেরাটিকে না পাওয়া পর্যন্ত সে সুস্থির হইতে পারে না। আসলে ও খোদে যার প্রয়োজন, সে নকল বা প্রতিনিধি বা অনুকল্প লইয়া কতক্ষণ সুস্থির থাকিবে?

বর্বর আমাদের মত সাইকোলজির বিশ্লেষণ করে না বলিয়া, তার ভিতরে যে সাইকোলজিটা আদপে নাই,—এমন যেন মনে আমরা না করি। নৈয়ায়িকেরা স্বার্থ ও পরার্থ—এই দুই রকমের অনুমিতি মানিয়াছেন। পরার্থ, অর্থাৎ পরকে বুঝাইবার জন্য যে অনুমিতি, তাহাতেই ন্যায়ের সকল অবয়বগুলি (steps of Reasoning) খোলসা

করিয়া দেখান হইয়া থাকে। আমরা নিজে নিজে লিঙ্গ-পরামর্শ করিয়া যে সব অনুমান হামেশা করিতেছি, সেগুলি সংক্ষিপ্ত; তাদের অবয়বগুলি প্রায়ই গা ঢাকা দিয়া অব্যক্ত ভূমিতে রহিয়া যায়। বস্তুত, আমাদের মানসিক ব্যাপারের এমন কি যেগুলি জটিল তাদেরও প্রায় সাড়ে পনেরো আনাই অব্যক্ত ভাবে, কতকটা অজ্ঞাতসারেই, নির্বাহ হয়। উইলিয়াম জেম্‌স্ প্রমুখ যে সব সাইকোলজিষ্ট্ মনের অব্যক্ত ভূমিতে সুড়ঙ্গ কাটিতে অস্বীকার করিয়া অভ্যাস সংস্কার, স্বার্থ-অনুমান প্রভৃতি মানসিক ব্যাপারগুলিকে, মগজ-যন্ত্র (cerebral mechanism) দ্বারাই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁদের সে চেষ্টা যে কতদূর সফল হইয়াছে, তার আলোচনা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। তাঁদের মতে কেহ কেহ "Ejective Consciousness",-অর্থাৎ, আমাদের ব্যবহারিক চেতনা হইতে আলাদা এবং তার অগোচর, অথচ শারীরিক স্নায়ু-যন্ত্রের মস্তিষ্ক ছাড়া অপরাপর অংশে অভিমানী বা ব্যাপারাধ্যক্ষ, একটা চৈতন্যও মানিয়াছেন। সম্ভবত হিপনটিজম্ ইত্যাদিতে সব্‌জেক্ট-বিশেষের চেতনা ও ব্যক্তিত্ব (Personality) কেমনধারা আলাদা আলাদা কুঠুরীতে ভাগ হইয়া যায়—তাই দেখিয়াই তাঁরা ঐরূপ Ejective Consciousness মানিবার দিকে ঝুঁকিয়াছেন। সে যাহা হউক, একই Organism-এ অধিষ্ঠিত, আমাদের আটপৌরে চৈতন্যের অগোচর তোলা চৈতন্যটিকে, একটা বিরাট্ চৈতন্যেরই অব্যক্ত ভূমি মনে করাতেই বোধহয় সমস্যার লাঘব হয়। বর্তমানে যে সকল পরীক্ষক ঐ সমস্ত Crypto-psychical ও Parapsychical phenomena লইয়া ঘাঁটিতেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই একটা বিরাট্ অব্যক্ত চৈতন্য না মানিয়া পারেন নাই। আমাদের উচ্চ প্রস্থানের দার্শনিকদের দৃষ্টিতে চৈতন্য প্রকাশস্বরূপ ও সর্বাবভাসক বটে, কিন্তু একটা আবরক শক্তি সেই প্রকাশকে যেন ঢাকিয়া রাখিয়াছে; সুতরাং সেই আবরক "তমে"র যেমন যেমন ক্ষয় হইতে থাকিবে, চৈতন্যের সর্বাবভাসকত্ব রূপটিও ততই ফুটিয়া উঠিবে। এই যে ঢাকা দেওয়া ও ঢাকা খোলা—এ ব্যাপারের মূলে আছে জীব ব্যবহার। সব সময়ে সব ঢাকা পড়িলেও যেমন ব্যবহার চলেনা, সব সময়ে সব অপক্ষপাতে প্রকাশ পাইলেও তেমনি ব্যবহার চলে না। আমাদের পক্ষপাত করিয়া, বাছিয়া বাছিয়া, দেখিতে শুনিতে জানিতে হয়; জ্ঞেয়ের, এমন কি অনুভূতিরও অনেকটা ঢাকিয়া, একটুখানি লইয়া কারবার করিতে হয়। এটা সহজ কথা, দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক।

যা'দিগকে আমরা অসভ্য বর্বর বলি, 'প্যালিওলিথিক্ ম্যান্' বলি, তাদের ভিতরে হয়ত বেশীর ভাগ ঢাকাই পড়িয়া রহিয়াছে; অর্থাৎ, তাদের মানসিক ব্যাপারগুলি খোলসা ভাবে, স্পষ্টভাবে যতটা চলিতেছে, তার চাইতে অব্যক্ত ও অস্পষ্ট ভাবে হয়ত ঢের বেশী চলিতেছে। একই বিরাট্ চৈতন্য (ব্রহ্ম) তাদের ভিতরে যতটা লুকাইয়াছেন ও যতটা ধরা দিয়াছেন, আমাদের "কেন্দ্রে" হয়ত তার চাইতে বেশী ধরা দিয়াছেন ও কম লুকাইয়াছেন। হইতে পারে যে, তাদের চিন্তা ও মানসিক ব্যাপারগুলি বেশী আড়ষ্ট ও

সহজ সংস্কারের মতন (automatic)। কিন্তু সব চাইতে বড় ও সেরা যে ব্রহ্ম, তাঁর কোনো না কোনো এক ধরণের চিন্তা তাঁদের ভিতরেও আছে একথা একেবারে উড়াইয়া দিবার জো নাই।

যদি দেখিতাম প্যালিওলিথিক ম্যান্ আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন লইয়াই তার বুনো জীবনটা কোনো মতে কাটাইয়া দিয়াছে, তার ভিতরে পশুধর্ম ছাড়া আর কোনো রূপ ধর্মের (বিশ্বাস, ধারণা ও অনুষ্ঠানের) বিকাশ হয় নাই, তবে তাকে আমরা ব্রহ্মচিন্তার "দায়" হইতে অব্যাহতি দিলেও দিতে পারিতাম। কিন্তু ফ্রান্সে, জর্মানিতে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, ক্রীটে, নর্মদা গোদাবরীর পলিমাটির স্তরে এবং আর আর যে সমস্ত জায়গায় প্যালিওলিথিক ও নিওলিথিক ম্যানের অভিজ্ঞান আমরা পাইয়াছি, সেখানেই দেখিয়াছি যে, সে যেমন শিকার করিতেছে, লড়াই করিতেছে, লড়াইএর জন্য পাথরের বর্ষাফলক তৈয়ারি করিতেছে, তেমনি আবার সঙ্গে সঙ্গে, ছবি আঁকিয়া, নানারকম উল্কি ইত্যাদি কাটিয়া, নানান্ রকমের "ম্যাজিকে"র অনুষ্ঠান করিয়া, প্রেত-সংস্কারাদি ব্যাপারে নানান্ রকমের অদ্ভুত "তুক্ তাক্" খাটাইয়া, তার চল্‌তি দেখা-শোনা খাওয়া-পরার বাহিরে, অগোচর অনির্দেশ্য বড় একটা কিছুর সঙ্গে, প্রবল "অসুর" একটা কিছুর সঙ্গে নিজের সত্তার যোগ রাখিয়া চলিতেছে। যেদিন সে প্রথম অগ্নি উৎপাদন করিতে পারিল, (তাকে সাগ্নিকরূপেই আমরা ভূস্তর ইতিহাসে দেখি) যেদিন সে প্রথম ভূমি চষিতে শিখিল, সেদিন হইতে মানুষের ইতিহাসে একটা যুগান্তর সুরু হইল সন্দেহ নাই ; কিন্তু আগুন সে নাই জ্বালাক্, মাটি সে নাই চষুক্,—আমরা মাটির স্তরের ভিতরে এতদিন পর্যন্ত যে পরিচয়টি তার পাইয়াছি, সে পরিচয় হইতেছে—মননশীল, অতীন্দ্রিয়ে অলৌকিকে বিশ্বাসশীল, বড় ও জবরদস্ত একটা কিছুর সঙ্গে নিজের যোগ স্থাপন করিতে উৎসুক মানবের পরিচয়।

ঠিক বাদরায়ণের মতন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা তার ভিতরে ফুটিয়া থাকুক, আর নাই থাকুক, একথা অস্বীকার করার জো নাই যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মান্বেষণ এক না এক আকারে তার ভিতরেও দেখা দিয়াছে। অথবা এইটা বলাই উচিত যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মান্বেষণ মানব-সত্তায় বা আদি মানবে (Human Type) থাকা স্বাভাবিক, এবং গোড়াতে ছিলও ; সেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মান্বেষণ, প্যালিও-লিথিক্ প্রভৃতি মানবের অধিকারে, আবরক তমের দ্বারা অনেকটা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া, চৈতন্যের অব্যক্ত ভূমিতে সহজ সংস্কারগুলির কোঠায় আশ্রয় লইলেও, একেবারে "নস্যাৎ" হইয়া যায় নাই। আমাদের ঐতিহ্যে দেখিতে পাই—যিনি অগ্নিকে প্রথম মন্থন করিয়াছিলেন তাঁর নাম অঙ্গিরা ; যিনি পৃথ্বীকে প্রথম কর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁর নাম পৃথু। [অথর্ববেদে (৮।১০।২৪) বৈণ্য পৃথুকে পৃথিবীর দোগ্ধা বলিয়াছেন ; ঋগ্বেদ (৮।৯।১০) ও দ্রষ্টব্য] ঐতিহ্যে এঁরা উভয়েই ঐশী-বিভূতি-সম্পন্ন। একজন ব্রহ্মবিদ্যার সম্প্রদায়-প্রবর্তকদের মধ্যে অন্যতম—

"অথর্বসিরসে পরাবরা"—অপরজন বেণের উরুদেশ (ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তে উরু বৈশ্যশক্তির আশ্রয় ও প্রতীক,—অথর্ববেদে পুরুষের "মধ্য" হইতে বৈশ্যের জন্ম) ঋষিদের কর্তৃক মথিত হবার ফলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

পৃথিবীতে বেণের রাজত্ব মানে (পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দেওয়া মানবীয় কাল্‌চারের ইতিহাস মানিয়া লইয়াও) আমরা এইটুক্ বুঝিতে পারি যে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে, চারুশিল্প (Ornamental Art) "কেজো" শিল্পের (Useful Art) আগে দেখা দিয়াছিল। মানুষ সে যুগেও, কৃষি প্রভৃতি কেজো শিল্পের আবিষ্কার করিতে না পারিলেও, ছবি আঁকিত, নিজেকে উল্কি, তিলক, পালক, পাতা, ফুল ইত্যাদি দিয়া সাজাইত; হয়ত তখন কাপড় পরার চলনও হয় নাই, আগুনে রাঁধিয়া খাওয়াও বাহাল হয় নাই। কেবলমাত্র সাজাইবার প্রবৃত্তি লইয়া জীবন সুন্দর ও সার্থক হয় না। বেণ তাই উচ্ছৃঙ্খল রাজা। ঋষিরা বেণকে ধ্বংস করিয়া পৃথুকে তার ভিতর হইতে মন্থন করিয়া তুলিলেন। পৃথুর অর্থ সপ্রয়োজন, সার্থক, সফল। সুন্দরের আত্মজ ইনি, সুন্দরের সঙ্গে ইহাঁর বিরোধ নাই। পৃথু আসিয়া ভূমিকে আবার চষিলেন; হয়ত' পূর্বতন কোনো যুগে পৃথিবী কখনও কর্ষিতা হইয়া থাকিবেন। ঋগ্‌বেদ-সংহিতাদিতে নানা স্থলে মানুষকে "চর্ষণী" নাম দেওয়া হইয়াছে; যেমন আবার দেবতাদিগকে "নর", "নৃতম", "নরাশংস" বলা হইয়াছে। পৃথু মানুষের চর্ষণী নাম সার্থক করিলেন।

এখন কথাটা এই যে, মানুষ বেণের এলেকাতে বাস করুক্, আর পৃথুর এলেকাতেই বাস করুক্, সে কোনদিনই নিরেট পশু হইয়া বাস করে নাই। অথর্বাঙ্গিরা লইয়া সাহেব পণ্ডিতদের অনেক থিওরি আছে। আর্যজাতি "বুনো" অবস্থায় কার কাছ হইতে প্রথম আগুনের ঐরূপ উৎপাদন এবং ব্যবহার শিখিয়াছিলেন এই সব তথ্য নাকি ঐ অঙ্গিরা উপাখ্যানের ভিতর হইতে দোহন করিতে পারা যায়। সে যাই হউক, মানুষ সাগ্নিক হউক আর নিরগ্নি হউক, বেণের প্রজা হউক আর পৃথুর প্রজাই হউক, তার সত্তা কখনই কেবলমাত্র "ইহ" লোকের চিন্তা লইয়া, দৃশ্য গোচর ও সসীমকে লইয়া পরিসমাপ্ত ভাবে পড়িয়া থাকে নাই। পড়িয়া যে থাকে নাই, তার অকাট্য প্রমাণ ঐ পশ্চিম-দেশেরই চিলেয়ান্, অরিগ্‌নেসিয়ান্ ম্যাগ্‌ডালেনিয়ান্ ইত্যাদি থাকের বর্বর মানুষদের বসবাসের ও প্রেত সমাধির গুহাগুলি এখনও প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া রাখিয়াছে। সকল অবস্থাতেই মানুষ জিজ্ঞাসু ও ব্রহ্মান্বেষী। ইহার হেতু তার "Primate" বংশ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলে মিলিবে না; ইহার একমাত্র হেতু এই যে, সে চিরদিনই মানুষ—প্রজাপতির "অর্বাক্‌স্রোতা" সর্গ—; সে যে সত্তা হইতে এবং যে সত্তা লইয়া আসিয়াছে, সেটি প্রজাপতি, মনু ও সপ্তর্ষিদের সত্তা; অবস্থা বিশেষে সে সত্তা তার নিজের ভিতরে যতই গোপন হইয়া পড়ুক না কেন।

বিশ্ব দোল

আগেকার আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, যে বাধাতে জড়ের উদ্ভব, এবং যে বাধাতে জড়ের স্থিতি, সেই বাধাটা অতিক্রম করার একটা স্বাভাবিক প্রেরণা জড়ের ভিতরে রহিয়াছে। কেবল হিন্দুই যে বলেন, এমন নহে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকও বলিবেন যে, ঐ পাথরটা চিরদিন পাথর হইয়াই ছিল না, এবং চিরদিন পাথর হইয়াই থাকিবে না। প্রাণী জগতে যে ক্রমবিকাশ আজ প্রায় সর্ববাদিসম্মত, সে রকম ধারা একটা ক্রমবিকাশ বৈজ্ঞানিকেরা আজকাল জড়ের রাজ্যেও মানিতে সুরু করিয়াছেন। এক জাতীয় এটম্ বদ্‌লাইয়া অন্য জাতীয় হইয়া যাইতেছে। সুতরাং ঐ পাথরটাও নানা অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া পাথর হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে আবার নানা অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া আর কিছু হইবে। গোড়ায় কি ছিল, এবং শেষে কি হইবে—এটা অবশ্য বৈজ্ঞানিক এখনও স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন না। হিন্দুর দৃষ্টি এর ভিতরে আত্মারই লীলা, কর্ম এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্টকেও দেখিয়া ফেলিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি এখন পর্যন্ত ততদূর ফুটে নাই।

সে যাই হ'ক, তিনটি আসল কথায় বোধ হয় বৈজ্ঞানিকের সায় দিতে আপত্তি হইবে না। প্রথম, বাধাই হইতেছে জড়বস্তুর স্বরূপ, এবং বাধাতেই জড়বস্তুর পরিচয়। দ্বিতীয়, জড়বস্তুর ভিতরে বাধা বা গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বড় হইবার একটা প্রেরণা দেওয়া রহিয়াছে। কিছুদিন আগে রেডিয়াম আবিষ্কারের পূর্বে বৈজ্ঞানিকেরা হয়ত এ কথাটা সাধারণ সত্যভাবে লইতে রাজী হইতেন না। এখন তাঁরা দেখিতে পাইতেছেন যে, নিখিল-ভূতের অভ্যন্তরে কোন এক অনির্বচনীয় কারণে ছোটখাট একটা বিপ্লব অহরহই চলিতেছে। সেই বিপ্লবে তার নিজস্ব বাধা বা গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যাইতেছে; এক রকম বাধা বা গণ্ডী ভাঙ্গিয়া গিয়া অন্য রকমের হইতেছে। ফল কথা, বাধা বা গণ্ডী ভাঙনের দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক্ সর্বত্রই আছে। রাদারফোর্ড, সডি প্রমুখ এই বিপ্লবের অভিনব পুরাণকারেরা আমাদের বলিতেছেন যে, এ বিপ্লবটি স্বতঃ, অর্থাৎ ঘরোয়া কোন কারণে চলিতেছে; বাহিরের অবস্থাপুঞ্জ দ্বারা এ বিপ্লবের কৈফিয়ৎ দেওয়া বোধ হয় যায় না। আমাদের "বেদ ও বিজ্ঞানে" এ কথাটাকে আমরা বিশদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন, জড়ের ভিতরে এই যে গণ্ডী ভাঙার স্বাভাবিক ঝোঁক্, সেইটাকেই আমরা আগে পাষাণ-কারাগারে শৃঙ্খলিতা অহল্যার আত্মার মুক্তি ব্যাকুলতা বলিয়াছি। অভিশপ্তা অহল্যা যেমন-ধারা পাষাণময়ী হইয়া মুক্তির জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি যে, শুধু সে পাষাণ নয়, সৃষ্টির সকল

পাষাণ বা সকল ভূতই তাদের পাষাণত্ব বা ভূতত্বের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জড়-সমাধি করিয়া রহিয়াছে। আমরা যেটাকে একটা তুচ্ছ পাথর দেখিতেছি, আসলে সেটা ব্রহ্মের একটা জড়-সমাধির মূর্তি। অতএব কথাটা দাঁড়াইল এই যে, জড় বাধা হইতেই জন্মিয়াছে, এবং বাধা দিয়াই বাঁচিয়া আছে বটে, কিন্তু তার বাধা অতিক্রম করার একটা প্রচ্ছন্ন ও স্বাভাবিক ঝোঁক্ অবশ্যই রহিয়াছে। এই যে বাধাকে ঠেলিয়া নিজেকে বড় এবং চরমে ভূমা করিয়া তোলার ঝোঁক্—সেইটাই হইল জড়ের ব্রহ্মের তপঃ বা তপস্যার মূর্তি। সৃষ্টি করিতে গিয়া ব্রহ্ম তপস্যা করিলেন—এ তপস্যা যে কিরকম তপস্যা তা আমরা জড়ের পরীক্ষা করিয়াও কতকটা বুঝিতে পারিলাম। একটা বাধা বা গণ্ডী বস্তুকে খাটো করিয়া সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে। যে উপায়ে বা শক্তিতে সেই বাধা বা গণ্ডী ঠেলিয়া বস্তুটি নিজের সঙ্কোচ ও কার্পণ্য দূর করিতে পারে, ক্রমশঃ নানা অভ্যুদয়ের ভিতর দিয়া শেষকালে নিজেকে আবার ব্রহ্ম বা ভূমা ভাবে উপনীত করিতে পারে, সেই উপায় বা শক্তি হইতেছে তপঃ। আমরা দেখিলাম যে, জড়ের ভিতরেও এই তপঃশক্তি রহিয়াছে, যদিও তাকে চিনিয়া ধরিয়া ফেলা শক্ত।

বৈজ্ঞানিক কথাগুলিকে এত বড় করিয়া লইতে আপাততঃ প্রস্তুত না হইলেও, তৃতীয় একটা কথায় সায় দিতে তিনি এখনিই প্রস্তুত হইয়াছেন। সে কথাটি হইতেছে এই—সকল বস্তুই, এমন কি জড়ও, একটা গণ্ডীর মধ্যে চিরকাল থাকিতে চাহে না; সুতরাং জড়ের কোনো আয়তনই অচলায়তন নহে; এক আয়তন ভাঙিয়া যাইতেছে, তার স্থানে অপর আয়তন গড়িয়া উঠিতেছে। এ আয়তনটি যে আসলে ভোগ আয়তন, জড় যে আসলে আত্মা, বন্দী যে আসলে খোদ ব্রহ্ম—এইটা বুঝিলে একেলে বৈজ্ঞানিক ও সেকেলে ঋষিতে আর কোনো তফাৎ রহিবে না। সে মিলের যতই দেরী থাকুক না কেন, জড়ের ভিতরে তপস্যার যে মূর্তি আমরা ঋষিদের দৃষ্টিতে দেখিলাম, সে মূর্তি যে বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে সম্প্রতি প্রকট হইয়া উঠিতেছে—একথা বলিলে অতিশয়োক্তি করা হইবে কি?

জড়ের মধ্যে তপস্যার মূর্তি অস্পষ্ট, ভাল করিয়া খেয়াল করিয়া না দেখিলে ধরা পড়ে না। কিন্তু প্রাণের রাজ্যে আসিয়া এ মূর্তি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। জড়ের বেলা যত লম্বা আলোচনা আমরা করিলাম, প্রাণের বেলা তত লম্বা আলোচনা করার দরকার হইবে না। একটুখানি তাকাইলেই আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাণের ধর্মই হইতেছে নিজেকে সকল গণ্ডী ও বাধার বাহিরে ছড়াইয়া দেওয়া। একটা বটের বীজ কত ছোট! সেই ছোট বীজের ভিতরে একটা সত্তা-শক্তি কিসের যেন চাপনে খুব ছোট ও সঙ্কুচিত হইয়া বাস করিতেছে। একটা বড় স্প্রীং যেমন-ধারা চাপে ছোট হইয়া থাকে, তেমনি। কিন্তু সে চাপের ভিতরে থাকিয়া সে ত নিশ্চিন্ত হইয়া নাই। একটু অনুকূল অবস্থা পাইলেই, সে বীজের ভিতরকার সত্তা-শক্তি নিজের সঙ্কোচ ভাঙিয়া নিজেকে বড় করিতে

চায়; বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে চারাগাছ, চারা গাছ হইতে ক্রমশঃ বড় গাছ, শেষকালে হয়তো এমন একটা অতিকায় বৃক্ষ হইয়া বসে, যে বৃক্ষ এক বিঘা জমিতে হাত পা ছড়াইয়াও যেন স্বস্তি বোধ করে না। গোড়াকার সেই চাপ যেন সে আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দিতেছে, এবং চাপটি যত সরিয়া যাইতেছে সে ততই বড় হইতেছে। গোড়াকার সেই চাপে কায়েমি বন্দোবস্তে থাকিতে সে যেন নারাজ। বীজের মধ্যে এই যে বাধা, গণ্ডী, চাপ ঠেলিয়া দেওয়ার একটা স্বাভাবিক প্রেরণা রহিয়াছে, সে প্রেরণাটি খুবই সুস্পষ্ট; কেহই সেটিকে অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মাটি পাথরের বেলা আমাদের মনে যে খট্‌কা ও অনাস্থা হইয়া ছিল, এখানে সে সবের কোন আশঙ্কা নাই। হিন্দুর দৃষ্টিতে ঐ বীজের দেহ একটা ভোগ-আয়তন, আর ঐ মহামহীরুহের দেহও একটা ভোগ-আয়তন। ভোগের যখন যেরূপ অধিকার, তখন সেরূপ আয়তন। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মই এই সব বিচিত্র আয়তনের ভিতর দিয়া ভোগ করিতেছেন। তিনিই ঋতভুক্। শুধু ভোগ নয়, তপস্যা করিতেছেন।

যেখানেই দেখি একটা চাপ বা বাধা কোন জিনিসকে সঙ্কুচিত ও কৃপণ করিয়া রাখিয়াছে, আর সেই বস্তুটি সেই চাপ বা বাধার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া করিয়া সেটিকে আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দিতেছে, সুতরাং নিজেও আস্তে আস্তে সমৃদ্ধ ও বিকশিত হইতেছে, সেইখানেই আমরা বলিব যে, ভোগের সঙ্গে সঙ্গে তপস্যা বা "যোগ" আছে। বটের বীজকে বটগাছ হইতে গেলে তপস্যা করিতে হয়—কেন না, একটা স্বাভাবিক চাপ বা বাধাকে আর একটা স্বাভাবিক প্রেরণা দ্বারা জয় করিয়া, অপসারিত করিতে হয়। ইহাই হইল তপস্যার লক্ষণ। যেখানেই একটা সঙ্কোচের অবস্থা হইতে বিকাশ বা অভ্যুদয়ের অবস্থার দিকে ধীরে ধীরে বস্তু অগ্রসর হইতেছে, সেখানেই তপস্যা হইতেছে। বস্তুটি নিজে জ্ঞাতসারেই করুক, আর অজ্ঞাতসারেই করুক, তপস্যা সে করিতেছে। ব্রহ্ম সৃষ্টির মুখে কি যেন একটা চাপ বা বাধা দূর করিয়া দেন, তার ফলে এই মহাবটের আদি বীজটা অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করে; এই বিরাট যন্ত্রের মেইন স্প্রীংটা হইতে সেই চাপ সরাইয়া লন, আর যন্ত্রটা নিজের বিরাট আকার পাইয়া চলিতে আরম্ভ করে। আমরা এতক্ষণ ধরিয়া তপস্যার যে লক্ষণ আরম্ভ করিয়াছি, সে লক্ষণমত ব্রহ্মের বা সৃষ্টির কর্তার এই প্রথম কাণ্ডটিও তপস্যা।

বটের বীজের দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা প্রাণীর জগতে সনাতন তপস্যা-চিত্রটি বুঝিতে চাহিলাম। তাকাইয়া দেখিলে সে চিত্র আমরা সর্বত্রই দেখিতে পাই। যে বিন্দু হইতে আমাদের উৎপত্তি এবং আর আর সব জীবের উৎপত্তি, সে বিন্দুর মধ্যেও ঐ তপস্যা। আমাদের দেহের ভিতরে ঐ বিন্দু কত সূক্ষ্ম আকারে বিরাজ করিতেছে! অথচ তার সেই সূক্ষ্ম সত্তার ভিতরে লক্ষ লক্ষ যোনিতে ভ্রমণকারী অনন্ত-বাসনা-সংস্কার-সহকৃত একটি জীবের আত্মা বাস করিতেছে। নারীর জরায়ুতে সেই বিন্দু সিঞ্চিত হইলে,

তখন সেই বিন্দুর অভ্যন্তরশায়ী আত্মা এক তপস্যা আরম্ভ করিয়া দেন। মোটামুটি দশ মাস দশ দিনে সে তপস্যা সাঙ্গ হয়। সে তপস্যাটি আসলে কি? যে চাপ বা বাধা বা গণ্ডী সে আত্মাকে একটা বিন্দুর ভিতরে পুরিয়া ছোট এতটুকু করিয়া রাখিয়াছে, সেই চাপ, বাধা বা গণ্ডী আস্তে আস্তে সরাইয়া দেওয়া। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, গর্ভস্থ ভ্রূণ তপস্যা আর একটুখানি বড় করিয়া করিয়া থাকে। মাতৃগর্ভে সেই বিন্দুর ভিতর হইতে একটা শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আর শিশুর চেতনা শুধু যে ঐ দশমাস দশ দিনে ফুটিয়া উঠে, এমন নয়, যতদিন শিশু জরায়ু মধ্যে বাস করে, ততদিন না কি সে তার সব পূর্ব পূর্ব জন্মের কথাও মনে করিয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব-পূর্ব জন্ম সম্বন্ধে আমাদের যে স্বাভাবিক ভুলিয়া যাওয়া রূপ একটা গণ্ডী আছে, সে গণ্ডী ততদিন তার থাকেনা। গর্ভস্থ শিশু তাই একটুখানি অসাধারণ গোছের তপস্বী। আধুনিক প্রাণীবিজ্ঞান কথাটা অন্য আকারে বলেন— গর্ভের ভ্রূণ তার জাতির অতীত ক্রমবিকাশের বড় বড় পার্ট্‌গুলির রিহার্শল্‌ দিয়া থাকে।

এই সব দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, জীবকোষের ভিতরে একটা তপস্যা অহরহঃ চলিতেছে। সেই তপস্যার ফলে জীবকোষের পুষ্টি, বিকাশ ও বৈচিত্র্য হইয়া থাকে। জীবকোষের দেহে একটা কেন্দ্র থাকে, যে কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া এই সকল ব্যাপার চলিয়া থাকে। সেই কেন্দ্রই হইতেছে জীবকোষের শক্তিকেন্দ্র। জীবকোষের তপঃশক্তি এই শক্তিকেন্দ্র হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে। জলে একটা জীবকোষ ভাসিতেছে। পরীক্ষা করিয়া জানিলে দেখিতে পাইব যে, সে জীবকোষটি সুস্থির হইয়া নাই—তার ভিতরে একটা চাঞ্চল্য সজাগ হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে নিয়ত আহার চেষ্টা করিতে হইতেছে, আহার পাইয়া তার পুষ্টি হইতেছে; পুষ্ট হইয়া এক সে দুই হইয়া যাইতেছে, দুই চারি হইতেছে—এই ভাবে এক হইতে বহু উৎপন্ন হইতেছে। সে বহুও আবার সব সময় যে আলাদা হইয়া থাকে এমন নয়; তারা দল বাঁধিয়া এক একটা কায়ব্যূহ নির্মাণ করে। এই রকমই একটা সূক্ষ্ম বটের বীজ হইতে কালে প্রকাণ্ড বড় একটা বটগাছ জন্মিয়া থাকে; মাতৃগর্ভে একটা সূক্ষ্ম বিন্দুকণা হইতে কালে হাতীর মত অথবা তিমি মাছের মত একটা বিশালকায় জন্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে শক্তি-প্রভাবে এই আশ্চর্য ঘটনাটি নিয়ত ঘটিতেছে, সে শক্তিটি তপঃশক্তি। এ তপঃশক্তি নহিলে সৃষ্টি ও বিকাশ হয়না।

অবশ্য প্রতি জীবকোষের ভিতরে এর বিরোধী একটা শক্তিও রহিয়াছে। উপনিষদের ভাষায় বলিতে গেলে, সে শক্তিটি হইতেছে শ্রম অথবা মৃত্যু। এই শ্রম বা মৃত্যু সৃষ্টি ও বিকাশে বাধা দিয়া থাকে; বস্তুর সত্তাকে সঙ্কুচিত ও মূর্ছিত করিয়া রাখে। এই শ্রম বা মৃত্যুই হইতেছে তপস্যার অন্তরায়। এই মৃত্যুর কথা আমরা কিছু পরে আবার আলোচনা করিব। প্রত্যেক জীবকোষের জীবন ব্যাপারে এই দুইটি বিরোধী

শক্তিকে আমরা অহরহঃ দেখিতে পাই। একটি শক্তি হইতেছে ইন্দ্র, অপরটি হইতেছে বৃত্র বা অহি; একটি হইতেছে অগ্নি, অপরটি হইতেছে সলিল বা অপ্। একথাও আমরা পরে ভাঙিয়া বলিব। জড়ের কথা আমরা আগেই সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। সেখানেও এই দুইটা বিরোধী শক্তি ইন্দ্র ও বৃত্র—বিদ্যমান রহিয়াছে। বজ্রের কথায় এ দুয়ের পরিচয় আমরা আগেই ভাল করিয়া লইয়াছি! জড়ের মধ্যে চাপ ও বাধা দিবার যেমন একটা স্বাভাবিক বন্দোবস্ত আছে, তেমনি আমরা দেখিয়াছি যে, সে চাপ ও বাধাটিকে ঠেলিয়া সরাইবারও একটা স্বাভাবিক প্রেরণা জড়ের মধ্যে আছে। দ্বিতীয়টিকে আমরা জড়ের তপঃশক্তি বলিয়াছি: প্রথমটিকে আমরা জড়ের শ্রম, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু বলিতে পারি। বৈজ্ঞানিকেরাও এই শেষেরটিকে জড়ের জড়ত্ব (Inertia) বলেন। আমাদের পরিভাষা মত এই Inertia হইতেছে এক্ষেত্রে বৃত্র বা অহি।

আমাদের অন্তঃকরণের রাজ্যে আসিয়াও আমরা এই দুইটি বিরোধী শক্তিকে স্পষ্ট দেখিতে পাই। আমাদের ভিতরে যখন অবসাদ, আলস্য, শ্রান্তি, নিদ্রা, মূর্চ্ছা, মোহ, জড়তা—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন বুঝিতে হইবে আমরা বৃত্র বা অহির এলেকায় রহিয়াছি, যে বৃত্রের নাম শাস্ত্র দিয়াছেন তমঃ। সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রে আমাদের চিত্তের তিন রকম অবস্থার কথা বলা হয়—শান্ত, ঘোর, মূঢ়। এখন চিত্তের এই মূঢ় অবস্থা তপঃশক্তির একটা বিরোধী অবস্থা; অর্থাৎ এই মূঢ় অবস্থা দেখিলেই আমাদের বুঝিতে হইবে যে আমাদের স্বাভাবিক তপঃশক্তি দুর্বল হইয়াছে। এই মূঢ় অবস্থা হইতে আমাদের চিত্ত যখন জাগিয়া উঠে ও প্রস্ফুটিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, আমাদের স্বাভাবিক তপঃশক্তি আবার সবল হইয়াছে। এইভাবে দেবাসুরের সংগ্রাম আমাদের নিত্য জীবনে সদাই চলিতেছে। একবার দেবতাদের জয়, অসুরদের পরাজয়, আর একবার অসুরদের জয়, দেবতাদের পরাজয়। এ হারজিতের মামলার চরম নিষ্পত্তি যে কবে হইবে, তা আমরা জানিনা; কিন্তু উপায় বিশেষ অবলম্বন করিয়া এর নিষ্পত্তির পথ অনেকটা সুগম করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সেই উপায় বিশেষই হইতেছে মানুষের ধর্মসাধন।

আমরা জড়ে, প্রাণে ও অন্তঃকরণে তপস্যার মূর্তি মোটামুটি একরকম দেখিয়া লইলাম। যেটি তপস্যার বিঘ্ন ঘটাইতেছে, সেটির চেহারাও আমরা কটাক্ষে দেখিয়া লইলাম। এখন তপঃ এই কথাটার প্রচলিত মানেটা আমাদের একটুখানি বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তপ্ ধাতু হইতে তপঃ ও তপস্যা এ দুইটি কথা হইয়াছে। তপঃ ও তাপ মূলে একই কথা। তাপ বলিতে আমরা সচরাচর বুঝি তেজঃ বা অগ্নি; ইংরাজীতে যাহাকে বলে Heat। এই অগ্নি বা হিট্ যে নিখিল ভূতে বিদ্যমান, সেকথা শ্রুতি মুক্তকণ্ঠে আমাদের বারবার শুনাইয়াছেন। আমরা ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনায়, এবং "বেদ ও বিজ্ঞানে" অগ্নির এই সর্বব্যাপিত্বের কৈফিয়ৎ ও নজির দুইই দাখিল

করিয়াছি। এখানে সে সকলের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখন অগ্নি বা হিটের একটা সাধারণ কর্ম হইতেছে দ্রব্যের আয়তন বড় করিয়া দেওয়া, বস্তুকে প্রসারিত করিয়া দেওয়া—Heat expands bodies। শৈত্য (cold) এর বিপরীত কার্যটি করিয়া থাকে; দ্রব্যের আয়তন ছোট করিয়া দেয়—cold contracts bodies। এ প্রাকৃতিক সত্যদুইটির দৃষ্টান্ত দেওয়ার প্রয়োজন নাই। অগ্নি বা তেজ বস্তুর ভিতরে থাকিয়া বস্তুকে বড় করিয়া রাখে, এইজন্য সেই তাপকে আমরা তপঃ বলিতেছি। শৈত্য বস্তুকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে; এইজন্য শৈত্যকে আমরা তপের বিরোধী অবস্থা বলিতেছি। বস্তুর ভিতরে তাপ রহিয়াছে বলিয়া সে সজাগ হইয়া রহিয়াছে, এবং তার সকল প্রকার ব্যাপার নির্বাহ হইতেছে। তাপ না থাকিলে বস্তু একেবারে যেন মরিয়া রহিত, তার কোনরূপ চেষ্টা, কোনরূপ ব্যাপার সম্ভবপর হইত না। তাপ অবশ্য একটা আপেক্ষিক ধর্ম; "ক" "খ"য়ের তুলনায় গরম, আবার "গ"এর তুলনায় ঠাণ্ডা। কিন্তু তা হইলেও, প্রত্যেক বস্তুর ভিতরে দানাগুলির দোলাকাঁপা নিত্যই চলিতেছে; এ দোলযাত্রার আদিও নাই অন্তও নাই; যদি বা থাকে, আমরা তার কোনই খবর রাখিনা। এখন এই নিত্য দোল জাগাইয়া রাখিয়াছে কিসে? ঐ অগ্নি বা তাপ, যার কথা আমরা বলিতেছি।

এই নিত্য-দোল আবার একঘেয়ে হইলে লীলাময়ের চলেনা; এইজন্য এ দোলে রকমারি হইয়াছে। আমরা দেবদোল ও নরদোলের কথা বলিয়া থাকি, কিন্তু জানিনা যে, এই মহাব্রজে প্রত্যেক রজঃ আপনভাবে, আপন লীলায় এই নিত্যদোল খেলিয়া যাইতেছে। এই নিত্যদোল বিশ্বদোল। এই বিশ্বদোলে বৈচিত্র্য আছে বলিয়া বিশ্বের যত খেলা চলিতেছে; দোল না থাকিলে অথবা দোল একঘেয়ে হইলে, এই সকল খেলা কিছুই থাকিত না। জড়ের তরফ হইতে বৈজ্ঞানিক একথা খুবই মানিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি বলেন যে, দ্রব্যে তাপ আছে বলিয়াই সেটি দ্রব্য হইয়া রহিয়াছে; আরও বলেন যে, একটা দ্রব্য ও অপর একটা দ্রব্য এ দু'য়ের মধ্যে তাপের তফাৎ আছে বলিয়াই দ্রব্যে দ্রব্যে দোলের নিত্য হোলি খেলা চলিতেছে; তাপ না থাকিলে, অথবা তাপের বৈষম্য না থাকিলে এসব খেলা একেবারে থামিয়া যাইত। জড়-জগতে তাপের সাম্য (Equilibrium) নাই বলিয়াই জড়-জগতে সকল রকম গতি ও ক্রিয়া চলিতেছে। সাম্য যদি কোন রকমে হইয়া পড়ে, তবে সে অবস্থায় কোন দ্রব্য যদি থাকে, তবে সে স্থাণু হইয়া যাইবে; তার কোন গতি এবং কোন ক্রিয়া থাকিবে না। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জগতের সকল গরম জিনিসই নিজেদের তাপ চারিধারে বিলাইয়া দিয়া ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে চাহিতেছে। সকল জিনিসের তাপ সমান হউক, এটার তাপে এবং ওটার তাপে কোন তফাৎ না থাকুক,—এই রকম একটা অবস্থার দিকে ক্রমশঃ যেন এই জগৎটা হাঁটিয়া চলিতেছে। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় ইহাকে বলে—Mobile Equili-

brium of Temperature। সব জিনিসেরই তাপ একরকম হবার দিকে একটা ঝোঁক্ রহিয়াছে। এখন বিশ্বের তাপ বা দোল যদি একঘেয়ে হইয়া যায়, তবে বিশ্ব অচল হইবে। এই অচল হবার দিকে, অর্থাৎ প্রলয়ের দিকে, বিশ্বের একটা ঝোঁক্ রহিয়াছে, একথা বৈজ্ঞানিকও এখন মানিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বিশ্বের এই অচল অবস্থাই হইতেছে শ্রম বা মৃত্যু। বিশ্ব আবহমান কাল হইতে অগ্নি বা তাপরূপে নিজের তপঃশক্তি বহাল রাখিতে পারিয়াছে বলিয়া, এখনও টিকিয়া আছে। এ বিরোধী শক্তিও সঙ্গে সঙ্গে যে কাজ করিতেছে, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। যেখানেই তপঃশক্তি কাজ করে, সেখানেই সবল ভাবেই হউক আর দুর্বল ভাবেই হউক, তার বিরোধী শক্তিটিও কাজ করিয়া থাকে। যেখানে অগ্নি আছেন, সেখানে সলিলও আছেন; যেখানে ইন্দ্র আছেন, সেখানে বৃত্রও আছেন। একই অখণ্ড অব্যক্ত অবস্থা হইতে এই বিরোধী শক্তি দুইটার উদ্ভব। বেদ তাই ইন্দ্র ও বৃত্র এ দু'জনকে কোন কোন স্থানে "সহোদর" করিয়াছেন। দুয়ের আদি হইতেছে একটা বিরাট অব্যক্ত অবস্থা যা হইতে শক্তির ঐ দুইটি বিরোধী রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। বলা বাহুল্য যে, সকল দ্বৈত বা বিরোধের মূলে একটা অদ্বৈত অব্যক্ত অবস্থা থাকে, যেমন আমাদের সুখ দুঃখ, জ্ঞান অজ্ঞান, রাগ-দ্বেষ। এগুলি সব পরস্পর-বিরোধী। কিন্তু প্রত্যেক বিরোধটির মূলে একটা করিয়া অদ্বৈত অব্যক্ত অবস্থা আছে। ঠিক সুখও নয়, অথবা ঠিক দুঃখও নয়, এমন একটা অবস্থা হইতে আমাদের সকল সুখ-দুঃখের অনুভব ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার তাতেই গিয়া লয় পাইতেছে; ঠিক জ্ঞানও নয় অথবা ঠিক অজ্ঞানও নয়, এমন একটা অবস্থা আমরা চিন্তা করিতে পারিনা কিম্বা বলিতে কহিতে পারিনা বটে, কিন্তু আছে, এবং সকল জানা-অজানার আশ্রয় ও নিলয় হইয়া আছে। এই রকম ধারা, আমাদের রাগদ্বেষের মূলেও একটা অব্যক্ত অবস্থা আছে, যে অবস্থাকে কেহ কেহ উদাসীন অবস্থা বলেন, কিন্তু সে অবস্থা বলিয়া কহিয়া বুঝান যায় না। ইন্দ্র ও বৃত্র যে এক অব্যক্ত অবস্থার গর্ভে জন্মিয়াছেন এবং এখন জন্মিতেছেন, সেই অবস্থাটিকে লক্ষ্য করাই বোধহয় শ্রুতির অভিপ্রেত। সে যাই হ'ক্, বিশ্বের সর্বত্র তপঃশক্তি এবং তার বিরোধী শক্তিটির চেহারা আমরা যেন দেখিলে চিনিতে পারি। সে চেহারা ফুটিয়াছে অনেক রকমে, কিন্তু আসলে সেটি একই রকম।

কেবলমাত্র যে জড়ে তপঃ তাপরূপে বিরাজ করিতেছেন এমন নয়, প্রাণে এবং অন্তঃকরণেও তিনি ঐ রকম একটা কিছু হইয়া বিরাজ করিতেছেন; না করিলে প্রাণের রাজ্যে ও মনের রাজ্যের এই নিত্য-দোল ও হোলি বন্ধ হইয়া যাইত। দোল ও হোলি এ দুইটিকে আলাদা করিয়া বলার হেতু আছে। কোন জিনিসে তাপ থাকিলে, তার দানাগুলি দোলে; দোলে বলিয়াই সেটার তাপ আমরা বুঝিতে পারি। বৈজ্ঞানিকের কথায়—Heat is a mode of motion। জীবকোষের ভিতরে তাপ অথবা তাপের

মত একটা কিছু, রহিয়াছে বলিয়াই, তার দানাগুলি নিয়ত দুলিতেছে, কাঁপিতেছে, সজীব ও সজাগ হইয়া রহিয়াছে। আমাদের মনেও তাপ বা তাপের মত একটা কিছু আছে বলিয়াই আমাদের মন মনন করিতেছে,—ঘুমাইয়া বা মরিয়া নাই। জড়, প্রাণ ও মনের এই যে সজাগ ও সক্রিয় ভাব, যে ভাবের বিরাম যতদিন সৃষ্টি ততদিন নাই, সে ভাবটিকে আমরা বলিতেছি "দোল"। আমরা আগেই সংবাদ লইয়াছি যে, ভিতরে রস বা আনন্দ আছে বলিয়াই এই নিত্য দোললীলা চলিতেছে; এমন কি জড়ের বেলাতেও তাই। কিন্তু বিশ্বের সকল অধিবাসী কেবল যে এই ভাবে সজাগ রহিয়াছে এমন নয়,—পরস্পরের সঙ্গে ভাবের, বেদনার ও কাজের কারবার করিতেছে; শুধু জাগিয়া নাই, সকলে মিলিয়া খেলিতেছে। এই খেলাটা হইতেছে হোলি খেলা; যেমন তাদের জাগিয়া থাকা হইতেছে দোললীলা। দোল ও হোলি এ দুইটিকে আলাদা করিয়া বলার হেতু আমাদের এই।

এখন প্রাণীজগতে এমন একটা সময় আসে, যখন নিখিল প্রাণের ভিতরের শৈত্য অবসাদ যেন দূর হইয়া যায় এবং ভিতর হইতে কি যেন একটা অব্যক্ত উষ্মা বা তাপ যেন তাহাকে সজাগ ও চঞ্চল করিয়া তোলে। সেই সময় সকল প্রাণীর ভিতরে একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়, একটা বিকাশের ব্যাকুলতা গুমরিয়া উঠে। সেই কাল বিশেষভাবে দোলযাত্রার কাল। সে দোলযাত্রায় জাগিয়া ও চঞ্চল হইয়া বিশ্বপ্রাণী যে উৎসবে মাতিয়া উঠে, সেই উৎসবের নাম বসন্ত-উৎসব বা মদনোৎসব। সে উৎসব, যে খেলার ভিতর দিয়া নিজেকে জানাইতে চায়, সে খেলাটি হইতেছে হোলি খেলা। নিত্য দোল ও নিত্য হোলিখেলা ত আছেই; তার কথা আমরা আগে বলিয়াছি। এ যেন প্রকৃতির আসরে একটা বিশেষ বন্দোবস্ত। বসন্ত-বাসরে প্রকৃতির এই আসর পাতা হইয়া থাকে। তখন ঝরাপাতার নগ্নতার ভিতর হইতে গাছপালা আবার নূতন পাতা মুকুল ও ফলফুলে নবীন হইয়া উঠে; সকল রিক্ত ও পুরাতন আবার যেন পূর্ণ ও তরুণ হইয়া উঠে; ছোট একটি ঘাসও এ মহোৎসবের নিমন্ত্রণে বাদ পড়ে না। পশু, পক্ষী, মানুষ—এদেরও অন্তরের বীণাটিও বিশ্বপ্রাণীর এই যৌবনের সঞ্চারের সুরে সুর মিলাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। প্রকৃতিতে এই যে বসন্তোৎসব, এটিকে তপঃ বা তপস্যা বলিলে অনেকে হয়ত রাগ করিবেন; কেন না তাঁদের ধারণায় তপঃ একটা কৃচ্ছ্রসাধন, নিজের উপর একটা জবরদস্তি করা। আমরা কিন্তু তপস্যার লক্ষণ এভাবে করি নাই। এভাবে করিলে সৃষ্টি, বিকাশ এবং সকল খেলার ভিতরে আমরা তপস্যাকে দেখিতে পাইতাম না; এবং বুঝিতে পারিতাম না, কেন ও কি করিয়া প্রজাপতির সৃষ্টি ব্যাপারটিকে একটা তপঃ—বা তপস্যা ভাবা যাইতে পারে। আমরা নিখিল বস্তুতে তপঃকে যে চেহারায় দেখিতে পাইয়াছি, সে চেহারা কেবলমাত্র যে একটা ঊর্ধ্ববাহু অথবা বল্মীকে পরিণত কোন এক তপস্বীর চেহারা এমন নয়। সে

চেহারা হইতেছে সৃষ্টির ও বিকাশের চেহারা, সকল বাধা ও গণ্ডী ঠেলিয়া সরাইবার চেহারা। যে বস্তুটি নিখিল পদার্থে এই চেহারা ধরিয়া রহিয়াছে তার আসল নাম রস বা আনন্দ। আমরা কখনও সেটিকে ইন্দ্র বলিয়া থাকি, কখনও বা অগ্নি বলিয়া থাকি, কখনও বা আর কিছু বলিয়া থাকি। নাম যাহাই হ'ক বস্তু বা তত্ত্ব এক। তাদের বিরোধী বা অন্তরায় একটা কিছুও আমরা দেখিতে পাইয়াছি। সে একটা কিছুর নাম কখনও বা দিই রাত্রি, কখনও বা দিই মৃত্যু, কখনও বা দিই সলিল, কখনও বা দিই বৃত্র বা অহি, কখনও বা দিই মধু-কৈটভ। নাম তার আলাদা আলাদা, কিন্তু বস্তু এক। ভোল ফিরাইয়া সেই আবার সংবর্ত্তাসুর, প্রলম্বাসুর ইত্যাদি আকারে বৃন্দাবনের রাসলীলায় বিঘ্ন ঘটাইতে চাহিয়াছে; কিন্তু বিঘ্ন হয় নাই। কেন না স্বয়ং রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সে লীলার মূল তদ্বিরকারক। যে শক্তিতে সেই সকল রাস-বিঘ্ন দূর হইয়াছিল, সেই শক্তি আমাদের ঐ পরিচিত তপঃশক্তি—যে শক্তিতে এই সৃষ্টির লীলা চলিয়াছিল ও চলিতেছে।

মধু ও কৈটভ

জড় প্রাণ ও অন্তঃকরণের রাজ্যে তপস্যার আসন যে কোথায় কিভাবে আস্তীর্ণ রহিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সকল পদার্থের একটা স্বাভাবিক ধর্মের মধ্যে দিয়া তপঃশক্তির চেহারাখানি আমরা বেশ ভাল মতে দেখিতে পাই। সে স্বাভাবিক ধর্মটি হইতেছে, বস্তুর স্থিতি-স্থাপকতা—ইংরাজিতে যেটিকে বলে Elasticity. জড় পদার্থে এই ধর্মটির পরিচয় খুব স্পষ্ট কিন্তু জড় ছাড়া অন্য পদার্থেও এ ধর্ম রহিয়াছে। একটা রাবারের বল জোরে টিপিয়া ধরিলে সঙ্কুচিত হইয়া যায়; চাপ সরাইয়া লইলে আবার সেই বল আগেকার অবস্থায় ফিরিয়া যায়। স্থিতিস্থাপকতার এই একটা উদাহরণ। সকল জিনিষেই এই ধর্মটি কিছুনা কিছু রহিয়াছে। এ ধর্মটি আর কিছুই নয়, বস্তুর নিজস্ব সত্তা ও রূপটি বজায় রাখিবার প্রয়াস। কোন আগন্তুক কারণে সেই নিজস্ব সত্তা ও রূপটি নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইলে, বস্তুর ভিতরে এমন একটি স্বাভাবিক প্রেরণা ও বন্দোবস্ত দেওয়া আছে, যার ফলে বস্তু সেটিকে সহজে নষ্ট হইতে দেয় না, কথঞ্চিৎ নষ্ট হইলেও সেটিকে আবার স্বভাবে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করে। বস্তু নষ্ট হইতে পারে দুই রকমে—বস্তুটি থাকিয়াও যদি তাহার কার্যকরী শক্তি চাপা বা ঢাকা পড়িয়া যায়, তবে তার ফলে বস্তুটি থাকিয়াও না থাকার সামিল হইয়া পড়ে। এ ক্ষেত্রে বস্তু-শক্তির প্রতিরোধ অর্থাৎ বস্তুটির আবরণ হইল। অথবা অন্য রকমেও বস্তু নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। বস্তুটির যদি বিকৃতি অথবা বৈরূপ্য ঘটে, তবে আমরা বলি বস্তুটি নষ্ট হইয়া গেল। বস্তুর এই আবরণ ও বিক্ষেপ আমাদিগকে আলাদা করিয়া বলিতে হইতেছে বটে কিন্তু মূলে ব্যাপারটা একটি কথাতেই বলিতে পারা যায়—অন্যথাভাব; বস্তুটি যে রকম ছিল এখন আর সে রকম নাই। আবরণ হইলেও এই কথা, বিক্ষেপ বা বিকৃতি হইলেও এই কথা। শাস্ত্রকারেরা এই দুটিকে আলাদা করিয়া বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আসলে এই দুইটা হইতেছে একই ব্যাপারকে দুই দিক দিয়া দেখা। যেখানে মধু সেখানেই কৈটভ, একজন ছাড়া অপরে থাকে না। জড়ে, প্রাণে, অন্তঃকরণে এই দৈত্যযুগলের প্রাদুর্ভাব কখনও বেশী কখনও কম সর্বদাই রহিয়াছে। সে প্রাদুর্ভাবের ফলে সকল বস্তুই নিজের স্বাস্থ্য ও স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাইবার মত হয়। কিন্তু সে দৈত্যযুগলকে বাধা দিবার মত একটা স্বাভাবিক শক্তিও প্রত্যেক বস্তুর ভিতরে রহিয়াছে। সেই স্বাভাবিক শক্তি হইতেছে তপঃশক্তি। যোগনিদ্রায় মগ্ন বিষ্ণুর নাভি-কমলে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিবার উপক্রম করিয়াছেন। কিন্তু ঐ দৈত্যযুগলের আবির্ভাব হওয়ায় সব নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইল। তখন সব রক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মাকে

যে উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, সে উপায় আর কিছুই নয়, তপস্যা। ব্রহ্মা, তপস্যা করিয়া বিষ্ণুর যোগনিদ্রা হরণ করিলেন, বিষ্ণু জাগ্রত হইলেন। সৃষ্টি-প্রক্রিয়া আবার তখন স্বভাবে ফিরিয়া আসিল, রবারের বলের উপর হইতে যেন চাপটা সরিয়া গেল।

তপঃশক্তির মোটামুটি বিবরণ আমরা লিখিলাম বটে, কিন্তু ইহার ভিতরে একটা সূক্ষ্ম কথা সবিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিতে হইবে। স্বাভাবিক বন্দোবস্তের ফলে সকল জিনিষের ভিতরেই মধু-কৈটভ এবং তপঃশক্তি রহিয়াছে বটে, এবং তাদের পরস্পরের সংঘর্ষ চলিতেছে বটে, কিন্তু একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, এ শক্তি দুটির মাত্রা নিয়ত নির্দিষ্ট নহে। বিজয়লক্ষ্মী যে কার গলে জয়মাল্য দিবেন, তা আগে হইতে ঠিক হইয়া নাই। তপঃশক্তির বেশী-কমি হইতে পারে; সাধনা ও অনুশীলন দ্বারা এ শক্তির উপচয় আবশ্যক মত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। জড়ের মধ্যে কোনরকম সাধনার সাড়া আমরা অবশ্য পাই না; সাধনা থাকিলেও আমরা তা ধরিতে বুঝিতে পারি না। কিন্তু প্রাণের ও মনের রাজ্যে এ সাধনা যে চলিয়াছে অথবা চলিতে পারে, এ পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। প্রত্যেক সজীব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (living tissue) প্রতি নিয়ত ভিতরের ও বাহিরের শত্রুকে বাধা দিবার এবং ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেক জীবকোষ যেন এক একটা দুর্গ অল্প বিস্তর সুরক্ষিত—রীতিমত পাহারার বন্দোবস্ত আছে। আমাদের রক্তের শ্বেতকণিকাগুলি আমাদের দেহ-দুর্গে অনেকটা রক্ষীর কাজ করিয়া যাইতেছে। তাছাড়া আমাদের দেহের গ্রন্থিবিশেষ হইতে কতকগুলি অদৃশ্য রস নিঃসৃত হইয়া দেহের পোষণ ও রক্ষণ কার্যে অনেক সহায়তা করিতেছে।

যে শক্তি-প্রভাবে দেহের কোষগুলি এইভাবে শত্রু ঠেকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়া যাইতেছে, সেই শক্তি আমাদের পরিচিত তপঃশক্তি। আমরা সকলেই জানি যে, শরীরের কোন অঙ্গ, রোগে হউক অথবা আঘাতে হউক অসুস্থ হইয়া পড়িলে, আমাদের জীবনী-শক্তির স্বাভাবিক ব্যবস্থার ফলে অনেক সময় সে অসুস্থ অঙ্গটি আবার সারিয়া উঠে। ইহাও আমাদের প্রাণশক্তির সেই স্থিতিস্থাপকতা অথবা তপঃশক্তি। এ তপঃশক্তি না থাকিলে শরীর রক্ষাও হইত না, এবং শরীরের কোথাও কোন রূপ দোষ বা হানি হইলে তার আর কোন প্রতীকার হইত না। চিকিৎসকেরা এই natural tissue resistance এবং cure এর কথা বেশ ভাল মতেই জানেন। এখন কথাটা এই যে কোন্ কোন্ উপায়ে দেহের এই তপঃশক্তি বাড়াইয়া তোলা যাইতে পারে। সেই সেই উপায়ই হইতেছে স্বাস্থ্য-সাধনা ও স্বাস্থ্যরক্ষা। বৈদ্যশাস্ত্রে মোটামুটি সে সাধনার কথা আছে। অসাধারণ ফল লাভ করিতে হইলে যোগমার্গ অবলম্বন করিতে হয়। সে উপায়ে কেবল রোগ ব্যাধি কেন, জরা মৃত্যু পর্য্যন্ত জয় করা সম্ভবপর হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রাণের তপঃশক্তির পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিতে পাইতেছি।

অন্তঃকরণেও যে স্বাভাবিক তপঃশক্তিটি কাজ করিতেছে, তার সাধারণ চেহারাখানি আমরা সহজেই দেখিতে পাই। মনে কোন কারণে ব্যথা লাগিলে, সে ব্যথায় মন কিছুকালের জন্য মুষড়াইয়া পড়ে, কিন্তু সে ব্যথা ঝাড়িয়া ফেলিয়া আবার নিজের স্বাভাবিক আনন্দে ফিরিয়া যাইবার একটা প্রেরণা ও চেষ্টা স্বভাবতই মনের মধ্যে রহিয়াছে দেখিতে পাই। এইজন্য পুত্রশোকাতুরা জননীর মুখেও দু'দশ দিন পরে হাসি ফুটিয়া উঠিতে দেখি। সেই রবার বলের মত মনের সর্ব্বদাই চেষ্টা রহিয়াছে, তার সকল চাপ ও বাধা সরাইয়া ফেলিয়া আবার স্বাভাবিক স্বস্তিতে ফিরিয়া যাইবার দিকে। সে চাপ ও বাধা (মধু-কৈটভ) নানা সাজে, নানা আকারে, নানা সময়ে আসিয়া দেখা দেয়। কখনও মোহ, কখনও অবসাদ, কখনও ক্লান্তি, কখনও বেদনা, কখনও অজ্ঞান, কখনও সংশয়—এই সব নানা চেহারা সেই অন্তঃকরণ বিচারী দৈত্যযুগলের। সর্ব্বদাই এ যুগলের সঙ্গে একটা লড়াই চলিতেছে। হার-জিতের কোন ঠিক ঠিকানা নাই। কিন্তু কোন কোন উপায়ে হার-জিতের ঠিক ঠিকানা করিয়া লওয়া চলিতে পারে। সেই সেই উপায় হইতেছে সাধনা। অষ্টাঙ্গ যোগ সে সাধনার প্রশস্ত রাজমার্গ। অষ্টাঙ্গ যোগের মূল কথা দুইটি—প্রত্যাহার ও সংযম। পাতঞ্জল দর্শনে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটিকে এক কথায় সংযম বলা হইয়াছে—"ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।" অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম চারিটি সোপান—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম—ঠিক যোগ নহে, যোগের যোগাড় যন্ত্র মাত্র। আসল যোগ আরম্ভ হইল প্রত্যাহারে, এবং যোগের পরিসমাপ্তি হইল সমাধিতে। চিত্ত চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে, সেই ছড়ানো চিত্তকে গুটাইয়া ফিরাইয়া আনা—এর নাম প্রত্যাহার। এতক্ষণ চিত্ত কোন কিছুতে স্থির ছিল না জলৌকা বৃত্তি আশ্রয় করিয়া ছিল, এইবার তাকে কিছুতে স্থির করিয়া ফেলা, একাগ্র করা—ইহাই হইল সংযম। স্বাভাবিক তপঃশক্তির অনুশীলন করিতে হইলে এই পথে আমাদের চলা ছাড়া উপায় নাই, অর্থাৎ, প্রত্যাহার ও সংযম এ দুইটি আমাদের করিতেই হইবে।

তপস্যার এই দুই রকম বিবরণ আমরা পাইলাম। যে শক্তি-প্রভাবে বস্তু নিজের সত্তাকে প্রসারিত করিতে পারে, সেই শক্তিটিকে আগে আমরা তপঃ বলিয়াছি। তারপর, যে শক্তি-প্রভাবে বস্তু স্থিতি-স্থাপক হয়, সেই শক্তিটিকে আমরা তপঃ বলিলাম। বলা বাহুল্য যে দুইটি বিবরণ আলাদা হইলেও পরস্পর বিরুদ্ধ নয়। শেষকালে, অন্তঃকরণের রাজ্যে আসিয়া তপঃশক্তির আরও একরকম পরিচয় আমরা পাইলাম—প্রত্যাহার ও সংযম। তলাইয়া দেখিতে গেলে, এ ক্ষেত্রেও মূল কথাটি একই। যে বস্তু স্থিতিস্থাপক, এবং যে বস্তু নিজ সত্তাকে প্রসারিত করিতে সমর্থ, সে দুই বস্তুই চাপ বা বাধা সরাইয়া দিবার শক্তি রাখে। সে শক্তিটি না থাকিলে বস্তু স্থিতিস্থাপক হইত না, অথবা বিকাশ প্রাপ্তও হইত না। অতএব, মূল ব্যাপার

হইতেছে গণ্ডী বা বাধা সরাইয়া দিবার শক্তি। এই শক্তিই তপঃশক্তি। প্রত্যাহার ও সংযমের বেলাতেও শক্তিকে এই মূর্তিতেই আমরা দেখিতে পাই। শক্তিগুলি সব যতক্ষণ ছড়াইয়া এবং এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে শক্তিগুলি যেন থাকিয়াও নাই। যতক্ষণ শক্তিগুলি সব এক মুখ বা একাগ্র না হইতেছে, ততক্ষণ শক্তি-গুলিকে ঠিক সমর্থ মনে করা যায় না। শক্তিগুলিকে সমর্থ করিয়া তুলিতে হইলে, প্রথম কাজ হইতেছে তাহাদিগকে মোড় ফিরাইয়া একমুখ বা একাগ্র করিয়া আনা। এই কাজটির নাম প্রত্যাহার। তারপর সে একাগ্র শক্তিপুঞ্জ যদি কোন কেন্দ্রে স্থির করিতে পারা যায়, তবে যে ব্যাপারটি হইল, তার নাম সংযম (ধারণা ইত্যাদি)। সূর্য্যের আলোক রেখাগুলি চারিধারে ছড়াইয়া পড়িতেছে। যদি কোন বক্র দর্পণে সেই আলোক-রেখাগুলি প্রতিফলিত করিয়া তাহাদিগকে একটা কেন্দ্রে সম্মিলিত ও ঘনীভূত করিতে পারা যায়, তবে সে আলোক রেখাগুলি একটা অসাধারণ সামর্থ্য লাভ করিয়া বসে। যে সকল কাজ বিচ্ছিন্ন আলোক রেখাগুলি কোনমতেই করিতে পারিতে ছিল না, সে সকল কাজ সম্মিলিত কেন্দ্রীভূত আলোক সহজেই করিতে পারে।

তপস্যার প্রত্যাহার ও সংযম বলিয়া যে রূপটি আমরা দেখাইলাম, সে রূপ কেবলমাত্র যে সাধনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ এমন নয়। অবশ্য সাধনার ক্ষেত্রেই সে রূপটি স্পষ্ট ধরিতে পারা যায় কিন্তু সৃষ্টির সর্বত্রই কিছু না কিছু স্বাভাবিক প্রত্যাহার ও সংযমের বন্দোবস্তও রহিয়াছে। জড়, প্রাণ ও অন্তঃকরণ এ সকল ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক প্রত্যাহার ও সংযম আছে। জড়ের রাজ্যে যেখানে দেখিতে পাই পদার্থের শক্তিগুলি এলোমেলো ভাবে ছড়াইয়া না রহিয়া নির্দিষ্ট কোন কোন দিকে নিজদিগকে অভিমুখীন করিয়া রাখিতেছে, সেখানেই আমাদিগকে মনে করিতে হইবে যে পদার্থ তার স্বাভাবিক প্রত্যাহার ও সংযমশক্তি ব্যবহার করিতেছে। এখন লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, একেবারে এলোমেলো ভাবে, লক্ষ্যহারা ভাবে ছড়াইয়া কোন পদার্থেরই শক্তিপুঞ্জ নাই, থাকিতেও পারে না। জগতে যদি একটি মাত্র পদার্থ একলা থাকিত, তবে কি হইত বলিতে পারি না; কিন্তু বর্তমান অবস্থায় দেখিতে পাই যে প্রত্যেক পদার্থ অন্য পদার্থের সঙ্গে কারবারে প্রবৃত্ত হইয়া তাদের দিকে নিজের শক্তিগুলিকে কোন না কোন রকমে সাজাইয়া রাখিয়াছে। একটা চুম্বকের নিকট যদি লোহা ছাড়া আর পাঁচটা জিনিষ পড়িয়া থাকে, তবে আমাদের মনে হয় যেন চুম্বকটির সেই সব জিনিষের সঙ্গে কোন কারবার নাই, কোনটার দিকে কোন পক্ষপাতও নাই। যেই আসরে লোহা আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি তার সঙ্গে চুম্বকটির কারবার সুরু হইল, তার দিকে চুম্বকটির পক্ষপাত হইল। এতক্ষণ যেন চুম্বকের শক্তিগুলি অসাড় হইয়াও এলাইয়া পড়িয়াছিল। যেই লোহা আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি সে শক্তিগুলি নিজদিগকে

সংহত করিয়া ও সাজাইয়া লইল। এতক্ষণ যেন শক্তিপিণ্ড ছিল কিন্তু শক্তিব্যূহ ছিল না; এইবার সেটি হইল। এই রকম আমরা মনে করিয়া থাকি।

বলাবাহুল্য যে এ নিতান্ত মোটামুটি হিসাব। আমরা মোটার খবর রাখি, চিকণের রাখি না বলিয়াই এই রকম মনে করিয়া থাকি। লোহা কাছে থাক আর না থাক, চুম্বকের শক্তিগুলি কখনই একান্তভাবে এলাইয়া পড়িয়া থাকে না। আর পাঁচটা জিনিসের সঙ্গেও তার কারবার চলিতে থাকে এবং চলিতে বাধ্য আছে; তবে সে কারবার গোপন কারবার। লোহার সঙ্গে তার কারবারটা এতই স্পষ্ট ও বিচিত্র যে, সে ক্ষেত্রে আমাদের আর বেহুঁস হইয়া থাকিবার যো নাই। আসল কথা লোহার বেলা চুম্বকের শক্তিগুলি যে আকারের এবং যতখানি স্পষ্ট একটা ব্যূহ তারা রচনা করে, কাঠের বা কাগজের বেলা সে রকম বা ততখানি স্পষ্ট ব্যূহ তারা রচনা করে না। অন্ততঃ আমাদের হিসাবে সেই রকমই বোধ হয়। যে শক্তিগুলির নির্দিষ্ট কোন একদিকে প্রবণতা নাই, সে শক্তিগুলিকে বৈজ্ঞানিকেরা "Scalar" নাম দিয়া থাকেন; এবং যে সব শক্তি এক একটা দিকে অভিমুখীন (directed), সে সব শক্তিকে তাঁরা "Vector" এই নাম দিয়া থাকেন। এখন গণিত-বিদ্যার কল্পনায় কোন দিকে প্রবণতা নাই এমন শক্তিপিণ্ড থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু বাস্তব জগতে শক্তি মাত্রেই কোন না কোন দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। কোন একটা নির্দিষ্ট দিকে ঝোঁক অবশ্য চিরস্থায়ী নয়; চুম্বকের কাছে যতক্ষণ কাঠ ও কাগজ রহিয়াছে, ততক্ষণ চুম্বকের সে সব দিকে ঝোঁক একরকম, আবার লোহা আসিয়া উপস্থিত হইলে সে ঝোঁকটা অন্যরকম হইয়া দাঁড়ায়। শক্তির মোড় এ রকম নানা সময় নানাদিকে ফিরিতেছে; কিন্তু কোন না কোন দিকে মোড় না থাকিয়া যায় না! শক্তিগুলিকে কোন দিকে মোড় ফিরাইয়া রাখিতে হইলেই একটুখানি স্বাভাবিক প্রত্যাহার ও সংযমের প্রয়োজন হয়। চুম্বকের কাছে যতক্ষণ লোহা নাই কিন্তু আর পাঁচটা জিনিষ রহিয়াছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত চুম্বকের স্বাভাবিক প্রত্যাহার ও সংযম-শক্তি যেন গোপন হইয়া রহিয়াছে আমরা তার কোন পরিচয় পাইতেছি না। কিন্তু যেই লোহা আসিয়া উপস্থিত হইল, অমনি সে শক্তিটি সুস্পষ্টভাবে জাগিয়া উঠিল। এখন চুম্বক আর কাগজ ও কাঠ এ সকলে যেমন অপক্ষপাত করিয়াছিল, লোহার বেলায় তেমনটা অপক্ষপাত করিতে নারাজ, মনে হয় যেন তার সকল শক্তিগুলি গুটাইয়া আনিয়া সে লোহারই দিকে আগাইয়া দিতেছে। যদি লোহার গুঁড়া, কাঠের গুঁড়া ও কাগজের গুঁড়া একসঙ্গে মিশানো থাকে, তবে সে তাদের ভিতর হইতে লোহার গুঁড়াগুলিকে বাছিয়া টানিয়া লয়; কাঠের বা কাগজের গুঁড়া যেমন পড়িয়া ছিল তেমনই পড়িয়া থাকে। এখানে প্রত্যাহার ও সংযমের একটা স্পষ্ট চেহারা আমরা দেখিতেছি না কি?

আকাশে বেশ জমাট মেঘ হইয়াছে। বলাবাহুল্য সেই মেঘরাশি বিদ্যুৎগর্ভ।

আমাদের ধরিত্রী ত' বিদ্যুৎগর্ভা বটেই। মেঘের বিদ্যুৎ আর পৃথিবীর বিদ্যুৎ আলাদা জাতীয়—একটা ধনাত্মক, অপরটা ঋণাত্মক (পজেটিভ ও নেগেটিভ)। অতএব এটা ওটায় মিলিতে চায়। আমরা ভাবি বুঝি পৃথিবীর বিদ্যুৎ পৃথিবীময় একৃসা হইয়া ছড়াইয়া রহিয়াছে, আর মেঘের বিদ্যুৎ সারা মেঘে একৃসা হইয়া আছে। কিন্তু আসলে ব্যাপার কি তাই? পৃথিবীতে যেখানে যত সূক্ষ্মাগ্র পদার্থ আছে, তারা পৃথিবীর বিদ্যুৎ পিণ্ডটিকে এক একটা নির্দিষ্ট দিকে যেন সাজাইয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেক গাছের প্রত্যেক পাতাটি তার সূচ্যগ্রমুখে পৃথিবীর বিদ্যুৎ-ভাণ্ডার মহাব্যোমে এক একটা নির্দিষ্ট দিকে বিলাইয়া দিতেছে অথবা বাহির হইতে বিপরীত শক্তিকে এক একটা নির্দিষ্ট প্রণালীতে টানিয়া লইতেছে। আমাদের শিরা উপশিরাগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু-তন্তুগুলি যেমন, পৃথিবীর বিরাট দেহে গাছপালার ঐ সূচীমুখ পত্রগুলিও তেমনই। উহারা যেন পৃথিবীর বিপুল তাড়িত শক্তিকে নানাদিকে নানাভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে। মেঘের সঙ্গে অথবা অপর কোন বাহিরের বস্তুর সঙ্গে পৃথিবীর কারবার, অর্থাৎ শক্তির খেলা সাধারণতঃ ঐ সকল প্রণালীতে চলিয়া যাইতেছে। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পৃথিবীর তাড়িতশক্তি নির্বিশেষ পিণ্ড অবস্থায় পড়িয়া নাই; বৃক্ষলতাদি রূপ পৃথিবীর অগণিত রোমরাজি অথবা স্নায়ুজাল অবলম্বন করিয়া সেই বিপুল শক্তি নানাদিকে অভিমুখীন হইয়া রহিয়াছে। দূর হইতে মেঘকে বেশ একখানা গালিচার মতন দেখায়; কিন্তু আসলে মেঘ কত বন্ধুর, কত উচ্চনীচ। মেঘের গায়েও সূক্ষ্মাগ্র বিশিষ্ট কত না অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রহিয়াছে। আমাদের পৃথিবীর অঙ্গে গাছপালার পাতাগুলি যে কাজ করিতেছে, মেঘের গায়ে ঐ সকল সূক্ষ্মাগ্র অঙ্গগুলিও অবশ্য সেই কাজ করিতেছে অর্থাৎ তারাও মেঘনিষ্ঠ তাড়িতশক্তিকে একটা নির্বিশেষ পিণ্ডভাবে অপক্ষপাতে থাকিতে না দিয়া কোন নির্দিষ্ট দিকে বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রবণ করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর বেলাতে গাছপালার ঐ রকম বন্দোবস্তের ভিতর দিয়া তাড়িত শক্তির যে স্বাভাবিক প্রত্যাহার ও সংযমের ব্যবস্থা রহিয়াছে, মেঘের ভিতরেও তদনুরূপ একটা ব্যবস্থা রহিয়াছে। ব্যবস্থা রহিয়াছে বলিয়া মেঘে ও পৃথিবীতে তাড়িত শক্তির বিনিময় প্রায় একরকম নির্বিবাদেই চলিয়া যায়। ব্যবস্থায় যেখানে কুলায় না, সেইখানেই যে ঘটনাটি ঘটে, তাহাকে আমরা বলি বজ্রপাত। এই বজ্রের কথা আমরা বারান্তরে আলোচনা করিয়াছি। আপাততঃ কথাটা এই যে, জড়ের রাজ্যেও সর্বত্র একপ্রকার স্বাভাবিক প্রত্যাহার ও সংযম আমরা দেখিতে পাই।

সে প্রকারটি হইতেছে এই—জড়ের শক্তিগুলি কখনই নির্বিশেষে পিণ্ড অবস্থায় পড়িয়া থাকে না; আমরা খেয়াল করিতে পারি বা না পারি, কোন না কোন নির্দিষ্ট দিকে তাদের এক একটা ঝোঁক আছেই। কোন কোন ক্ষেত্রে সেই ঝোঁকটা এত প্রবল ও স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, আমরা সেটা লক্ষ্য না করিয়া পারি না; যেমন

চুম্বক ও লোহার বেলায়, যেমন মেঘ হইতে পৃথিবীতে বজ্রপাতের বেলায়। মেঘ ও পৃথিবী এই দুইটা পক্ষ না হইয়া, দুইখানা মেঘই দুইটা পক্ষ হইতে পারে। সেক্ষেত্রে এই দুইখানা মেঘের মধ্যে সৌদামিনী দূতীয়ালী করিতে থাকেন। নানা নির্দিষ্ট পথে (lines) এ বিশ্বের বস্তু নিয়া তাদের শক্তির আদান প্রদান অহরহঃ করিয়া যাইতেছে। মেঘে মেঘে, মেঘে পৃথিবীতে, পৃথিবীতে চন্দ্রে সূর্যে, জলে বাতাসে এইরকম সকলের ভিতরেই এই শক্তির কারবার দিনরাত চলিতেছে। এ কারবারের অধিকাংশই আমাদের মোটা হিসাবে গোপন। কারবার খুব খোলসা ও জাঁকাল রকমের হইলে, আমরা তবে তার হিসাব রাখিয়া থাকি। যেমন, একটা মেঘ হইতে আর একটা মেঘে যদি দেখিতে পাই যে বিজলীর তীব্র ছটা খেলিয়া গেল, অথবা আমাদের চোখ ঝল্‌সাইয়া এবং কানে তালা লাগাইয়া মেঘ হইতে বাজ আসিয়া পৃথিবীতে পড়িল, তবেই আমরা মনে করি যে, মেঘে মেঘে, এবং মেঘে পৃথিবীতে একটা কিছু কারবার হইয়া গেল। কিন্তু কারবারের বিরাম যে এক নিমেষের জন্যও হবার নয়। পৃথিবীর অঙ্কে প্রতি গুল্ম পাদপের প্রতি সূক্ষ্মাগ্র পত্র যে অহরহঃ মহাব্যোমে পৃথিবীর অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে তাড়িত শক্তির পসরা বহিয়া আনিয়া বেচিতেছে, বাহিরের বিশ্বের সঙ্গে কারবার চালাইতেছে, এ কথা শুনিলে আমাদের যেন উপন্যাসের মত ঠেকে।

জড়ের জগতেই হউক আর প্রাণের জগতেই হউক (মনের জগতের ত কথাই নাই) সর্বত্রই আমরা একটা বাছিয়া চলা দেখতে পাই। সকলে সকলের সঙ্গে মিশিতে চায় না, থাকিতে চায় না; 'ক' 'খ' কে চায়, 'গ' কে তাড়াইয়া দিতে চায়। জড়ের ভিতর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এ ত আছেই, তা ছাড়া তাদের এক একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যও আছে। প্রাণ ও মনের রাজ্যে এই দুইটা রাগ ও দ্বেষরূপে দেখা দিয়াছে। এখন বাছিয়া চলিতে হইলেই আর পাঁচটার সঙ্গ হইতে নিজেকে এড়াইয়া চলিতে হয়। 'ক' যদি বাছিয়া বাছিয়া 'খ'এর সঙ্গ করে, তবে তাকে অবশ্য 'গ' 'ঘ' ইত্যাদির সঙ্গ অল্প-বিস্তর এড়াইয়া চলিতে হইবে। এরই নাম প্রত্যাহার। এই রকম ধারা প্রত্যাহার সৃষ্টির নিখিল পদার্থকে করিতে হইতেছে, অহরহঃ করিতে হইতেছে। এ প্রত্যাহার না শিখিলে চুম্বকের সঙ্গে লোহা মিশিত না, হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেন গ্যাস মিলিয়া জল হইত না। মকরধ্বজে আদপে সোনা নাই, ইহা নাকি রসায়নবিদ্‌ দেখাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু বৈদ্য বলিবেন, সোনা থাকুক আর না থাকুক, সোনা কাছে না থাকিলে এবং সোনার শক্তিতে শক্তিমান্‌ না হইলে, পারদের বাপের সাধ্য নাই যে, সে সিদ্ধ মকরধ্বজ উৎপাদন করিতে পারে। রসায়ন শাস্ত্রের ভাষায় সুবর্ণের এই প্রভাবকে বলে Catalytic action। এক্ষেত্রে পারার দানাগুলি কেবল যে বাছিয়া বাছিয়া বাতাসের অক্সিজেনের দানাগুলির সহিত মিশিতেছে এমন নয়, সোনাকে সাক্ষী রাখিয়া তারা এইরকম মিশ খাইতেছে। সোনা ছাড়া আরও ত অনেক ধাতু আছে, কিন্তু তাদের সাক্ষ্য নামঞ্জুর; সোনা হাজির

থাকিলে তবে আমরা মিশিব, নইলে না—এই যেন হইল তাদের জিদ্। একটা অদ্ভুত গোছের বাছাই ও মেলামেশা ব্যাপার—ক খ এর সঙ্গেই মিশিবে, গ এর সঙ্গে নয় কিন্তু গ কে হাজির থাকা চাই। জড়ের রাজ্যে স্বাভাবিক সংযম ও প্রত্যাহারের এও এক মজার দৃষ্টান্ত। মজার বটে, কিন্তু অসাধারণ নয়; সচরাচর এইরূপ ঘটিতেছে।

জড়ের রাজ্যে প্রত্যাহার ও সংযমের আদৌ স্থান নাই বলিয়া আমাদের মনে হইতে পারে। এ ধারণা যে ঠিক নয়, তাই দেখাইবার জন্য আমরা জড়ের এলাকা কটাক্ষে একবার দেখিয়া লইলাম। আমরা দেখিলাম যে জড়বস্তুও বিশেষ বিশেষ স্থলে তার শক্তিগুলিকে অন্য দিক হইতে গুটাইয়া লইয়া বিশেষ কোন কোন দিকে অভিমুখীন করিয়া দিয়া থাকে। জড়ের রাজ্যে এও এক রকম বাছাই ব্যাপার, প্রাণ ও মনের রাজ্যে আসিয়া এ বাছাই ব্যাপারটাকে খুবই স্পষ্টাকারে আমরা দেখিতে পাই। প্রত্যেক প্রাণী এমন কি প্রত্যেক জীবকোষ বাছিয়া বাছিয়া তার মেলামেশা, ছাড়াছাড়ি ইত্যাদি ঠিক করিতেছে। প্রত্যেক বস্তুতেই যে রস ও লীলা আছে তা আমরা আগেই খোলসা করিয়া বলিয়াছি। প্রত্যেক বস্তুই আপনার রুচিমাফিক তার লীলার সহচর ঠিক করিয়া লইতেছে। এ বিশ্বের বিরাট কারবার একটা বাছাইএর কারবার। প্রাণ ও অন্তঃকরণের রাজ্যে এ কারবার দৃষ্টান্ত দিয়া খোলসা করিয়া বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই।

আমরা যে সকল ভাব ও ব্যাপার লইয়া সাধন করি, সে সকল ভাব ও ব্যাপার কিছু না কিছু আমাদের স্বাভাবিক বন্দোবস্তের ভিতরেই দেওয়া রহিয়াছে। স্বভাবে যার বীজ ও কাঠামোখানি আদৌ দেওয়া নাই, সে জিনিস লইয়া আমাদের সাধন ও অনুশীলন করা আমাদের সম্ভবপর হয় না। স্বভাবে যেটি হয়ত অল্পমাত্রায় আছে, সাধনে সেটিকে বেশী মাত্রায় ফুটাইয়া তুলিতে হয়। স্বভাবে যেটি আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, সাধনে সেটিকে আমরা ক্রমশঃ আয়ত্ত করিতে পারি। স্বভাবে যে ভাবটির ভিতর খাদ রহিয়াছে, সাধনে সে ভাবটিকে আমরা খাঁটি করিয়া লইতে পারি। কিন্তু স্বভাবে যেটা আদৌ নাই, সেটাকে লইয়া সাধন হয় না। যোগীরা প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। আমরা স্বভাবতঃ প্রতিনিয়ত অজপারূপে প্রাণায়াম করিতেছি বলিয়াই, আমাদের পক্ষে প্রাণায়ামের সাধন করা সম্ভবপর হয়। সাধারণ ব্যাপারে আমরা সর্বদাই মনটাকে একদিক হইতে ফিরাইয়া অন্য দিকে লইয়া যাইতে পারিতেছি বলিয়াই আমরা প্রত্যাহারের সাধন করিতে পারি। যে বস্তুতে আমরা রস পাই, তাতে কিছুক্ষণের জন্য লাগিয়া থাকিতে পারি বলিয়াই আমাদের পক্ষে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির সাধন করা সম্ভবপর হইয়াছে। মনের একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা আমাদের স্বভাবতই সময় সময় হইতেছে; অবশ্য বেশীক্ষণের জন্য নয় এবং সে অবস্থাগুলি আমাদের তেমন স্ববশেও নয়; আপনা

হইতেই একটু আধটু হইয়া যাইতেছে। হইতেছে বলিয়াই এ সকলের অনুশীলন ও সাধনের ফলে এ সকল ভাবের মাত্রা, গাঢ়তা ও নির্মলতা সকলই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; এবং এ ভাবগুলি আমাদের স্ববশে আসিয়া থাকে।

যে বস্তুতে আমাদের আগ্রহ আছে, সে বস্তুটি যখন আমরা ভাবি, তখন আমরাও তন্ময় হইয়া গিয়া থাকি; হট্টগোলের মধ্যে থাকিয়াও আমরা গোল শুনিতে পাই না; নানা বিক্ষেপের কারণের ভিতরে রহিয়াও কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া থাকি। এ অবস্থা কি ধারণা, ধ্যান বা সমাধির অবস্থা নয়? এমন কি সে সচ্চিদানন্দ-ঘন অখণ্ড অনুভব-সত্তা আমাদের ভিতরে স্বভাবতঃ সর্বদাই রহিয়াছে বলিয়াই সমাধিতে অথবা শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন প্রভৃতি উপায়ে সেটির অপরোক্ষানুভূতি আমাদের হইতে পারে। স্বভাবতঃ এটি না থাকিলে, কোন উপায়েই এটিকে পাওয়া যাইত না। অতএব তপঃশক্তির বিশ্বব্যাপী রূপটি দেখিয়া বিস্মিত হইলে আমাদের চলিবে না। তপস্বীর মধ্যে তপঃশক্তির অসাধারণ বিকাশ দেখিতে পাই বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে সে শক্তি কেবলমাত্র তপস্বীতে নয়, সকল ভূতে এবং সকলপ্রাণীতে স্বভাবতই রহিয়াছে এবং কিছু না কিছু নিজের পরিচয় দিতেছে। তার কতকটা আভাষ আমরা আগেই পাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

ত্রিভুবনে সর্বত্র তপঃশক্তি ওতপ্রোত থাকার কারণটি স্পষ্ট। বীজে যে শক্তি থাকে, বিকাশে সে শক্তি কোন না কোন আকারে না থাকিয়া যায় না। প্রজাপতির তপঃশক্তি এ সমস্ত সৃষ্টিটার মূলে। প্রজাপতি তাঁর তপঃশক্তি লইয়া এই সৃষ্টির সর্বাবয়বে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। এইজন্য সৃষ্টিতে এমন কোনো কিছু নাই যার ভিতরে তপঃশক্তি কিছু না কিছু বিরাজ না করিতেছে। সেই রস ও লীলার বেলা আমরা যে কথা বলিয়াছিলাম, তপের বেলাও সেই কথা বলিতেছি। সৃষ্টির এলাকা আমাদের জ্ঞানে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—জড়, প্রাণ, মন। আমরা এ তিনটিকে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে তপঃশক্তি একটা সামান্য আকারে এ তিনের ভিতরে কাজ করিতেছে। সেই সামান্য বা সাধারণ আকারে তপঃশক্তিকে চিনিয়া ধরিয়া ফেলা দরকার। কেননা সেভাবে ধরিয়া ফেলিতে না পারিলে আমরা গোড়াকার তপঃশক্তিটি চিনিতে ও ধরিতে পারিব না। তপঃশক্তির একটা আসল রূপ আছে, আবার কতকগুলি ছদ্মবেশও আছে। অমুক মানুষ তপস্যা করিতেছে বলিলে আমরা সচরাচর এই ভাবিয়া থাকি যে সে ব্যক্তি ঊর্ধ্ববাহু হইয়া রহিয়াছে, অথবা পঞ্চাগ্নি তপ করিতেছে অথবা বৎসরের পর বৎসর ঘাসপাতা খাইয়া আছে। এই রকম একটা কিছু কৃচ্ছ্রসাধন আমরা মনে করিয়া থাকি বলিয়া তপস্যা কথাটার সঙ্গে কঠোর ও কৃচ্ছ্র এ কথা দুইটা যেন অবিনাভাব সম্বন্ধে জড়াইয়া রহিয়াছে। প্রজাপতি গোড়ায় তপস্যা করিয়াছিলেন, একথা শুনিলে আমাদের এই ধরণের কোন এক রকম তপস্যার কথা মনে উদয় হয়—যেন প্রজাপতি কিছুকাল না

খাইয়া ছিলেন, এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়া নিজেকে উইঢিপিতে পরিণত করিয়াছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। বলাবাহুল্য, এ সকল তপস্থার আসল রূপটি নহে।

তপস্থার আসলরূপে কাহারও ভয় পাইবার কথা নহে। আমরা সে আসল রূপটি এই কারবারের সুদীর্ঘ ব্যাখ্যানের ভিতর দিয়া ধরিতে কতকটা চেষ্টা করিয়াছি। কোন একটা গণ্ডী বা বাধা অথবা চাপ আমাদের সত্তা-শক্তিটিকে বাঁধিয়া চাপিয়া সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিতেছে। শুধু আমাদের বলিয়া কেন, জড়, প্রাণ ও মনের রাজ্যে সর্বত্রই ঐ রকম বাধা, সর্বত্রই ঐ রকম চাপ। বাধা অথবা চাপ নানা আকারে উপস্থিত হইয়া থাকে। তাদের কতক কতক আমরা আগেই ধরিয়া ফেলিয়াছি। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, স্থষ্টির সর্বত্র, বিশেষতঃ প্রাণ ও আত্মার রাজ্যে, সেই বাধা ও চাপকে ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়ার একটা স্বাভাবিক প্রেরণাও সদাই সজাগ হইয়া কাজ করিতেছে। বাধা অথবা চাপ ঠেলিয়া সরাইতে পারিলেই বস্তুর বিকাশ, স্ফূর্ত্তি এবং আনন্দ। বস্তুর বস্তুত্বই সৎ চিৎ এবং আনন্দে তৈয়ারি। বাধা অথবা চাপ এই সৎ-চিৎ-আনন্দকে কুণ্ঠিত, ক্ষুণ্ণ ও সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। সুতরাং বাধা বা চাপ সরিয়া যাওয়া মানেই সৎ-চিৎ-আনন্দের পরিপূর্ণ স্ফূর্তি। যে স্বাভাবিক প্রেরণার কথা আমরা আগে বলিয়াছি, সেটি এই পরিপূর্ণ স্ফূর্তির দিকে আমাদের সত্তা-শক্তিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এবং ইহাও আমরা দেখাইয়াছি যে, সেই স্বাভাবিক প্রেরণাই তপঃশক্তি। সুতরাং তপঃশক্তির সঙ্গে কঠোর ও কৃচ্ছ্রসাধনা নিয়ত জড়াইয়া ফেলা আমাদের উচিৎ হয় না। কৃচ্ছ্রসাধনা তপস্থার একটা সবিশেষ রূপ মাত্র; আসল রূপটি নয়। আসল রূপটি না চিনিতে পারিলে আমরা প্রজাপতির তপস্থাপূর্বক স্থষ্টি ব্যাপারটি আদৌ বুঝিতে পারিব না এবং ইহাও বুঝিতে পারিব না যে, কেমন করিয়া স্থষ্টির আদিতে সেই তপস্থা স্থষ্টির সর্বত্র এখনও বাহাল হইয়া রহিয়াছে।

আমরা তপস্থার আসল চেহারাটি আরও দুই একরকমে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং ইহাও দেখাইয়াছি যে, একটুখানি রকমারি হইলেও মূলে সে চেহারা অভিন্ন। বস্তুর স্থিতিস্থাপকতা এবং স্বাভাবিক প্রত্যাহার ও সংযম আলোচনা করিয়া আমরা গোড়ায় হাত দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, বস্তুর শক্তিপুঞ্জ একটা পিণ্ডের আকারে থাকিলে স্থিতিস্থাপকতাও হয় না, বিকাশও হয় না। শক্তিপুঞ্জ নিজেকে শক্তিব্যূহরূপে সাজাইয়া লইতে পারিলে, তবে সে কাজটি হয়। শক্তিগুলির কোনও বিশেষ দিকে অথবা কেন্দ্রে অভিমুখীনতা অথবা প্রবণতা থাকা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি যে স্থষ্টির সর্বত্রই সেরূপ ব্যবস্থা স্বভাবতঃই অল্পবিস্তর রহিয়াছে। প্রত্যেক বস্তুই বাছিয়া বাছিয়া চলে, বাছিয়া বাছিয়া সঙ্গ করে; একের কাছ হইতে নিজেকে ফিরাইয়া লয়, অপরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহাই হইল স্বাভাবিক প্রত্যাহার ও

সংযম। এ ব্যবস্থাটি না থাকিলে বস্তুর বস্তুত্ব রক্ষা পায় না, বস্তুর কোনরূপ অভ্যুদয় অথবা বিকাশও সম্ভবে না।

শেষকালে আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, স্বভাবে সর্বত্র যে ব্যবস্থা নিহিত, সে ব্যবস্থার সবিশেষ অনুশীলন ও সাধন কোন কোন কেন্দ্রে (বিশেষতঃ মানবে) হইতেছে, অথবা হইতে পারে। হয়ত সর্বত্রই একটু-আধটু অনুশীলন চলিতেছে, আমরা তার বড় একটা খোঁজ রাখি না। একটা ধূলিরেণু যে আবার তপস্বী, সে যে আবার তার তপঃশক্তির অনুশীলন ও স্ফুরণ করিতেছে, এ কথা শুনিলে আমরা বিস্ময়ে বদন ব্যাদান করিয়া থাকি। যেমন সেই আনন্দ ও লীলার বেলায় করিয়াছিলাম তেমনি। কিন্তু সে যাহাই হউক, কোন কোন কেন্দ্রে তপঃশক্তির স্বাভাবিক পুঁজিটি সাধনার দ্বারা বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা যে চলিতেছে, সে পক্ষে কোনরূপ সন্দেহ করা চলে না। যেখানে সেরূপ একটা চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই, সেখানেই আমরা বলি, তপস্যা ও যোগ চলিতেছে। যেখানে স্বাভাবিক পুঁজিটি ছাড়া আর বড় একটা কিছু দেখিতে না পাই, সেখানে ভাবি তপস্যা ও যোগের সম্ভাবনা ও সূচনা যেন এখনও হয় নাই। বলাবাহুল্য, এটা আমাদের কারবারি হিসাব। তপস্যা ও যোগ স্বভাবতঃ না চলিতেছে এমন পাত্র নাই। তপঃশক্তির আদি বিগ্রহ প্রজাপতি নিখিল সৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া, সবই তপঃশক্তির বিগ্রহ; যেমন আনন্দ ও লীলার বিগ্রহ। তবে এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, তপঃশক্তির বিরোধী একটা শক্তি (সেই গণ্ডী বাধা বা চাপ যেটাকে কখনও বৃত্র বা অহি বলিয়া, কখনও বা মধু-কৈটভ বলিয়া প্রাচীনেরা কহিয়া গিয়াছেন) সকল বস্তুতে তপঃশক্তির সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। শুধু যে এখন রহিয়াছে এমন নয়, গোড়া হইতেই রহিয়াছে। প্রজাপতি মহাশয়কেও সৃষ্টির সূচনায় তপস্যা করিতে হইয়াছিল এই কারণে যে তখন তপঃশক্তির বিরোধী শক্তিতেই নিখিল বিশ্ব আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়াছিল। এই মূল রহস্যটি বুঝাইবার জন্যই পুরাণ প্রভৃতিতে সৃষ্টি প্রসঙ্গে আমরা মধু-কৈটভ আদির গল্প দেখিতে পাই। কেবল আমাদের দেশের পুরাণে বলিয়া নয়, মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া—এ সকল দেশের পুরাণেই সৃষ্টির প্রারম্ভে তপঃশক্তির বিরোধী শক্তির সংগ্রামের একটা বর্ণনা আমরা দেখিতে পাই। প্রায় সকল পুরাণকথাতেই তপঃশক্তি জ্যোতিঃস্বরূপে এবং তার বিরোধী শক্তিটি তমঃস্বরূপে কল্পিত হইয়াছে দেখিতে পাই। সে তামসিক শক্তি আবার অনেক স্থলে একটা বিরাট দানবাকারে দেখা দিয়াছে। কোথাও তার নাম হইয়াছে বৃত্র, কোথাও নাম হইয়াছে টাইটান্, আবার কোথাও বা নাম হইয়াছে টিয়ামাট্। এই আদি দৈত্যটিকে পরাস্ত করিয়া সেই আদি দেবতা সৃষ্টিরূপ তাঁর আদি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাকে সৃষ্টির সূচনায় কেন যে মধু-কৈটভের প্রাদুর্ভাবে বিব্রত হইতে হইয়াছিল, তার কৈফিয়ৎ এখানেই দেওয়া রহিয়াছে। কি যেন

কি একটা অজানা শক্তি এ বিশ্বের সত্তাটিকে চাপিয়া সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রজাপতিকে তপঃশক্তির দ্বারা সেই চাপ সরাইয়া দিতে হইয়াছিল। তিনি সেটি সরাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বের বিকাশ হইতে পারিয়াছে, নইলে হইতে পারিত না।

আমরা "অহল্যার তপস্যা," "বিশ্বদোল" এবং "মধু ও কৈটভ"—এই তিন দফায় তপস্যার কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

সমস্যা না সমাধান?

অনেক দিকেই দেশের হাওয়া ফেরার লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। এটা ভয়ের কথা কি ভরসার কথা, তা হঠাৎ বলিতে যাওয়া দুঃসাহসের কথা। যে মাঝির নৌকার পাল এলাইয়া পড়িয়া আছে, হাওয়া উঠিলে বা ফিরিলে তাকে ভাবিয়া দেখিতে হয়—হাওয়া অনুকূল না প্রতিকূল; হাওয়া আবার পড়িয়া যাইবে, কি কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠিবে। জীবনের যে মহাসমুদ্রে আমাদের দেশের ভাগ্য-তরীখানি আজ ভাসিয়া চলিতেছে, সে মহাসমুদ্র শুধু ভারতেরই নয়, বিশ্ব-মানবেরই সম্মিলিত জীবনধারায় পুষ্টিলাভ করিয়াছে। শুধু বর্তমানই নয়, স্মরণাতীত অতীত যুগের শত সহস্র ব্যক্ত ও গুপ্ত প্রেরণা এই মহাসম্মিলনের পশ্চাতে রহিয়াছে। এটা যে কেবল মহাসম্মিলন এমন নয়, মহা সঙ্ঘর্ষও বটে। ইহার মধ্যে গা ভাসাইয়া দিলেই যে কোন ব্যক্তি বা জাতির চরিতার্থতা, এমন বলা যায় না। ইহার মধ্যে অনেক প্রতিকূল ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে লড়াই করিয়া আত্মরক্ষা করারও প্রয়োজন বড় কম নয়। এই মহাসাগরের কূল কেহ কোনদিন খুঁজিয়া পায় নাই। ইহা সুস্থির হইয়া পড়িয়াও নাই। গতিই ইহার প্রাণ, নিরন্তর চলাতেই ইহার অস্তিত্ব! কিন্তু ইতিহাস ইহা সাক্ষ্য দিতে পারে নাই যে, এই মহাসমুদ্রের গতি ঠিক একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকেই হইয়া আসিতেছে। অথবা, যদি কোন একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যই থাকে, তবে সেটা এ পর্যন্ত আমাদের অজানা রহিয়া গিয়াছে। সে লক্ষ্য যে মানবীয় সত্তার উন্নতি বা অভ্যুদয়, এমন কথা বলার সাহস ইতিহাস সঞ্চয় করিতে পারে নাই। মানুষের কল্পনা অথবা বিশ্বাসের কোনও বালাই নাই। যুক্তি বা প্রমাণ যে ক্ষেত্রে পরাস্ত অথবা ত্রস্ত, মানুষের কল্পনা অথবা বিশ্বাস সে ক্ষেত্রে নিঃসঙ্কোচ। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষ কল্পনা করিয়াছে, এমন কি বিশ্বাসও করিয়াছে যে, এই সৃষ্টির গতি সত্য-সত্যই একটা ঊর্দ্ধ্বগতি; বিশ্ব-জীবনের অগ্রগতি সত্য-সত্যই প্রগতি। দার্শনিকের চিন্তায় এবং বৈজ্ঞানিকের কল্পনায় এইরকম ধারা ক্রমিক ঊর্দ্ধ্বগতি বা প্রগতি অনেক সময় সমাদৃত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। বিগত শতকে এমনও অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে এই বিশ্বাস এবং কল্পনার ভিত্তিটা সত্য-সত্যই পাকা। এখনও অনেকে সম্ভবতঃ তাই মনে করেন। কিন্তু এটা আর অস্বীকার করা চলে না যে, ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল ও রহস্যগর্ভ হইয়া দেখা দিতেছে। বিশ্ব-ঘটনার বর্ত্ম আজ আর বোধহয় সোজাসুজি একটা কাটা-ছাঁটা নক্সা করিয়া দেখাইয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে না। সরল-রেখা-ক্রমে কেবলই ঊর্দ্ধ্বগতি হইতেছে, এ কথা কে আজ জোর করিয়া বলিবে? এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে, শেষ পর্যন্ত

একটা চরম লক্ষ্যের দিকেই নিখিল বিশ্ব-ঘটনার গতির মুখ রহিয়াছে। হয়ত সে চরম লক্ষ্য। আমাদের অজানা রহিলেও আমাদিগকে তারই অভিমুখে টানিয়া লইতেছে। আমাদের এই সৌরজগৎ স্থির হইয়া নেই একথা ঠিক; কোনও একটা কেন্দ্রের চারিধারে ঘুরিতেছে এ কথাও ঠিক। কিন্তু সে কেন্দ্রটি এখনও আমাদের পরিচয়ের বাহিরে। কিন্তু সে আমাদের পরিচয়ের বাহিরে হইলেও, আমরা ত' তার প্রভাবের বাহিরে নই। এইরকম মনে হয় যে, আমাদেরও সম্মিলিত জীবনের অথবা জীবন-সমষ্টির কোনও একটা চরম লক্ষ্যের দিকে প্রবণতা হয় ত আছে; এবং এটাও হয়ত ঠিক যে, আমরা সাধ করিয়া চলি আর নাই চলি, আমাদের চলাটা শেষ পর্যন্ত কোনও এক চরম লক্ষ্যের অভিমুখেই হইতেছে। কিন্তু সিদ্ধাশ্রম অথবা সত্যলোকের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের এই নরলোকের হিসাব লইয়া দেখিতে পাই যে, এখানে ঐ চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে মানুষের ধারণা অথবা কল্পনা প্রায় বিসংবাদিনীই হইয়াছে; সংবাদিনী হয় নাই। এই চরম লক্ষ্যের চারিধারে মানুষের যুগায়ত দার্শনিক চিন্তা এক ভয়াবহ গোলকধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছে। সে গোলকধাঁধার ভিতরে আমরা পথের হদিস পাইবার কোনই সূত্র খুঁজিয়া পাই নাই। উপনিষদের ঋষিরা প্রার্থনা করিয়াছিলেন—আমাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিঃতে লইয়া চল। কিন্তু আমরা যে গোলকধাঁধার কথা বলিতেছি, তার মধ্যে যতই পা বাড়াই, ততই দেখি, আঁধার আরও ঘন হইয়া সব ঘিরিয়া আসিতেছে।

সৃষ্টির চরম গন্তব্য অথবা জীবনের পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে এই গোলকধাঁধার ভিতরকার গণ্ডগোল কোনও দিন থামে নাই, সহসা থামিবে বলিয়াও মনে হয় না। জীবের পরম পুরুষার্থ কি এবং কি উপায়ে সেটাকে পাইতে হইবে, সে সম্বন্ধে বিবাদ ও গোলযোগের অন্ত নাই। আঁধারে অসমান ও কুটিল পথে ছুটোপুটি করিয়া চলিতে যাইলে যেরূপ হওয়া স্বাভাবিক, সেইরূপই হইয়াছে। যেখানে কেহই দেখে নাই সেখানে কে কাহার পথ দেখাইবে? দেখিতে পাইলে, সত্যকার একটা পথ দেখিতে পাওয়া যাইত; এবং তাহা হইলে, সে পথে চলায়, কোন মারাত্মক গোল বাধিত না। সকলেই দেখিয়া শুনিয়া পা বাড়াইতে পারিত। কিন্তু সকলেই যেখানে অন্ধ এবং সকলেরই কল্পনা জল্পনা যেখানে নিরঙ্কুশ, প্রত্যেকেরই অভিমান যেখানে শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞাত, সেখানে দেখিয়া শুনিয়া পথ চলা কাহারও হয় না। কেবল বাজে গণ্ডগোলই হইয়া থাকে। লক্ষ্যের সন্ধান এবং লক্ষ্যের অভিমুখে সত্যকার পথের সন্ধান যিনি দিতে পারিয়াছেন, তিনি এই চিরন্তন গোলকধাঁধার ভিতরে হয় ত আদৌ ঢুকিতে চান নাই, অথবা ঢুকিয়া থাকিলেও কোন গতিকে বাহির হইবার একটা ফন্দি করিতে পারিয়াছেন। এ সব সন্ধানী লোকের কথা সত্য হইলে হইতে পারে। কিন্তু আমরা যারা গোলকধাঁধার পাকে ঘুরিয়া মরিতেছি তাদের পক্ষে সে সব লোকের নাগাল পাওয়া ত

সহজ নয়। নিজেদের চেঁচামেচিতে এত ব্যস্ত যে, খবরদারের খবরাখবর আমরা আদৌ শুনিতে পাই না, নয়ত শুনিতে পাইলেও, বিশ্বাস করিতে পারি না। যেটা যুক্তি বা তর্কের দ্বারা বুঝিবার ও বোঝাবার নয়, সেটাকে তাই দিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার বায়না করিয়া বসি। এ যেন কাউকে বলা—"ওগো, তুমি আমায় আমার নিজের কাঁধে উঠিয়ে দাও।" সাক্ষাৎকার বা উপলব্ধির সামগ্রী যুক্তিতর্কের হাটে-বাজারে সওদা করিলে তার ন্যায্য দর পাওয়া যায় না। এই সব কারণে মনে হয়, আমরা চিন্তাশীল লোকদের মুখ হইতে সৃষ্টিরহস্য অথবা জীবনরহস্য সম্বন্ধে যে সকল চিন্তার উদগার উঠিতে দেখিতে পাই, তাতে সন্দেহ হইতে পারে যে, তাদের নিজেদেরই বুদ্ধিজঠরেও সকল চিন্তা হয় ত' জীর্ণ হইতে পারে নাই। মৌলিক তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে দার্শনিকদের অধিকাংশ চিন্তাই হয় ত এইরকম ধারা অজীর্ণের উদগার মাত্র। আমরা দর্শন-বিদ্যার অপযশ করিতেছি না। সে বিদ্যার যে একটা স্বাভাবিক গণ্ডী আছে, একটা স্বভাবসিদ্ধ কার্পণ্য আছে, সেটারই ইঙ্গিত করা আমাদের উদ্দেশ্য। মননের কাজ উপলব্ধি নয়, আর উপলব্ধিরও কাজ মনন নয়। 'যার কাজ তারেই সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে।' যার কাজ মনন, সে যদি বলে, আমি দেখাইয়া দিব, তবে তার অযথা গরব-করা হইল। যে দেখায় সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, সে দেখানর মালেক মনন-ব্যবসায়ী নয়। তার কাজ আলাদা, এবং সে কাজেরও প্রয়োজন আছে। যাই হ'ক, এ মহা সমুদ্রের মাঝখানে তরী ভাসাইয়া যখন কুল-কিনারা কিছুই দেখিতেছি না তখন দার্শনিককে ডাকিয়া আনিয়া আমার তরীর কর্ণধার করিয়া বসাইয়া দিতে কৈ তেমন ভরসা ত পাইতেছি না। দার্শনিকের পক্ক কেশ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ত' স্বচ্ছ নয়; হৃদয় ত' অকুতোভয় নয়, বাহু ত' ধীর ও অকম্পিত নয়! এ অকূলে পাড়ি দিতে যে রকম ধারা সাচ্চা ও শক্ত মাঝির প্রয়োজন, সে রকম ধারা সাচ্চা ও শক্ত মাঝির সার্টিফিকেট দার্শনিকের নাই।

দার্শনিককে ছাড়িয়া বিজ্ঞানাগারের দুয়ারে গিয়া ধরণা দিব কি? বিজ্ঞান শুধু যে বকিয়া মরে এমন নয়, সে আবার চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে চায়। সাদা চোখে দেখাইতে না পারিলেও, যন্ত্র দিয়া দেখাইয়া দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের কেরামতি আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু বিজ্ঞানের বিজলি বাতির রোশনাইয়ে আমাদের সত্য দৃষ্টিটিকে ঝলসাইতে দিলেও ত চলিবে না। বিজ্ঞান-বিদ্যা যে অপরা-বিদ্যা। এ বিদ্যা ত' সেই উপনিষৎ-প্রসিদ্ধ শ্বেতকেতুর বিজ্ঞান-বিদ্যা নয়—যে বিজ্ঞানে নিখিল বিজ্ঞাত হইয়া যায়। এ বিদ্যা যে অসীম অজানার অমানিশার মাঝখানে একটুখানি জোনাকির ছটার মত চঞ্চল ও চকিত হইয়া ফুটিতেছে আর নিভিতেছে। যেটুকু দেখিতেছি বা বুঝিতেছি তার চারিভিতে অজানার আঁধার আরও নিবিড়, আরও বিরাট হইয়া দেখা দিতেছে। এক বিন্দু বোঝার সঙ্গে একটা না-বোঝার সাগর

পাইতেছি। বিজ্ঞানের অণু যতদিন এটম ছিল, ততদিন পর্যন্ত আমাদের বোঝাপড়ার মামলা অনেকটা সহজ ছিল। কিন্তু আজ অণুর ভিতরে দস্তুরমত একটা জগৎ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে আমাদের দেখার ও বোঝার দৌড় যতটা না বাড়িয়াছে, তার চাইতে ঢের বাড়িয়াছে বিস্ময়ের ও সংশয়ের দৌড়। যেখানে একটা সমস্যার সমাধান হইল ভাবিলাম, সেখানে দেখি তার ভিতর হইতে শত শত অতর্কিত সমস্যা আবার নূতন করিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বটগাছ বুঝিব মনে করিয়া বটের ফল হাতে লইলাম। ভাঙ্গিয়া দেখি, সে ফলের ভিতরে শত শত ছোট দানা। এদেরই এক একটা কি বটের প্রসূতি ? তাই বা কেমন করিয়া বলি ? সেই ছোট একটা দানা ভাঙ্গিলে তার মধ্যে আরও ছোট ছোট দানা দেখিতে পাওয়া সম্ভব। সাদা চোখে দেখিতে না পাইলেও হয়ত যন্ত্র সাহায্যে দেখিতে পাওয়া সম্ভব। তাহা হইলে, বটের আসল বীজ কোনটা ? কোন্ চরম বিন্দু বা কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া বটের প্রকৃতি তার নিজস্ব শক্তি-ব্যূহটি রচনা করিয়া রাখিয়াছে ? এই বটের বীজের উপমা আমরা দিতেছি না, ছান্দোগ্য প্রভৃতি শ্রুতিই দিয়া গিয়াছেন। আসল কথা এই যে, আমাদের অন্বেষণের পথে কেহ কোন দিনই আগা ও মুড়া খুঁজিয়া পায় নাই। অথবা ব্যাপারটা যেন আরও রহস্যময়। একটা সাপ যেন কুণ্ডলী পাকাইয়া নিজের ল্যাজ নিজেই গিলিয়া ফেলিতেছে। যেইখানেই আরম্ভ করি, আবার সেখানেই ফিরিয়া আসিতে হয়। বিজ্ঞানের যে-কোনও অন্বেষণের বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি এ কথা খাটিবে। এককে বহু দিয়া বুঝিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত একেই ফিরিতে হয় ; আবার বহুকে এক দিয়া বুঝিতে গিয়াও শেষ পর্য্যন্ত বহুতেই ফিরিতে হয়। রক্তবীজের এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়িলে শত সহস্র রক্তবীজের উদ্ভব হইয়া থাকে শুনিয়াছি। বিশ্ব ঘটনাপুঞ্জের যে কোনও সমস্যা, যে কোনও প্রশ্ন ঐ রক্তবীজেরই গোষ্ঠী। সমাধানের খড়্গে তাকে কাটিয়া ফেলিলে শত সহস্র সমস্যা নূতন করিয়া গজাইয়া উঠে দেখিতে পাই। রক্তবীজ নিপাতের পূর্বে দেবতারা সভয়ে দেখিয়াছিলেন যে, নিখিল জগৎ রক্তবীজের গোষ্ঠী দ্বারাই আপূরিত হইয়া গিয়াছে। আমরাও এই বৈজ্ঞানিক যুগে সভয়ে ও সবিস্ময়ে দেখিতেছি যে, শত শত নূতন সমস্যায় আমাদের ভাবনা চিন্তার জগৎটা উত্তরোত্তর ছাইয়া যাইতেছে। একখণ্ড মেঘ সরিয়া যায় ত' দশখানা মেঘ আসিয়া জমাট বাধে। একটা বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানের ভিতর হইতে শত শত সমস্যা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। যেন তারা ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল। একটা ক্ষুদ্র ধূলিরেণু আজ আর আমাদের পরিচয়ে ক্ষুদ্র নয়। তার সমস্যাও অসীম, তার সমাধানও অফুরন্ত। কেন না, সে ভূমারই কারবারি স্বল্প মূর্তি। শ্রুতি বলিবেন ব্রহ্মেরই "দহরবেশ্ম" বা গুহা। পুরাণ বলিবেন—সর্বব্যাপী বিষ্ণুরই "বামন রূপ"। এই গেল বিজ্ঞান বিস্তার এক দিকের কার্পণ্য।

তারপর, যেটুকুখানি আমরা বিজ্ঞানের প্রসাদে দেখিতেছি, সেটুকুখানিই কি

পাকা দেখা? আগে অনেকেই মনে করিতেন বটে, কিন্তু এখন অনেকে সন্দেহ করিতেছেন যে, আসলে সে দেখা পাকা দেখাই নয়, কাঁচা দেখা। বিজ্ঞানের রচনা সম্ভবতঃ ময় দানবের রচনা। যা কিছু খাঁটি সত্য বলিয়া কাটিতেছে, সে সমস্তই খাঁটি সত্য না হইতে পারে। গিল্‌টির জলুসও বড় কম হইতেছে না। কোনও কোনটা হয় ত ভেল্কি ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজ্ঞানের অণু পরমাণু, দেশ কাল, ঈথার, তাড়িত-শক্তি প্রভৃতি যে কতটা খাঁটি সত্য, সে পক্ষে অনেকেই আজকাল জেরা তুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্ততঃ পক্ষে এ-সবের সত্যতা যে স্বয়ংসিদ্ধ নয়, সে বিষয় আর সন্দেহের অবকাশ নাই। স্বয়ংসিদ্ধ হইলে সংশয় উঠিত না, জেরা চলিত না। বৈজ্ঞানিক-জগতের বাস্তবতা প্রতিপন্ন করিতে কোন কোন কুশাগ্রধী মনীষীকে বিস্তর পরিশ্রম করিতেও হইতেছে দেখিতে পাইতেছি।

তারপর, আবার এও লক্ষ্য করিতেছি যে, বিজ্ঞান যে ঘটনাগুলিকে পরীক্ষিত এবং যে সিদ্ধান্তগুলিকে অসন্দিগ্ধ মনে করিয়া আসিতেছিল, সে সব ঘটনা এবং সে সমস্ত সিদ্ধান্ত আজকাল যেন কিসের একটা দ্রাবকে শিথিল হইয়া গলিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানের কোন "ফ্যাক্‌ট"ই আজ কাল আর কায়েমি সত্য নয়; পূর্ণ বা গোটা সত্য সে ত' কোন দিনই ছিল না। ভাঙ্গা চোরা ও জখমি সত্য কি না, সে বিষয়েও অনেকে জেরা তুলিতেছেন। পুরাণের মধু ও কৈটভ যদি আবরণ ও বিক্ষেপ হয়, তবে আমরা বলিতে পারি যে, বিজ্ঞানের "ফ্যাক্ট্" মাত্রেই মধু-কৈটভের কোটে বাঁধা পড়িয়া রহিয়াছে। অতএব তারা মায়িক সত্য। একেবারে আকাশকুসুম মনে না করিলেও চলে। বিজ্ঞানের "প্রিন্সিপল্"গুলি সম্বন্ধেও এই কথা। জগতের কার্য-কারণের শৃঙ্খলটিকে যতটা পাকা পোক্ত মনে করা হইত, এখন দেখা যাইতেছে, সেটি ততদূর পাকা পোক্ত নাও হইতে পারে। তার মধ্যে মধ্যে ফাঁক থাকাও বিচিত্র নয়। সম্ভবতঃ আছেও। নিউটন বিদ্যা-বারিধির কূলে দাঁড়াইয়া কয়েকটি উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি বলিয়া অনবদ্য বিনয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দুই এক শতাব্দী পরে পরে দেখি, বৈজ্ঞানিক এক বিশ্ব-বেড়া জাল হাতে করিয়া সেই অকূলের কূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার সেই জালের গায়ে লেবেল আঁটা রহিয়াছে—নিয়ম ও শৃঙ্খলা। প্রাচীনেরা সতর্ক হইয়া বলিতেন ঋত। তাঁর আশা, তিনি এই জাল বিশ্ব জুড়িয়া ফেলিলে, তিমি--তিমিঙ্গিল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র শফরী পর্যন্ত কেহই বাদ পড়িবে না। বিশ্বে এমন কিছু বিপুল রহিবে না, যেটি এই বিশ্ব-বেড়ার জালে সমগ্রভাবে ধরা না পড়িবে; অথবা এমন কিছু ক্ষুদ্র রহিবে না, যেটি এই জালের ছিদ্র দিয়া গলিয়া বাহির হইয়া যাইবে। বিরাট্‌কেও ইনি নাগপাশে বাঁধিবেন, আবার বামনকেও বাঁধিবেন। ঐ সুবিপুল নক্ষত্র জগৎ—যার তুলনায় আমাদের এই ধরিত্রী একটা ধূলি-রেণুর চাইতেও নগণ্য,—তাকে তিনি তাঁর হিসাবের খাতায় স্বচ্ছন্দে বন্দী

করিয়া ফেলিবেন। আর ঐ অণুর অন্দর-আসরে যে সব তৈজস বালখিল্য বাউল নাচিয়া বেড়াইতেছে, তাঁদিগকেও তিনি আপনার ছন্দের শাসনে বাঁধিয়া নাচাইবেন। এই ছিল তাঁর আশা, এই ছিল তাঁর সাধ। তাঁর জালটি যে বিশাল ও বিচিত্র, তা আমরা সকলেই সবিস্ময়ে দেখিতেছি। কোটি পরার্ধ যোজন দূরে সরিয়া রহিয়াও জ্যোতিষ্ক অথবা নীহারিকাপুঞ্জ কতক কতক এই জালে ধরা পড়িয়া যাইতেছে দেখিতেছি। তাদের আকৃতি-প্রকৃতি, গতি-বিধি, উপাদান-উপকরণের অনেক সমাচারই আমরা পাইতেছি, সন্দেহ নাই। অন্যদিকে আবার, সে জালের বুনানী এত মিহি যে, অতি সূক্ষ্ম সামগ্রীও তাহাতে ছাঁকিয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও এটা বৈজ্ঞানিক নিজে দেখিতেছেন এবং আমরাও দেখিতেছি যে, সব কিছু তাঁহার জালে উঠিতেছে না। আসল যেটি, সেটি বরাবর জাল এড়াইয়া যাইতেছে। ছোট হউক বড় হউক, যেটি উঠিতেছে, সেটি অনেক পরিমাণে বৈজ্ঞানিকেরই মানসপুত্র। তাঁর নিজেরই কল্পনা সে সবের প্রসূতি। তিনি তাঁর বিজ্ঞান ব্যবহারের নিমিত্ত আসলের ভোল ফিরাইয়া লইতেছেন, বাস্তবকে কতকটা মনগড়া করিয়া লইতেছেন। তবেই না সে বস্তু তাঁর জালে ধরা দিতেছে! নইলে আসলকে ধরে, আসলকে লইয়া কারবার করে, কার সাধ্য! আসলের এবং সমগ্রের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, বিশ্বে এমন কোনও বস্তু নাই, যেটিকে বিজ্ঞান তার জালে ষোল-আনা ঘিরিতে পারে, এবং তার আইনের নাগপাশে একান্তভাবে বাঁধিতে পারে। আসলে একটা ধূলিকণাও বিজ্ঞানের দ্বারা বিজিত হয় নাই, কস্মিন্ কালে হইবেও না। আমরা সাচ্চা ছাড়িয়া ঝুটার হিসাব রাখিতেছি বলিয়া ভাবি, সবই যেন একটা অনড় ব্যবস্থার বা নিয়মের গোলাম হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আসলে কেহই বা কিছুই গোলাম হইয়া নাই। যেটাকে জড় ভাবিতেছি, সেটাও নাই। বৈষ্ণবেরা জীবকে নিত্যকৃষ্ণদাস বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই দাস্য গোলামি নয়, বিজ্ঞান যেটাকে বাধ্যতা বলিয়া জাহির করিতেছে, তা নয়। জীব ভগবানের লীলা-প্রতিযোগী; আর পুতুলের সনে লীলা হয় না,—এটা মনে রাখিতে হইবে।

বিজ্ঞানের বাস্ত-দলিলখানি আমরা একবার কটাক্ষে দেখিয়া লইলাম। কেন না, এ যুগে দর্শনের তেমন জাঁক নাই বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের জাঁকের অন্ত নাই। আমরা সৃষ্টির এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবনের শেষ লক্ষ্য সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুলিয়াছিলাম, তার একতরফা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পূর্ববর্তী যুগের খোদ বৈজ্ঞানিকেরা না হউন, বৈজ্ঞানিক ঘেঁসা পণ্ডিতেরা করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেন। ডারুইন্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা প্রাণীদের জগতে ইভলিউসান্ থিওরি চালাইয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সত্বরই সে ধুয়া প্রাণি-জগতের সীমানা ছাড়াইয়া অপরাপর ক্ষেত্রেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই বিশ্বটাই একটা ক্রমোন্নত অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এইরকম একটা ধারণা বিজ্ঞানের আওতাতেই বাড়িয়া

উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল এবং পাইয়াছে। মানুষের সভ্যতাকে তাই হাতে-খড়ি দিতে হইয়াছে, সেই প্যালিওলিথিক্ যুগের পাথরের অস্ত্র শস্ত্র নির্মাণে। মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস ও সাধনাকে তাই সুরু করিতে হইয়াছে বর্বর যুগের অর্থহীন ও শ্রী-সৌষ্ঠবহীন ম্যাজিকে। বর্তমান সভ্যতা তাই নাকি মানুষের যুগ-যুগান্তরব্যাপী অধিরোহণের চরম পদবী—মানবীয় সিদ্ধি ও ঋদ্ধির সর্বোন্নত শীর্ষ। ভবিষ্যতে উঠিব কি নামিব, তার কে জানে? কিন্তু এখনই এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ উপস্থিত হইয়াছে যে, এই জাতীয় চিন্তা-সৌধের বুনিয়াদ শক্ত জমিনে তেমন ধারা পাকাপোক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা হয় নাই, হয়ত এটা অনেক পরিমাণে হাওয়ার উপর, অন্ততঃ পক্ষে হাল্কা বালির উপর গঠিত। ফল কথা, এখন আর আমাদের উপর-উপর দেখিলে চলিবে না, তলাইয়া গোড়াটাই পরখ করিয়া দেখিতে হইবে। সভ্যতা বা কাল্চার নিজেকে সভ্যতা বা কাল্চার বলিলেই তা হইয়া গেল না। আপনার ঢাকটি বাজাইতে কেহ কোন দিন কসুর করে নাই। প্রকৃত সভ্যতা বা কালচারের নিদান ও লক্ষণ সাব্যস্ত হওয়া দরকার। প্রকৃত উন্নতি বা অভ্যুদয় কি অবস্থায় কোন্ কোন্ উপাদানে গঠিত হইতে পারে, তা আমাদের ধীরভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত হইবে। মেকী ও ভেজীর বড় বেশী কাটতি হইতেছে দেখিতেছি। এমনকি বিজ্ঞানেও। অতএব সতর্ক, সাবধান না হইলে আর চলিতেছে কৈ?

গোড়ায় এতবড় গৌরচন্দ্রিকা করিতে হইতেছে এই কারণে যে, আমরা আজকাল অনেকেই একটা মিথ্যা বৈজ্ঞানিকতার বাতিকগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। অন্য ভূত বরং তাড়ান সহজ; কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক ভূত তাড়ান সহজ নয়। অন্ধ যুগের কুসংস্কার-দনুজদলনী হইয়া নাকি এই বৈজ্ঞানিক আসরে নামিয়াছেন। অনেক কুসংস্কারের মুণ্ড সত্য সত্যই ভূমে লুটাইয়াছে। গরবিনী দনুজদলনী তাদের মুণ্ডমালা গাঁথিয়া আপন জয়মাল্য দোলাইয়াছেন। কিন্তু অনেকদিন হইতেই দুইটি খট্কা মনে উঁকিঝুঁকি মারিতে সুরু করিয়াছে:—প্রথম, যা কিছু সংস্কার আমরা ভাঙ্গিয়াছি অথবা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছি, সে সমস্তই কি নিঃসংশয়রূপে কুসংস্কারই? মিথ্যা সংস্কারের সঙ্গে অনেক সত্য সংস্কারও কি ঝাঁটাইয়া কোণে সরাইয়া রাখা হয় নাই? দ্বিতীয়, যাহা এই সংস্কারলীলাটি চালাইয়াছে, সে নিজেও কি কতকগুলি মিথ্যা সংস্কারের সৃষ্টি করে নাই? বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যে অনেক মিথ্যা, সত্যের সাজে সাজিয়া বেশ কিছুদিন আমাদের ঠকাইয়া গিয়াছে, তার সাক্ষ্য বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতায় পাতায় মিলিবে। আজ বৈজ্ঞানিক যাহা তিন সত্য দিয়া আমাদের বিশ্বাস করাইতে চাহিতেছেন, কাল দেখি তিনি আবার সেটিকে নির্মম হস্তে ফাঁসি-কাষ্ঠে লট্কাইয়া দিতেছেন। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য মাত্র। বিজ্ঞান-বিদ্যার গতি শুধু যে শামুকের গতি এমন নয়, সেটা সরীসৃপের গতি। সে বিদ্যা ঋজু ও সহজ পথে অগ্রসর হয় নাই। সে বিদ্যার যে অনুভব-তন্ত্র সেটাকে শাশ্বতী বলিব কোন সাহসে? এই সব কারণে মনে হয়,

বিজ্ঞানাগারে যে গোঁড়ামীর বেদী প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, সে বেদী ভাঙ্গিয়া ফেলাই কর্তব্য। সে বেদী কদাপি আমাদের বিশ্বাসের অর্ঘ্য আর পূজার নৈবেদ্য স্থাপনের বেদী হওয়া উচিত নয়। এটা বৈজ্ঞানিক, ওটা অবৈজ্ঞানিক—এইরকম ধারা বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের ভিতরে জরিপের ফিতা টানিয়া দাঁড়াইয়া থাকার দিন চলিয়া গিয়াছে। যে ইভলিউসান থিওরি বা অভিব্যক্তিবাদের কথা আমরা আগে পড়িয়াছি, সে বাদের মূল কাঠামোখানা আজও কোন মতে বজায় থাকিলেও, তার সেই সাবেকি ডাল-পালা প্রায়ই বাদ-সাদ পড়িয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস লিখিতে বসিয়া তাই আজ আর সেই থিওরির সূত্র ব্রহ্মসূত্রের মত চাপিয়া ধরিয়া থাকা চলে না। উন্নতি বা অভ্যুদয়ের একটা প্রকৃষ্ট লক্ষণ নির্ণয় করার অপেক্ষা রহিয়াছে। সেটা নির্ণয় যতদিন না হইতেছে, ততদিন কে সভ্য, কে বর্বর, তা নির্ণয় করা চলিবে না। নিজেদের মালের বড়াই করিয়া অনেক ক্ষেত্রেই আমরা পরের উপর জুলুম করিতেছি। বর্তমান পাশ্চাত্য জগৎ অবশ্য আপনার আলিঙ্গিত সভ্যতাটিকে পরাৎপরা সারাৎসারা মনে করে। কিন্তু ইহাতেই সপ্রমাণ হয় না যে, সে সভ্যতার চাইতে উৎকৃষ্ট সভ্যতা রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, কোন কালেই হয় নাই, অথবা হইবে না। আমরা যে কয়টি সংশয়ের জেরা তুলিলাম, আজকাল ও-দেশেও অনেকে সেই সব জেরা তুলিতে সুরু করিয়াছেন। শ্রেয়ের পথ, কল্যাণের, শিবের অধ্ব সামনে স্পষ্ট দেখিতে পাই আর না পাই, এটা স্থির যে, কাহারও প্রাণে স্বস্তি নাই। নানা দিকে নানা ভাবে ভাঙ্গন গড়ন চলিতেছে, সকল দিকেই বিপ্লবের সাড়া পাইতেছি। বিপ্লবের বড় বড় দুই চারিটা ঢেউ আমাদের এই প্রাচীন ভাবুক মহাদেশের বুকেও আসিয়া পড়িয়া একটা গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি করিতেছে। এ দেশের আত্মাও, তার শত সহস্র বর্ষের সাধনা ও তপস্যার বেদীতলে বসিয়াও, আজ যেন কি একটা গভীর ভূকম্পনের ফলে অস্থির ও আকুল হইয়া উঠিতেছে। আজ তার পক্ষে নিজের যুগান্তীর্ণ আসনে সুস্থির হইয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সে আসন সিদ্ধপীঠ হইলেও, তাকে আশ্রয় করিয়া থাকার মত বল ও ভরসা সে যেন আজ হারাইতেছে। মহাজনেরা বলিয়া গিয়াছেন—যে, সে আসনে বসিয়াই, বরাভয় ও যোগক্ষেম লাভ করিবে। আসনে স্থির হইয়া থাকিলে, তার সিদ্ধি অমৃত আর অভয়, আর আসন হইতে টলিলে তার গতি—মৃত্যু ও মহাভয়। আজকাল অবশ্য আমরা অন্য রকমও ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি। গতিই যখন জীবনের লক্ষণ, তখন সাবেক ঘুণেধরা খুঁটিটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকা—ক্লৈব্য ; আর তার ফল রিক্ততা ও মরণ ছাড়া আর কি হইতে পারে ? বর্তমানের উদ্বেল জীবন-সিন্ধু হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া আমরা কোন্ প্রাণ-সঞ্চারহীন অতীতের মরু মাঝে শুকাইয়া মরিব ? এই মহাসিন্ধু হইতে বিমুখ হইয়া নয়, কিন্তু ইহাকে বরণ করিয়া লইয়াই, আমাদের জীবন পাইতে হইবে। আকাশের বারিধারা আর বন্যার প্লাবন, এ দুই হইতে নিজেকে বঞ্চিত

রাখিয়া কোন্ উদপান নিজেকে চিরদিন জীবনের রসে ভরিয়া রাখিবে? তাহার মর্মস্থলে যে গোপন নির্ঝর ঝরিতেছে, তার গভীর স্তরে ধরিত্রীর যে সমস্ত ফল্গুধারা প্রবাহিত হইতেছে, তা'রা, আকাশ, বাতাস ও আলোকের দান প্রত্যাখ্যান করিয়া, কি চিরদিনই তাকে পূর্ণ করিয়া রাখিতে পারিবে, স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্য করিয়া রাখিতে পারিবে? কেবল অতীতের দোহাই দিয়া, অতীতের তহবিল ভাঙ্গিয়া খাইয়া কোন্ জাতি তার প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে? যখন দারুণ ভূকম্পনে সৃষ্টি রসাতলে যাইবার উপক্রম করিতেছে, তখন কোন্ জীবিতাকাঙ্খী তার জীর্ণ মন্দিরের দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিয়া নিজেকে নিরাপদ মনে করিবে? একটা গাছ যখন বাড়ে, তখন সে জীর্ণ ত্বকের বল্কল আর জীর্ণ পত্ররাজির ভার ত্যাগ করিয়াই বাড়ে। যদি দেখা যায়, তার পরিচ্ছদ জীর্ণ হইতে জীর্ণতরই হইতেছে, তার জীর্ণ পত্ররাজির মধ্যে নবকিশলয় অঙ্কুর মোটেই দেখা দিতেছে না, তবে আমরা সে গাছটার জীবন সম্বন্ধেই সন্দিহান হইয়া পড়ি না কি? এইভাবে, এক দিক দিয়া চিন্তা আমাদের ভিতরে একটা গভীর আলোড়নেব সৃষ্টি করিয়াছে। সমস্যা জাগিয়াছে—অচলায়তনের ভিতরে বসিয়া থাকাতেই কি জীবন, অথবা, ক্রমাগত গতির ক্ষিপ্রতা অর্জনের প্রয়াসেই জীবন? তুলসীদাসের একটা দোঁহায় পাই—চল্‌তি চক্কির কীলকে যে আশ্রয় লইতে পারিয়াছে, সেই বাঁচিয়া গেল; আর যে সেটিকে আশ্রয় করিতে পারিল না তাকে চাকির পেষণে চুরমার হইতেই হইবে। এই যে বিরাট চক্কি চলিতেছে, এর কীলক যে কি বা কে, তা কে বলিবে? তিনি কি ভগবান? অথবা আমরা যেটাকে অচলায়তন বলিতেছিলাম, সেই রকম একটা কিছু? মীমাংসা হয় নাই। যদি বা একটা কীলকের মত একটা কিছু থাকে, তবে সেটাকে আশ্রয় করার মানে কি? আশ্রয় করিতে পারিলে হয় ত অটুট্ রহিয়া যাইব। কিন্তু অটুট্ রহিয়া যাওয়াই কি জীবন, অথবা জীবনের চরিতার্থতা? যে সব দানা পিষিয়া যাইতেছে, তারা পিষিয়া যাইয়া মরিতেছে অথবা বাঁচিতেছে? ফুল ফুটিলে তবে তাতে ফল ধরে। ফল ধরিলে ফুলের পাপড়ি আপনিই ঝরিয়া পড়িয়া যায়। এটা ফুলের মরণ না জীবন? ফল কথা, তলাইয়া না দেখিলে এ সব মনের গোল মিটিবে না দেখিতেছি। এ বিশ্ব মহাব্রজে বাঞ্ছিতের মন্দির-দুয়ারে চিরদিন ধর্‌না দিয়া পড়িয়া থাকাই শ্রেয়ঃ ও মুখ্য, অথবা এক বিরাট্ অফুরন্ত পরিক্রমার মধ্য দিয়াই আমাদের এই তীর্থযাত্রার সত্যকার ফল অর্জ্জন করিয়া লইতে হইবে? কালী বলিয়া ডুব দিলেই কি রত্নাকর তার গর্ভে আমাদের রত্নপুট সাজাইয়া দিবে, না, কোন্ এক সুদূর অজানা রত্নদ্বীপের পানে ঢেউ ভাঙ্গিয়া সাঁতার কাটিয়াই চলিতে হইবে?

আমরা গোড়ার কথা পাড়িয়া হয় ত গোল বাড়াইয়া তুলিতেছি। কিন্তু গোড়ার কথা না তুলিয়া এ গোড়ার গোল থামানর অন্য উপায় আছে কি? কানে আঙ্গুল দিয়া শুনিব না বলিলেই এ চিরন্তন গোল চুকিয়া যাইবে! এ গানের আসরে যারা "গোল

থামাও গোল থামাও" বলিয়া চেঁচাইতেছে, তারাই সব চাইতে বেশী গোল করিতেছে না কি ? বর্তমান যুগ নাকি বাজে গোল থামাইবার যুগ। মানব এত দিন ধরিয়া তার দীর্ঘ শৈশবে যে সমস্ত বাজে গোল করিয়াছে—বেদেই হ'ক আর বাইবেলেই হ'ক—সেই সমস্ত গোল, সে সব "অমৃতং বালভাষিতং" ধমক দিয়া থামাইবার জন্যই কি এই বর্তমান যুগ আসরে অবতীর্ণ হন নাই ? তাঁর ধমকে কিছু ফল যদিও বা হইয়া থাকে, এটা কি আমাদের ভুলিলে চলিবে যে, তাঁর পরিণত বয়সের কাজের কর্কশ কদর্য গোল, সে যুগের শৈশবের বাজে মিঠে ও মঞ্জুল গোলের চাইতে ঢের বেশী মর্মান্তিকভাবে অসহনীয়। বিহগের কাকলিতে অর্থ আমরা খুজিয়া পাইনা, কিন্তু মাধুর্য পাই। তার মিষ্টতাটুকুর জন্যই আমরা তার আদর করিয়া থাকি। কিন্তু রসহীনতা ও সৌষ্ঠবহীনতা গুরুগম্ভীর অর্থযুক্ত হইলেও আমাদের ভাল লাগে না। বিশেষ, সে অর্থ যদি অনর্থ হয়, তবে আমাদের অসহিষ্ণু ও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে হয়। গাঙ্গে পাড়ি দিতে দিতে বুনো মাঝি-মাল্লার অবোঝা ভাটিয়ালী সুরের গানও মিঠা লাগে, কিন্তু মেছুনীদের কড়ির মুনাফা লইয়া কোন্দল ভাল লাগে না। বর্তমান যুগ বড় গলা করিয়া বলিতেছে—সে কাজের যুগ। এত দিন নাকি মানুষ ছেলেমির খেলা লইয়াই ছিল, আজ তার বিজ্ঞান তাকে সত্যকার কর্মদীক্ষা দিয়াছে। পুরাণকার ভারতভূমিকে কর্মভূমি বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কর্মই ছিল না, কর্মভূমি থাকিবে কিসে ? মাথা নেই তার মাথা ব্যথা! যজ্ঞ, হোম, পুরাণ গল্প, ভূত প্রেতে বিশ্বাস, পরলোকের জন্য উই ঢিপি হওয়া—এ সব কি কর্ম ? আজ মাত্র দুই এক শতাব্দী গত হইল, পশ্চিম দেশ তার বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া সত্যকার কর্মদীক্ষা পাইয়াছে। আর সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে সারা বিশ্বকে তারই কর্মদীক্ষায় দীক্ষিত করিতে। তার এই অভিনব কর্মদীক্ষা হইতে কিছু কিছু দৈবী সম্পৎ বোধহয় লাভ হইয়াছে, কিন্তু যে পরিমাণে আসুরী সম্পৎ তাতে লাভ হইয়াছে, তার তুলনায় দৈবী সম্পৎ কতটুকু ? সত্যকার সুখ শান্তি, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, শ্রী-সৌষ্ঠব মানুষ কতটুকু দোহন করিতে পারিয়াছে, এই অভিনব কর্মদীক্ষার কল্যাণে ? পুরাণে দেখিতে পাই পৃথুকে আশ্রয় করিয়া নিখিল প্রাণীবর্গ ধরিত্রী হইতে আপন আপন অন্ন দোহন করিয়া লইয়াছিল। যিনি বিস্তার করেন, তিনিই পৃথু। বীজভাবে যেটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সেটাকে যিনি ব্যক্ত করিয়া তোলেন, তিনিই পৃথু। পৃথুর এই ভাগবতী এবং শাশ্বতী তনু আমাদের ভুলিলে চলিবে না। দেশের পর দেশ, যুগের পর যুগ সেই ভাগবতী তনু আশ্রয় করিয়াই এই ধরিত্রী হইতে নিজেদের কর্মার্জিত এবং কর্মোচিত অন্ন দোহন করিয়া যাইতেছে। এ ব্যাপারের অন্তও নাই, আদিও খুঁজিয়া পাই না। পুরাকালে ভারতবর্ষ এবং আর আর দেশ এইভাবে নিজেদের অন্ন দোহন করিয়া লইয়াছিল বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশ এইভাবেই আপন অন্ন দোহন করিয়া লইতেছে। সে অন্ন অমৃত না বিষ ? সম্ভবত উভয়ই। দোহন বা মন্থন করিতে গেলেই একটার সঙ্গে অপরটাকেও আমাদের অবশ্যই পাইতে হয়। সমুদ্র

মন্থনে তাই দেখি, কেবল অমৃতভাণ্ডই উঠে নাই, বিষকুম্ভও উঠিয়াছিল। দৈত্যদিগকে বঞ্চিত করিয়া দেবতারা অমৃতভাণ্ডটি বাঁটোয়ারা করিয়া লইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের আবার বিষকুম্ভটির গতি করারও একটা উপায় ভাবিতে হইয়াছিল। যিনি দেবতাদেরও দেবতা, যিনি মহাদেব, স্বয়ং তাঁকেই সেই বিষকুম্ভের ভার লইতে হইয়াছিল। এ রকম বন্দোবস্তটি না হইলে, কেবল অমৃতে দেবতাদের অমর হওয়া ঘটিত না। কেউ একজন ভার লইয়াছিলেন বলিয়াই, সমুদ্র মন্থনের ফলে দেবতাদের গরলে অমৃত হইয়াছিল, অমৃতে গরল হয় নাই। এ সমুদ্র মন্থনও যে নিত্য ঘটনা। একদিনের তরেও যে এর বিরাম নাই। পুরাকালে ভারতবর্ষ এ সমুদ্র মন্থন করিয়াছিল, বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশ এ সমুদ্র মন্থন করিতেছে। এ মন্থনের দণ্ড, আধার, রজ্জু এ সবই আছে, এবং ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখাইয়াও হয় ত' দিতে পারা যাইবে। কিন্তু সে কথা যাক্। প্রশ্ন এই—হালের সমুদ্র মন্থনের ফলে মানবের ভাগ্যে গরলে অমৃত না অমৃতে গরল হইতেছে? ভোগ ও আরামের আয়োজন ত সুপ্রচুরই দেখিতেছি। মোহিনী তাঁর যাদুকরে যে সুধাভাণ্ড বাঁটিয়া দিতেছেন, সে ভাণ্ড ত' নিত্যই উপচাইয়া উঠিতেছে দেখিতেছি। সুধা দিন দিন বড় উগ্র হইয়া উঠিতেছে। তার ঝাঁজে কলিজে পর্যন্ত জ্বলিয়া যাইতেছে। কিন্তু পেয়ালা ভরপুর, তাদের আঁখি ঢুলু ঢুলু; যাদের পেয়ালা শূন্য বা গাদে ঠেকিয়াছে, তাঁদের আঁখির দৃষ্টি রক্তজ্বালাময়ী! সবই দেখিতেছি, কিন্তু যিনি নিষ্কাম-ত্যাগ-বপু এবং বিশুদ্ধ-জ্ঞান-বপু সেই শিবের আমন্ত্রণ হয় নাই বলিয়া উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খল-ভোগ-সঞ্জাত বিষে আজ বিশ্বমানব জর্জরিত হইয়া উঠিতেছে না কি? বিশ্ব-সমাজের নাড়ীতে নাড়ীতে সেই প্রচ্ছন্ন বিষের ক্রিয়া নানাদিকে নানা উৎকট অপপ্রচারের ভিতর দিয়া প্রকট হইয়া উঠিতেছে না কি? যাঁরা শুদ্ধ জ্ঞানের ভিতরে ডুবিয়া থাকিতে চাহেন, তাঁরাও আজ হাঁপাইয়া উঠিতেছেন এই ভাবিয়া যে, এ রকম ধারা ডুবিয়া থাকারই বা শেষ কোথায়, পরিণতি কোথায়! এ ডুবিয়া থাকা, না ডুবিয়া মরা! ছায়াটিকে ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিতে করিতে কায়াটির কথা আমরা একদম ভুলিয়া যাই নাই ত? প্রাচীনদের উপদেশ ছিল—আত্মানং বিদ্ধি—আপনাকে জান। আপনাকে না জানিলে এই মহা বৃত্তের যেটি কেন্দ্র সেইটাই জানা হইল না। আর কেন্দ্রটি অজানা থাকিলে, আর সব জানা অজানারই সামিল হইয়া যায়। কেবল জানা বলিয়া কেন, পাওয়া সম্বন্ধেও এই কথা। এইজন্য বিজ্ঞান-বিদ্যার প্রসাদে অনেক কিছু জানিয়াও আমরা বোধহয় জ্ঞানের ঠিক ফলভাক্ হইতেছি না, যে "বিদ্যয়া-অমৃতমশ্নুতে" সে বিদ্যার কৈ ত' মুখ দেখিতে পাইতেছি না। প্রাচীনেরা বলিতেন—জ্ঞানে মুক্তি। নবীন বিজ্ঞান আমাদের এই অনাদি বন্ধনের ব্যবস্থাটাকেই বিরাট ও নীরন্ধ্র করিয়া আমাদের দেখাইয়া দিতে চাহিতেছে। জড় আজ চৈতন্যের দীক্ষা না পাইয়া, চৈতন্যকেই আপন দীক্ষায় দীক্ষিত করিতেছে। জড়ের নমুনাতে তাই

আমাদের চেতনকে ধরিতে বুঝিতে চেষ্টিত হইতে হইতেছে। যেটা মায়া, যেটা ভেল্কি, সেটা আজ সত্যের চেহারা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। প্রতিবিম্ব আজ বিম্বের প্রতি স্পর্ধার বিন্ধ্যাদ্রি। ঋষিরা পূষা বা সূর্যের কাছে প্রার্থনা করিতেন—"হে জ্যোতির্ময় দেবতা, তুমি হিরণ্ময় পাত্রে অপিহিত সত্যের আবরণ আমাদের কাছে উন্মোচন কর। আমরা সত্যের মুখ অবলোকন করি।" আর বিজ্ঞানে অন্তরাত্মার ভিতর হইতেও এইরকম ধারা একটা প্রার্থনা বা আকুতির সুর ধীরে ধীরে গুমরিয়া উঠিতেছে না কি ? বিজ্ঞানের উপাস্য দেবতা আজ কি যেন একটা ছলনার মধ্যে, উপহাসের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছেন। কোন্ এক অজানা বাঁশীর সুর অস্ফুট ব্যথায় এবং আশায় আজ বিজ্ঞানের কানে বাজিতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আপন ময়দানবের দৃষ্টির মধ্যে আপনি দিশেহারা, পথহারা বিজ্ঞান কোন্ পথে অভিসার করিয়া তার বাঞ্ছিতের নাগাল পাইবে, তা ত' জানিনা! তার প্রাণে একটা অস্বস্তি ঘনাইয়া উঠিতেছে। বড় বড় হিসাবের খাতা চিবাইয়া তার গভীর মর্মন্তুদ রসলিপ্সাটিকে আর কতকাল সে এমনধারা পরিহাস করিতে পারিবে ? এই ত গেল শুদ্ধ বিজ্ঞানের অবস্থা। প্রয়োগ-বিজ্ঞানে যাইয়া দেখি, অবস্থা আরও কাহিল। সেখানে ব্যাঙ্ক-নোটের গাদা চিবাইয়া কলিজে ভিজানর চেষ্টা চলিতেছে। কাজের অনেক নূতন নূতন ফন্দি বাহির হইয়াছে ও হইতেছে, সন্দেহ নাই। হাওয়ার উপরে মানুষ উড়িতেছে, বেতারে মানুষ গান ও অভিনয় শুনিতেছে। আরও কত কি ইন্দ্রজাল বিজ্ঞান যে সৃষ্টি করিয়াছে, তার হিসাব দিবে কে ? কিন্তু সাধক রামপ্রসাদ একদিন আপ্‌শোষ করিয়া বলিয়াছেন—"মন হারালি কাজের গোড়া।" বিজ্ঞান আজ এ-কাজ ও-কাজ হাসিল করিতে যাইয়া, কাজের গোড়াটাই হারাইয়া বসিয়াছে কি না, সেটা ভাবিয়া দেখার নয় কি ? যাজ্ঞবল্ক্য একদিন ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীকে অনেক কিছু বর দিবার কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন—যাতে ক'রে অমৃত না হব, এমন বর নিয়ে কি করব প্রভু ? বালক নচিকেতা সাক্ষাৎ যমের সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়া এইটাই বিশেষভাবে জানিতে চাহিয়াছিলেন। যম তাঁহাকে এটা সেটা দিয়া ভুলাইতে চাহিলেও তিনি ত' ভুলেন নাই। সকল প্রাচীন দেশে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, এই অমৃতের সন্ধানই ছিল কাজের কথা। এ কাজের তুলনায় আর সবই ছিল বাজে। এখনকার দিনে আমরা উল্টা রাস্তা ধরিয়া ভাবিতেছি ও চলিতেছি। আমাদের জমা-খরচের খাতায় বড় বড় অঙ্ক উঠিতেছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সে সমস্ত অঙ্ক লাভের ভাগে পড়িতেছে, কি ফাজিলের ভাগে পড়িতেছে, তার হিসাব রাখিতেছে কে ? কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে হয়ত' কোন কিছুর একটা কারখানা বানাইতেছি; কিন্তু সে কারখানায় আর যাহা উৎপন্ন হ'ক না কেন, মানুষের প্রকৃত সুখ শান্তি ও স্বাধীনতা যে তাহাতে উৎপন্ন হইবে না, সে পক্ষে কে সন্দেহ করিবে ? ধরিত্রীকে যন্ত্রের লৌহ নিগড় বাঁধিয়া আর যাহা কিছু আমরা দোহন করিতে পারি বা না পারি,

সেই প্রাচীনদের সকল কাম্যের সেরা কাম্য—আনন্দ, অভয় ও অমৃত দোহন করিতে যে আমরা অপারগ হইতেছি, এ পক্ষে সন্দেহ আছে কি? এটা অবশ্য ঠিক যে, ঐ যে প্রাচীনদের কাম্যের কথা বলিলাম, সেটা মানবাত্মারই চিরন্তন গভীরতম কাম্য! মানুষ তার সকল চাওয়ার ভিতর দিয়াই ঐ একটা চাওয়ারই পথ খুঁজিতেছে; তার সকল রকম পাওয়াকেও ঐ একটা পাওয়ারই সোপানরূপে গাঁথিয়া তোলার যত্ন করিতেছে। কিন্তু তার সকল চাওয়া ও পাওয়া সেই একটারই সত্য-সত্য অভিমুখেই যে হইয়াছে বা হইতেছে—এ কথা কে বুকে হাত রাখিয়া বলিবে? প্রাচীন ভারতে দেখিতে পাই, সেই চরম চাওয়া ও পাওয়াটিই সাম্‌না সাম্‌নি কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া, স্পষ্টতঃ তারই নির্দেশে এবং অভিমুখে সর্ববিধ চিন্তা ও চেষ্টাকে সাজাইয়া গাঁথিয়া তোলার একটা যত্ন ছিল। "অমৃতা অভূম"—এই সঙ্কল্পটাকে তাঁরা যেন আড়ালে আব্‌ডালে যাইতে দিতে রাজি নন। এই মূল সঙ্কল্পের মন্ত্রে দেখি সমস্ত বিরাট্ সভ্যতা ও বিচিত্র সাধন পদ্ধতি, তাদের যন্ত্র যেটি, আর তাদের তন্ত্র যেটি, সেটি গড়িয়া লইতেছে। ধ্যানে যে মহাসত্যের উপলব্ধি, সঙ্কল্পে যে শাশ্বত শিবসুন্দরের বরণ, তারই আলোক দেখাইয়া দিতেছে কোনটা ঝুঁটা কোন্‌টা সাচ্চা, তারই আকর্ষণ বাছিয়া লইতেছে সত্যকার উপাদেয়টিকে হেয়ের মধ্য হইতে। কিন্তু সব যুগে, বিশেষতঃ বর্তমান যুগে, সে আলোক তেমন খোলসাভাবে সাম্‌নে হাজির, সে আকর্ষণ তেমন সরল, স্বচ্ছন্দভাবে ক্রিয়াশীল দেখিতে পাইতেছি কি? বর্তমান যুগের যিনি প্রাণ-দেবতা, তিনি, সেই উপনিষদের ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর মত অকুণ্ঠিত বাণী বলিতে পারিতেছেন কি—"তেনাহং কিং কুর্যাম্, যেনাহমমৃতা ন স্যাম্?" বলিতে পারিলে হয়ত' জীবনটা অনেকটা সরল, সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠিত। ও দেশেও দু'চারজন আজ কাল বলিতে যে পারিতেছেন না, এমন নয়। কিন্তু কেমন যেন ভয়ে-ভয়ে। লোকায়ত ও যুগায়ত চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি তাঁদের কথায় কাণ দেবার জন্য প্রস্তুত হইয়া নাই, এমন কি, অবিশ্বাসে আর পরিহাসে তাঁদের গলা টিপিয়া ধরার জন্যই প্রস্তুত হইয়া আছে।

এ দেশেও আজ এই অবিশ্বাস ও পরিহাস, বিদ্রূপ ও আক্রমণের মনোভাবটা লোকায়ত হইবার জন্য মাথা তুলিতেছে। যেন, এক অজানা অমৃতের এষণাতেই ভারতের সর্বনাশ হইয়াছে। চরম বা পরম গন্তব্যটিকে যাঁরা এখনও অস্বীকারের বাহিরে ঠেলিয়া দিতে পারেন নাই, তাঁরাও আজ সন্দিহান—ভারতের অমৃতের এষণা কি ঠিক ঠিক রাস্তাতেই হইয়াছিল? যদি হইয়াছিল, তবে ভারত আজ হাজার বছর ধরিয়া নগণ্যের অগ্রগণ্য হইয়া রহিয়াছে কেন? অমৃতের, অভয়ের, আনন্দের খোঁজে চলিয়া আজ ভারত এমনধারা মৃত্যু, দৈন্য, ভীরুতার নাগপাশে বাঁধা পড়িয়া রহিল কেন? অয়নের জন্য অন্য পন্থা নেই হয়ত—কিন্তু ভারত সে পথের রঙ্গীন্ ছায়াচিত্রই দেখিয়াছিল, তার সত্য, কঠোর ও বন্ধুর পরিচয় পায় নাই। আজ নানা ভুল-ভ্রান্তি, বিরোধ-বিপ্লব,

রক্তপাত-প্রাণপাতের ভিতর দিয়া বর্তমান যুগ যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে, সেইটাই বোধহয় এ পর্যন্ত বিশ্বমানব-প্রগতির শেষ পাদপীঠ ; এই পাদপীঠ হইতেই হয় ত অভিযান নূতন করিয়া সুরু করিতে হইবে সকলকেই। হয় ত কম্যুনিষ্ট রাশিয়া যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছে, সেইখানেই আমাদের সকলের যাত্রা সুরু করিতে হইবে। কংগ্রেস আন্দোলন, নারী-প্রগতি, বিশ্বশ্রমিকের উত্থান, প্রাচীন সমাজধর্ম ও প্রতিষ্ঠানের ভাঙ্গন—এ সকলই হয় ত সেই অবশ্যম্ভাবী আরম্ভের রেখার কাছাকাছি আমাদের লইয়া চলিয়াছে। দেশের হাওয়াটা সেই দিকেই মনে হয় বটে। কিন্তু তবু—এই প্রাচীন আর্য-ঋষি-মহাজন-জুষ্ট দেশের যেটি অন্তরাত্মা, সে জেরা তুলিবে—এই যে নূতন করিয়া আরম্ভ, এটা কিসের আরম্ভ—সমস্যার না সমাধানের ? সমস্যার মূল গাঁটটা ভুলিয়া বা ছাড়িয়া আশে-পাশের গাঁটগুলো ধরিয়া টানাটানি করিয়া সব তাল পাকাইয়া তুলিতে যাইতেছি না কি ? অতি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া খেই হারাইয়া ফেলিতেছি না কি ?

ইন্দ্র না বিরোচন ?

আমরা আগেকার প্রবন্ধে নানাদিকে নানা সমস্যার মাথা তোলার কথা বলিয়াছি। সে-সকল সমস্যা কেবল যে আমাদের কল্পলোকের ফাঁকে ফাঁকে অথবা চিন্তার দিক্‌চক্রবালেই মাথা তুলিতেছে, এমন নয়; আমাদের সত্যকার জীবন-ব্যবহারেও এ সবের প্রভাব আমরা দেখিতে পাইতেছি। দর্শনে, বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রে, সমাজে সাহিত্যে, শিল্পকলায়—সর্বত্র একটা গভীর অস্বস্তি ঘনাইয়া উঠিতেছে দেখিতে পাইতেছি, অনেক কিছু পুরাতন ভাঙিয়া যাইতেছে, অনেক কিছু নূতন সেই ভাঙাচোরার মধ্য হইতে গড়িয়া উঠিতেছে। একটা অস্বস্তি লইয়াই এ সমস্ত ভাঙাচোরা চলিতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু নূতনকে পাইয়াও অস্বস্তির মাত্রা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। পুরাতন বাস্তু-ভিটা জীর্ণ হইয়াছে এই অজুহাতে আমরা ফাঁকা ময়দানে আসিয়া নূতন ভিটার পত্তন করিতেছি। ভাবিতেছি, এখানে নূতন আকাশ, নূতন বাতাস, নূতন আলোক, নূতন জলমাটি, এ সকল আমাদের হারান' সুখ ও স্বচ্ছন্দতা আবার আনিয়া দিবে। কিন্তু কাহার যেন অভিসম্পাতে বলিতে পারি না, আমাদের নূতন আবাসেও নূতন ঘর তৈয়ারি শেষ হইতে না হইতেই তাহার মট্‌কায় আগুন লাগিয়া উঠে। আমাদের মাথার উপরে আকাশে অপ্রত্যাশিত কালবৈশাখীর ঝড় আবার তোড়জোড় করিয়া আসে, আমাদের পদনিম্নে ধরিত্রী কি জানি কি এক গোপন রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে কাঁপিয়া উঠে। ঋক্‌বেদের ঋষিরা আকাশ, বাতাস, ঊষা, নক্ত, গো, বনস্পতি—এ সমস্তের ভিতরেই একটা মধুধারা ক্ষরিয়া যাইতেছে দেখিয়াছিলেন। বিশ্বভুবনে ওতপ্রোত এই যে মাধ্বী-ধারা, এটা বোধহয় চিরন্তন। যে কেহ এই মাধ্বী-ধারার সত্য পরিচয় পাইয়াছে, এবং তার সাথে আপন কেন্দ্রের সজীব সংযোগ রাখিতে পারিয়াছে, সেই এই চিরন্তন প্রবাহ হইতে দূরে সরিয়া যায় নাই, তাকে রসসঞ্চারহীন মরুর মাঝে মরীচিকার পিছু পিছু ধাবমান হইতে হয় নাই। তার যাত্রার পথে তপ্ত শৈলস্তূপের ভিতরেও স্নিগ্ধ অনাবিল রসের ঝরণা ঝরিয়া গিয়াছে, দাবানলের জ্বালা-বেষ্টনীর মধ্যেও শান্তি-ঘেরা ও তৃপ্তিতে ভরা কোনও এক মন্দির-দুয়ার চির-অবারিত হইয়া রহিয়াছে। সে বিষের ভিতরেও অমৃতের সন্ধান পাইবে। এই যে বিশ্বে ওতপ্রোত মধু বা সোম বা রসবস্তুটিকে চিনিবার ও পাইবার ফন্দি, সেটাকেই ঋষিরা সাধন বলিয়া গিয়াছেন। শুধু সাধন বলি কেন, ইহাই জীবন। আমরা অমৃতের অন্বেষণ হইতে শেষকালে বিমুখ হইয়া যেটাকে জীবন বলিতেছি সেটা যে সত্যকার জীবনই নয়। যেটা দুই চারিদিন পরে মৃত্যুর হাতে আমাদের সঁপিয়া দেয়, আমাদের সকল সত্তা মৃত্যুর মধ্যে নাকচ্ করিয়া দেয়, সে জীবন ত'

মরণেরই কিঙ্কর, আজ্ঞাবহ ক্রীতদাস! আমরা তাই যেন মরণের জন্যই দুই চারিদিন বাঁচিয়া রহিতেছি! যে দুই চারিদিন বাঁচিয়া থাকি, সে দুই চারিদিনও যদি শেষের সেইদিনকে অস্বীকার করিয়া থাকিতে পারিতাম, তার ভয়ে জড়সড় হইয়া না থাকিতে হইত, তবেও না হয় মনে করা চলিত যে, দু'দিনের জন্যই হউক্ আর দশদিনের জন্যই হউক্, আমাদের ভাগ্যে সত্যকার জীবন-মদিরার একটা আস্বাদ পাওয়া ঘটিয়াছে। তা হ'ক্ না সে আস্বাদ তপ্ত, হ'ক্ না সেটা উগ্র! কিন্তু কার্যতঃ দেখি, যে দু'দশদিন আমরা বাঁচি, সে দু'দশদিন আমাদের রোগে, শোকে, ভয়ে, দুঃখে, দৈন্যে, অবসাদে সেই মরণের জন্যই পাঁয়তারা ভাঁজিতে কাটিয়া যায়। অতএব যে চিরন্তন মাধ্বী-ধারার সুসমাচার ঋগ্বেদের ঋষিরা আমাদের শুনাইতেছেন, সে ধারার মুখগুলি আমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বত্র কি যেন একটা পাষাণে চাপা রহিয়া গিয়াছে। সে পাষাণের চাপ সরাইয়া সেই স্রোতগুলিকে আমাদের ভিতরে ও বাহিরে বহতা করিয়া লওয়ার যে ফিকির, তা আমরা শিখি নাই। আমাদের এই সভ্যতা ও কাল্‌চার আমাদের সে ফিকির শিখাইতেছে না। আমরা সত্যকার জীবন নিজেদের ভিতরে পোষণ করিতেছি না। মৃত্যুকেই পোষণ করিতেছি।

আমাদের এই সাতমহল রাজপুরীর অন্দরে সোনার পালঙ্কে সেই কল্পলোকের রাজকন্যা অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতেছি। কে যেন মরণকাঠি ছোঁয়াইয়া তাকে মরার মত করিয়া রাখিয়াছে। "জীওনকাঠি"টি আমাদের সভ্যতা ও কালচার এপর্যন্ত আমাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারে নাই। প্রাণে দারুণ অস্বস্তি আর ব্যাকুলতা লইয়া সে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—কোথায় সে গোপন জীওনকাঠির খোঁজ মিলিবে। হয় ত ঘরের মাঝেই রাজকন্যার সোনার পালঙ্কের পাশেই সে জীওনকাঠিটি পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু ব্যস্ত-সমস্ত সে, আত্মবিহ্বল দিশেহারা সে, ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়া এদিক্ ওদিক্ ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর ফুঁকারিয়া বলিতেছে—ওগো, তোমরা কেউ আমার হারান সোনার কাঠির খোঁজ দিতে পার? বিশ্বভুবনের পরতে পরতে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার ফুকরণের প্রতিধ্বনি একটা নিষ্ঠুর পরিহাসের মত খেলিয়া বেড়াইতেছে। এ যে আবার সেই তুলসীদাসের— "নাভিকা সুগন্ধ মৃগ নহি পাওত ঢুঁড়ত ব্যাকুল হোই!" এ যে সেই চিরন্তন পাগলের হাতে পরশমণি রাখিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়ান—কৈ, কোথায় আমার পরশমণি! মানুষের সাধনার যে মানসী প্রতিমা, সে যে সোনার প্রতিমা, সুধাব্ধির বক্ষে মণি-মণ্ডপ তলে রত্নবেদিকার উপরে সে দেবতার আসন আস্তীর্ণ! কিন্তু মানুষের সভ্যতা ও কাল্‌চার আজ তার সত্য দৃষ্টি হারাইয়া দেখিতেছে—সেই সোনার মানসী প্রতিমা আজ যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে, শত শত অয়ো-নিগড়ে তার সোনার অঙ্গ আজ যেন পিষ্ট, শৃঙ্খলিত হইয়া রহিয়াছে। তার দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্র সমাজ, শিল্প সাহিত্য—

এ সবের ভিতর দিয়াই সে খুঁজিতেছে, অধীর আকুল হইয়া খুঁজিতেছে, সেই পাথরখানি, যার স্পর্শে এ পাষাণ আবার সোনা হইবে; সেই জীওনকাঠিটি যার স্পর্শে ঐ নিগড়বন্ধনের মধ্য হইতে তার প্রাণের দেবতা আবার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা পাইয়া জাগিয়া উঠিবেন।

আমরা কথাটাকে রকমারি করিয়া বলিতেছি। কিন্তু মাধ্বী-ধারার কথা, জীওন কাঠির কথা, পরশপাথরের কথা—এ সবই এক কথা। দুঃখকে জয় করার জন্য মধু বা আনন্দ, মৃত্যুকে জয় করার জন্য অমৃতের মত কোন একটা কিছু, আর বন্ধন ও জড়তাকে জয় করার জন্য অপর একটা কিছু মানুষ চিরদিনই খুঁজিয়া আসিতেছে। তার সমাজ, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, নীতিসাধন ও ধর্মসাধন—এ সবই ঐ অফুরন্ত খোঁজের নানান্ রাস্তা, নানান্ উপায়। খুঁজিতে গেলে কিসের খোঁজ করিতেছি, তার ধারণা থাকা নেহাৎ অসম্ভব নয়। বরং, সেই রকমটাই হামেশা ঘটিতেছে। মানুষের অন্তরতম চাওয়াটা স্পষ্ট হইলে বোধহয় পথের গোল আর চলার ফের অনেক চুকিয়া যাইত। সেই চাওয়াটাকেই স্পষ্ট করিয়া দেওয়া তাই মানুষের সভ্যতার ও সাধনার একটা বড় কাজ। প্রাচীন ভারতকে আমরা শ্রদ্ধা করিব শুধু এইজন্যই নয় যে, সে প্রাচীন, এবং প্রাচীন হইয়াও এখনো কায়ক্লেশে জীবিত আছে। যাঁরা শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন, তাঁরা বলিবেন—সে না মরিয়াও আজ হাজার বছর ধরিয়া ভূত বা ব্রহ্মদৈত্য হইয়া আছে। শ্রদ্ধা করার সব চাইতে বড় হেতু এই যে সে মানুষের অন্তরতম চাওয়াটিকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ঋতমার্গ ও অনৃতমার্গটাকে, এতটা স্পষ্ট করিয়া ধরিয়াছিল, যতটা স্পষ্ট করিয়া আর কোন যুগ বা দেশ সম্ভবতঃ ধরিতে পারে নাই। আজ সভ্যতা ও কালচার তার পুরাতন আয়তনগুলি ভাঙ্গিয়া নূতন নূতন আয়তন গড়িতেছে। কিন্তু, যে আশা লইয়া গড়িতেছে, যে অস্বস্তি হইতে পালাইবার জন্য গড়িতেছে, দেখি সে আশা তার পূরিতেছে না—পূরণের দিকেও যাইতেছে না; সে অস্বস্তির জ্বালা নিভিতেছে না, নূতন তাতে নূতন করিয়া ইন্ধন যোগাইতেছে। একটা গোড়ায় ভুল হয় ত রহিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। মারুতির ল্যাজে আগুন ধরাইয়া দিলে, তিনি যে চালে পড়িবেন, সে চালই জ্বালাইবেন, আর শেষ কালে, আপনার মুখটিও পোড়াইবেন। আমরাও আজ যাতে পড়িতেছি, তাতেই আগুন ধরাইয়া দিতেছি। পুরাতন শুকনা বলিয়া পুড়িতেছে ভাল। নূতন তেলকাঠের মতন পুড়িতেছে আরও ভাল। নূতন সরস বটে, কিন্তু তার সরসতা যে স্পিরিট্ পেট্রল মাখিয়া। শেষকালে, আমরা নিজেদের মুখটিও পোড়াইব কি না, সে পক্ষেও বড় বেশী সংশয় থাকিতেছে না। ফরাসি-বিপ্লব সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আগুন ল্যাজে ধরাইয়া শুধু যে মধ্যযুগের স্তূপীকৃত স্বৈরাচার আর অনাচারগুলোই পোড়াইয়াছিল, এমন নয়। নব জাগ্রত গণশক্তির নূতন মন্দিরটাকেও সে পোড়াইতে কসুর করে নাই। ডিমোক্রাসী তাই আজও দেশে "ফেলিওর" (failure) বলিয়া অনেকে আপশোষ

করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে বল্‌শেভিক রাশিয়ার পানে আমরা সবাই ব্যাদিত বদনে তাকাইয়া আছি—সেও যে একটা লেনিন-ষ্টালিনের মার্কামারা খোসখারাকী কিন্তু খাপ্পা-মেজাজী মানুষ-মুদ্রা তৈরী করার বিরাট টাকশাল—এমন কথা শুধু Dean Ingeএর মতন "গোমড়ামুখো" পাদ্রিপুঙ্গবের মুখেই শোনা যাইতেছে, এমন নয়। যাঁরা কম্যুনিষ্ট আদর্শ অন্তরের সহিত অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত আছেন, এবং যাঁরা সে আদর্শের প্রতিষ্ঠাপনের নিমিত্ত অতীতকে একেবারে ঢালিয়া সাজিয়া লইতেও গররাজি নন, তাঁরাই অনেকে ও-দেশের গণমণ্ডলীর সুখস্বচ্ছন্দতা, শিক্ষা-ব্যবস্থার বহুৎ তারিফ করিয়াও, অবলম্বিত মার্গ ও উপায়ের সত্যকার উপাদেয়তা সম্বন্ধে ঘোর সন্দিহান হইয়া উঠিতেছেন। আমাদের রবীন্দ্রনাথ সাবেকিয়ানার ভূতগ্রস্ত, এমন অবশ্য কেউ মনে করেন না। তিনি নব রাশিয়াকে হৃদয়ের সমবেদনা ও অন্তরের শ্রদ্ধা দান করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই ; কিন্তু অয়নের জন্য যে পথ রাশিয়া আজ বাছিয়া লইয়াছে, সেটাকে তিনি সত্যের ও কল্যাণের ঋজু এবং নিশ্চিত পথ মনে করিতে ত' পারেন নাই। মস্কোর এই বিশ্ববিজয়ী অতিকায় প্রতিষ্ঠানের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া তাই তাঁর মন ছুটিয়াছে—আমাদের সেই প্রাচীন কিন্তু আজ উপেক্ষিত পল্লীবাটের স্নিগ্ধ, শান্ত, শেফালী-বকুল-বিছানো ছায়াঞ্চল-প্রান্তটুকুর পানে। সে পল্লীবাটেরও আটচালায়, অতিথিশালায়, চণ্ডীমণ্ডপে আজ আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে দেখিতেছি। পশ্চিমের রক্তসিন্ধুর পার হইতে কালবৈশাখীর রুদ্র অভিযানের সাড়া আজ আর শুধু অঞ্চলপ্রান্তে নয়, তার চির-সহিষ্ণু, চির অকাতর বক্ষেও একটা তোলপাড় সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু তবুও মনে হয়—তার সেই প্রাচীন ব্যবস্থাটিকে—যেটা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও বিকাশটিকে অযথা সঙ্কুচিত করিয়া নয়, কিন্তু ব্যক্তির যা কিছু সিদ্ধি ও ঋদ্ধি সেটাকে সমষ্টির কল্যাণের পরিচর্যায় নিযুক্ত করিয়া, ব্যক্তিকে সমষ্টির সেবার মধ্য দিয়া তার ব্যক্তিত্বের চরম পরিণতি লাভের রাস্তা দেখাইয়া দিয়া, ব্যক্তি ও সমষ্টিকে একটা সুসঙ্গত ও সুসমঞ্জস সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে মিলাইতে যত্ন করিত,—সেইটাকে বোধহয় আজ এই সব ভেঙ্গে নামিয়ে দেওয়া পদ্মার ভরাভাদরের ভাঙ্গনের মুখে রক্ষা করিতে পারিলেই ভাল হইত। এটা ঠিক যে, সে ব্যবস্থাও আজ আর আত্মরক্ষার মতন শক্তি ও শৃঙ্খলা ও সংহতি সঞ্চয় করিয়া রাখে নাই। ধ্বসিয়া পড়িবার জন্যই সে প্রস্তুত হইয়া আছে, মনে হইতেছে। হয়ত', তা মনে করিয়া আমরা ভুলই করিতেছি। কিন্তু, যদি বিচার করিয়া দেখি, সে ব্যবস্থার মূলে সত্য আছে, কল্যাণ আছে, আশা আছে, অভয় আছে, তবে, সেটাকে চেষ্টা-চরিত্র করিয়া এখনই ফেলিয়া দেবার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া ত' মনে হয় না। যে ভিত মারাত্মক ভাবে দমিয়া পড়িয়াছে, যে ইমারতের ছাদ পড়' পড়' হইয়াছে, তাকে নিয়ে নিশ্চিন্তভাবে ঘর-কন্না করার চাইতে তাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেওয়াই হয়ত বেশী নিরাপদ। কিন্তু, যে ভিত, যে ইমারত আজ হাজার হাজার বছরের ধাক্কা খাইয়াও দাঁড়াইয়া আছে,

সেটাকে বাতিল সাব্যস্ত করায় আনাড়ী স্থপতি-বিদ্যার পক্ষে অনধিকার চর্চা হইবে না কি? যে মিস্ত্রি কেবল কাঁচা গাঁথুনির খবর রাখে, যে কেবল বাঁশকাঠের ঘরের ঘরামী অথবা ক্যাম্বিশের তাঁবুর কারিগর, তাকে ডাকিয়া পিরামিডের বা ওঙ্কার-বটের স্থিতি-সংহারের কৈফিয়ৎ নেওয়া চলিবে কেন? স্তম্ভ পাকাপোক্ত হইলে হেলিয়াও উহা অনেককাল দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু গোড়ায় কাঁচা হইলে খানিকদূর উঠিতে না উঠিতে আপনার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। ভারতে সত্যকার কাঁচা জিনিষগুলাকে পাকাইয়া তুলিতে তাদৃশ চেষ্টা হয় নাই; পরন্তু, সত্যকার পাকা জিনিষগুলো যাতে কাঁচিয়া না যায়, সে পক্ষে প্রভূত চেষ্টা হইয়াছে, মনে হয়। এইজন্য মনে হয়, এ-দেশে যে সব জিনিষগুলো হাজার হাজার বছর ধরিয়া টিকিয়া আছে, তারা সত্য সত্যই পাকাপোক্ত বলিয়াই আছে। অবশ্য, এসব কথা আমরা বারান্তরে খোলসা করিয়া বলার চেষ্টা করিব।

নূতনের মধ্যে গিয়াও মানুষের প্রাণ অস্বস্তিতে আরও ভরিয়া উঠিতেছে দেখিয়া মনে প্রশ্ন ওঠে—সেই মাধ্বী-ধারার গোপন-সঞ্চারের হদিশ আমরা হারাইয়া বসি নাই ত'? আগুনের ফিন্‌কির মতন আমাদের স্পর্শ যাতে লাগিতেছে, সেইটাই শুক্‌নো বারুদের গাদার মতন উড়িয়া যাইতেছে না কি? তাঁরা যেখানটায় মাধ্বী-ধারার সঞ্চার দেখিতেন, আজ সেখানটায় প্রচণ্ড অগ্নিগিরির মুখরন্ধ্র, সুড়ঙ্গবর্ত্ম প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, দেখা যাইতেছে কেন? তাঁদের দেখাটা সত্য, না হালের আবিষ্কার ও অভিজ্ঞতাটাই সত্য? প্রশ্নটা গোড়ার প্রশ্ন, কিন্তু অস্বীকার করার নয়। নূতন-পুরাতন, সেদিনকার-আজ কালকার—এ জেরাটা আমাদের মুখে লাগিয়াই আছে বটে, কিন্তু আসলে হয়ত' এটা তেমন কাজের জেরা নয়। আমাদের চারধারের বন্দোবস্তটা নিয়ত বদ্‌লাইতেছে। আমিও বদ্‌লাইতেছি। কিন্তু সত্যকার কাজের জেরা বোধহয় এইটাই—সবই ত' বদ্‌লায়, কিন্তু বদ্‌লায় না, বদ্‌লাইলে চলে না, বদ্‌লাইলে স্বস্তি থাকে না এমন একটা কিছু যোগাযোগ আমার ভিতরটার সঙ্গে বাহিরটার, বাহিরটার সঙ্গে ভিতরটার নাই কি? যদি থাকে ত'—সব অদল-বদলের ভিতর দিয়া সেই সূত্রটি বহাল রাখা যায় কি করিয়া? সেই সূত্রটি বহাল রাখিতে না পারিলে আমার সবই খেই-হারা এলোমেলো হইয়া যায় বলিয়াই, সেই সূত্রটিকে আমার চাপিয়া ধরার চেষ্টা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এটাও একটা গুরুগম্ভীর গোছের জেরা। সূত্রের সূক্ষ্ম-সঞ্চার ও নিগূঢ় সংস্থান খুঁজিতে খুঁজিতে দর্শন বেচারির ত' দৃষ্টিলোপ হ'বার উপক্রম হইয়াছে। বেদ-বেদান্ত খুঁজিয়া ইহার অন্ত পাইল না। দর্শন-শাস্ত্রের আখেড়াগুলিতে এর অন্ত পাওয়া দূরে থাকুক, চিহ্নই পাওয়া গেল না। চাঁদে যেমন কোন কোন জ্যোতিষী জল, বাতাস এবং প্রাণের একটুখানি চিহ্ন পাইয়াছেন বলিয়া আশা করিতেছেন, কিন্তু তাঁদের দলের আর কাহাকেও সে চিহ্ন দেখাইতে অথবা বিশ্বাস করাইতে অপারগ হইতেছেন, সেইরকম ধারা বিশ্বভুবনে

ওতপ্রোত, অন্বিত যেটি সূত্রাত্মা, সেটিকে কেহ কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া দাবী উপস্থিত করিলেও, সে দাবী সর্ববাদিসম্মতিক্রমে আজ পর্যন্ত গ্রাহ্য হইতেছে না। সেই কোন্ মান্ধাতার যুগে দার্শনিকদের কুস্তির আখড়ায় এইটা লইয়া বাহ্বাস্ফোট সুরু হইয়াছে, এখনও তার বিরাম হয় নাই। আমাদের কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল। যে সূক্ষ্ম সূত্রটির কথা আমাদের বুঝাইতে চাহিয়া উপনিষদের ঋষিরা "বালাগ্রশতভাগ," "নিশিত ক্ষুরধারা" এই সবের উপমা দিতেন, বিবাদের জটলায় সেটার সত্যকার খোঁজ লইতেই যেন আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এই জগৎটা কি একটা ক্ষণভঙ্গুর প্রবাহ, অথবা এর ভিতরে নিত্য বলিয়া, শাশ্বত বলিয়া, একটা কিছু আছে? যে অশেষ বৈচিত্র্য দেখিতে পাইতেছি, তারা কি সত্য সত্যই আলাদা আলাদা, কেউ কারুর তোয়াক্কা রাখে না, অথবা তাহাদের সকলের মধ্যে কোনও রকম ধারা একটা কিছু নিগূঢ় ঐক্য ও মিল আছে?—এই যে চিরন্তন প্রশ্ন, ইহা যেন একটা দুর্ভেদ্য দুর্গের মত তার সিংহদ্বার রুদ্ধ করিয়া মানুষের যুগ-দেশায়ত চিন্তার ময়দানে দাঁড়াইয়া আছে। আমরা এ পর্যন্ত এ দুর্গের পরিখা পার হওয়ার কোনও উপায় করিয়া উঠিতে পারি নাই। দূরে দাঁড়াইয়া শুধু বৃথাই আস্ফালন করিতেছি—ভাবিতেছি শুধু মুখেরই আড়ম্বরে কেল্লা ফতে হইয়া যাইবে। ঐ দূরে কত বিচার তর্কের ছাউনি পড়িয়া গিয়াছে, কতই না বিবাদমল্লদের কুচ্‌কাওয়াজ ও কস্‌রত চলিতেছে।

আমরা আগেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, এযুগে দর্শনের তেমন জাঁক না থাকিলেও বিজ্ঞানের যথেষ্ট জাঁক আছে। বিজ্ঞানের কারবার ঘটনা আর তার কারণকূট লইয়া। কিন্তু কারবার তার যা'ই লইয়া হ'ক না কেন, সেও ক্ষরের মধ্যে অক্ষর বস্তুটিকে, বহু বিচিত্রের ভিতরে এক অন্বিত সামগ্রীটিকে অন্বেষণ করিয়া চলিয়াছে। দর্শনের রাস্তা আলাদা, বিজ্ঞানের রাস্তা আলাদা। রাস্তা আলাদা হইলেও কিন্তু অন্বেষণের বস্তু একই। অন্বেষণের ক্ষেত্রও আলাদা, এ কথা আজকালকার দিনে না বলাই ভাল। এখন, যে দুর্গটির কথা আমরা আগে বলিতেছিলাম, সে দুর্গের একটা নক্সা তৈয়ারি করার চেষ্টা বিজ্ঞান দস্তুরমত করিয়া আসিতেছে বটে। এ কথাও ঠিক যে, বিচার তর্কের ছাউনীগুলি হইতে যে সব ফাঁকা আওয়াজ বাহির হইয়া আসিতেছে, সে সব ফাঁকা আওয়াজে চিরন্তন বিশ্বসমস্যার দুর্গটি যে ধূলিসাৎ হইবে না, এটা বিজ্ঞান ভালমতেই জানেন। তাই দেখি বিজ্ঞানের ছাউনিগুলিতে শুধু ফাঁকা আওয়াজ নয়, সত্য সত্যই কতকগুলি তোপ বসাইবার ও দাগিবার ব্যবস্থা চলিয়াছে। দুর্গের গায় অনেক বৈজ্ঞানিক থিওরির তোপ দাগাও হইয়াছে সন্দেহ নাই। তার ফলে সে দুর্গের বনিয়াদ কাঁপিয়াছে কি না, ভিত্ ফাটিয়াছে কি না, তা দুর্গরক্ষকেরাই বলিতে পারেন। কিন্তু বাহির হইতে বালি চূর্ণটুকুও খসিয়া পড়ার কোনও লক্ষণ ত' দেখা যাইতেছে না। বিজ্ঞানের তোপ দাগা কি আসলে হাউই বাজী? হাউই কত দর্পে জ্বলিয়া উপরের দিকে উঠিয়া যায়,

কিন্তু পড়ার সময় সে একটা অন্তঃসারহীন তুচ্ছ একটা কিছু হইয়া পড়িতেছে। হয়তো আকাশে ছাই ভস্ম হইয়া উড়িয়াই গেল। মানবীয় সভ্যতা ও সাধনার যেগুলি মূল সমস্যা, তাদের সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের প্রাণান্ত পরিশ্রম কতদূর সফল হইয়াছে বা না হইয়াছে, তা আমাদের ধীরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। এ কথা অস্বীকার করা চলিবে না যে, বিজ্ঞানের কয়টা মোটা মোটা সিদ্ধান্ত এ পর্যন্ত সমস্যা সমাধানের পক্ষে সাধক ততটা হইতে পারে নাই, যতটা না তারা বাধক হইয়াছে। বিজ্ঞানের সেই বাধকতা তিনটি দিক্ দিয়া হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। প্রথম, বিজ্ঞান ভূতের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া এ বিশ্বে ভূত ছাড়া এতদিন আর কিছু দেখিতে পায় নাই। যিনি ভূতনাথ, ভূতনায়ক, তাঁর কোনও পাত্তা পায় নাই। বিজ্ঞানের এই সর্বগ্রাসী ভূতবাদ বা জড়বাদ তাকে এই বিশ্ব-ব্যবস্থার যেটি কেন্দ্র, সেটি হইতে এতদিন পরাঙ্মুখ করিয়া রাখিয়াছে। দ্বিতীয়, জড়ের ভিতরে যে বাধ্যতার নাগপাশ বিজ্ঞান দেখিয়াছে, সেই নাগপাশেই সে আপনাকে ও বিশ্বকে বাঁধিতে চাহিয়াছে। বিশ্বের কেন্দ্রে যে আনন্দের উৎস, বিশ্বের ছোটবড় প্রতি উৎসব আসরে যে লীলা-নটীর স্বচ্ছন্দ গতি, সেই আনন্দ আর সেই লীলাকে বিজ্ঞান এতদিন অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে। তার কারখানার যন্ত্রটির মত এই বিশ্বটাও একটা বিরাট্ যন্ত্র আর মানুষ সেই বিরাট্ যন্ত্রের একটা অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ। অথচ, অণুদের আসরেও ইলেক্‌ট্রণদের নৃত্য কি শুধুই ছন্দোবদ্ধ, সাবলীল নয়? তৃতীয়, বিজ্ঞান এই বিশ্বের ভিতরে নিত্য এবং অভিন্ন বস্তুটিকে খুঁজিয়াছে এবং তার একরকম চেহারা সে ধরিতেও পারিয়াছে বটে। কিন্তু সেই নিত্য অভিন্ন সামগ্রীটি ত' রস নয়, যে রসকে ঋষিরা ভূমা বলিয়া জানিয়াছিলেন; সে বস্তুটি ত' আত্মা নয়, যেটাকে লক্ষ্য করিয়া আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন—"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।" বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এতদিন মূল অভিন্ন বস্তুটি হয় জড়ই ছিল, অথবা অজ্ঞাত, অজ্ঞেয় কোনও একটা তত্ত্ব ছিল। হালে দেখিতেছি, জড় ধীরে ধীরে শক্তি-বিগ্রহ ধারণ করিতেছেন। এটা কতদূর আশার কথা তা আপাততঃ ভাবিয়া দেখার দরকার নাই। যদি শক্তি-বিগ্রহ ধারণ করার ফলে জড়ের জড়ত্ব কিছুটা অপগত হওয়ার সম্ভাবনা হইয়া থাকে, তবে সত্য সত্যই আশার কথা। জড় যতদিন জড়, ততদিন জড় ও আত্মার ভিতরে যোগের সেই নিগূঢ় সূত্রটি আমরা সহজে খুঁজিয়া পাই না। দর্শনও পান নাই, বিজ্ঞানও পান নাই। ডেকার্টের শিষ্যেরা জড় আর চৈতন্যকে তেল আর জলের মত কিছুতেই মিশ খাইতে দিতেন না। বিজ্ঞানও দেখিয়াছি অনেকদিন পর্যন্ত এই 'ইস্যু'র কোনও কিনারা করিতে পারেন নাই। নানা রকমের অছিলায় ইস্যুটিকে ধামা চাপা দিয়া রাখিতে হইয়াছিল। এখন জড়ের শক্তি রূপ ধারণের ফলে মামলা সম্ভবতঃ অনেকটা সোজা হইয়া আসিতেছে। আমিও যা আর ঐ পাথরটাও তাই, এটা ভাবিতে মনে বাধে। কিন্তু যদি মনে করা যায়, একটা

সূক্ষ্ম তৈজস শক্তি ঐ পাথরটা হইয়া ওখানে রহিয়াছে, আর পাথররূপে আমার কাছে নিজেকে জাহির করিতেছে, তবে সেই শক্তিটার সাথে আত্মীয়তা পাতাইতে তেমন-ধারা বাধে না। এইজন্য মনে হয়, বিজ্ঞান জড় ছাড়িয়া শক্তি লইয়া কারবার সুরু করাতে তার সঙ্গে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের লেন-দেন করার পথ অনেকটা সুগম হইয়া যাইতেছে। এতদিন জড়-বিদ্যা হয় অধ্যাত্ম-বিদ্যার উপর চড়াও হইতেন, তার দোকানের মাল জোর করিয়া কাড়িয়া আনিয়া আপন গুদামজাত করিতেন, নয় ত' তাকে আমলেই আনিতেন না, বয়কট্ করিতেন। এইরকম ধারা পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা পরস্পরকে বয়কট্ করিয়া অনেকদিন পর্যন্ত নিজেদের কারবার চালাইয়াছে। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেকেই অপরা-বিদ্যার দোকানেই সওদা করিতে যাইতেন, পরাবিদ্যার দিকে হাঁটিতেও চাহিতেন না। কেহ কেহ অপরাবিদ্যার নিয়মিত খরিদ্দার হইলেও পরাবিদ্যার দোকানে অবসরমত এক আধবার উঁকি ঝুঁকি মারিয়া আসিতেন, হয়ত দোকানদার ডাকিয়া বসাইলে, এক আধ ছিলিম তামাক পোড়াইয়া আসিতেও দ্বিধা করিতেন না। অনেকে আবার দস্তুরমত উভচরই হইতেন। যুক্তির শ্যাম আর বিশ্বাসের কূল, এ দুইই রক্ষা করা কোন কালেই সহজ নয়, কিন্তু তবুও কেউ কেউ সে পক্ষে চেষ্টা করিয়া দেখিতেন। এইজন্য বড় বড় জাঁদরেল বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও ভগবানে বিশ্বাসী, পরলোকে বিশ্বাসী, এমন কি বাইবেলেও বিশ্বাসী দুই চারিজন দেখা গিয়াছে।

মোটের উপর আমরা বিজ্ঞানসেবীদিগকে চারিটি কোঠায় ফেলিতে পারি। প্রথম, যাঁরা জড়েই বিশ্বাস করেন, আর জড়ের নিয়মেই বিশ্বাস করেন; জড়াতীত এবং জড়ের নিয়মবহির্ভূত কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। দ্বিতীয়, যাঁরা বলেন জড়াতীত একটা কিছু থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু সেটাকে জানার পথ আমাদের কাছে চিররুদ্ধ। তৃতীয়, যাঁরা বলেন জড় আর তার নিয়ম যেমন-ধারা রহিয়াছে, তেমনি-ধারা জড়াতীত তত্ত্ব এবং তার নিজস্ব প্রকৃতি একটা রহিয়াছে। জড়ও যেমন সত্য, জড়াতীতও তেমনি সত্য। জড়ের শাসন জড়ের রাজ্যেই চলিবে, তার বাহিরে চলিবে না। ভগবান্, অবিনশ্বর আত্মা, পরলোক এ সব থাকিতে কোনই বাধা নাই। বিজ্ঞানের বাহালি উপায়ে এ সব জানিতে পারা যায় নাই বলিয়া এরা আদপে নেই, এমন মনে করা চলিবে না। বিশ্বাস করিতে বাধা নাই এবং অন্য উপায়ে জানাতেও দোষ নেই। চতুর্থ, যাঁরা বলেন বিজ্ঞান তার সমীক্ষা পরীক্ষা দ্বারা ঠিক যতটুকু জানিয়াছে ততটুকু সম্বন্ধেই তার কথা কওয়ার এক্তার আছে। তার বাহিরে কি আছে না আছে সে সম্বন্ধে কল্পনা-জল্পনার লাগামের রাশ যথাসম্ভব টানিয়া রাখাই ভাল। যেটা এখন জানিতে পারিতেছি না, সেটাকে অজানা বলাই ভাল, অজ্ঞেয় বলা সঙ্গত নয়। এইজন্য বৈজ্ঞানিককে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে, তাঁর আয়তনের গবাক্ষদ্বারগুলি উন্মুক্ত করিয়া নূতন যা কিছু

আলোক তাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য, তা আসুক না কেন সে আলোক দেখা-শোনার পরপার হইতে। অন্ধ গোঁড়ামী একান্তভাবেই বর্জনীয়। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর হাতের মুঠায় যে রজত-খণ্ড পাইয়াছেন ভাবিতেছেন, সেটা সত্য সত্যই তাই কিনা, অথবা সেটা শুধু শুক্তিমাত্র, তা যাচাই করিয়া লইবার জন্য তাঁকে নিয়ত সজাগ ও সতর্ক রহিতে হইবে। প্রকৃতির বিরাট্ ঝোলায় হাত ভরিয়া দিয়া বৈজ্ঞানিক যাহা কিছু মুঠায় লইয়া আসেন, তাহাই চাঁদি না হইতে পারে, সেটা মেকি হওয়ারও আশঙ্কা আছে। শুধু ও-পারের আলোকেই যে আলেয়া হইতে হইবে এমন নয়, এ-পারের আলোও আলেয়া হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক যেটাকে তথ্য বা "ফ্যাক্ট্" বলেন, সেটা সম্বন্ধেও এই কথা, আর যেটাকে বিধি বা "প্রিন্সিপল্" বলেন, সে সম্বন্ধেও এই কথা। এখন, এই যে চা'র শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আমরা পাইতেছি, তাদের মধ্যে কাদের ভিতর সত্যনিষ্ঠারূপ খাঁটি বৈজ্ঞানিকতাটুকু বেশী রহিয়াছে মনে করিব? এই চতুর্থ শ্রেণীদের নয় কি? এখনও দেখিতেছি ঐ চার ক্লাসের কোন ক্লাসেই বেঞ্চি খালি পড়িয়া নেই। কিন্তু বর্তমান যুগের হিসাবে এদের মধ্যে সর্বোন্নত ক্লাস কোন্‌টি? বিগত শতাব্দীর বিজ্ঞানের দম্ভের আর অন্ত ছিল না। যে বিশ্ব-বেড়াজালের কথা আমরা আগেকার লেখায় বলিয়াছি, সে জালের বহর ও বুনানি সম্বন্ধে এতটুকুখানি সন্দেহ তিনি মনে পোষণ করিতে দিতেন না। জাল ত তৈয়ারি, ক্ষেপে ক্ষেপে জাল ফেলিয়া, ঝাঁকে ঝাঁকে নূতন নূতন ফ্যাকট্ তুলিয়া বজ্‌রা বোঝাই করিতে পারিলেই হয়। প্রিন্সিপল্ সম্বন্ধে কোন গোল তাঁর মনে বড় একটা ঠাঁই পাইত না। নূতন নূতন ক্ষেত্রে সেই প্রিন্সিপল্‌গুলির প্রয়োগ স্বচ্ছন্দে নির্বিবাদে চলিবে, এইটাই ছিল তাঁহার আশা। ঈথার রহিয়াছে, ম্যাটার রহিয়াছে, দেশ কাল রহিয়াছে। আর এদের কতকগুলি ধরা-বাঁধা নিয়ম রহিয়াছে। বস্—এই বুড়া শয়তান বিশ্বটাকে কায়দার মধ্যে আনিতে আর কি চাই? কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে কে যেন নূতন করিয়া বিজ্ঞানের চক্ষে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা বুলাইয়া দিয়াছে। আমরা "বেদ ও বিজ্ঞানে" নব্য বিজ্ঞানের গুরু-পরিচয় লইবার একটুখানি চেষ্টা করিয়াছি। যাই হ'ক—গত যুগের অনেক রঙীন বুদ্বুদ্ আজ দেখিতেছি নব্যবিজ্ঞানের সূচীস্পর্শে ফুটা হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে। এখন দেখিতেছি, তাদের গর্ভে খানিকটা হাওয়া পোরা ছিল। ঈথারের সত্তা, খোদ জড়ের সত্তা, এমন কি, দেশ কালের সত্তাও, বেজায় হাল্‌কা হইয়া পড়িতেছে। বোধহয়, এইবার বিদ্যার নামে অবিদ্যার একটা বিরাট্ ভেল্কিবাজি ভাঙ্গিয়া যাইবে। এতদিন এই ভেল্কিবাজিতে আমাদের প্রায় সকলেরই চোখে ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছিল, বুদ্ধি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যেখানে স্থির সত্যের খোঁজ করা আবশ্যক এবং যেখানে খোঁজ করিলে তার সন্ধান অবশ্যই মিলিতে পারে, সেখানে খোঁজ ছাড়িয়া

দিয়া এত দিন আমরা অকারণ এখানে সেখানে ছুটাছুটি করিয়া হয়রাণ হইয়াছি। সেই সোনার পালঙ্কে শোয়া রাজকন্যার পাশেই যে জীওন-কাঠি পড়িয়া আছে, সেটাকে দেখিতে না পাইয়া, আমরা মিছে বাহিরে ঘুরিয়া মরিয়াছি। বিজ্ঞান এতদিন আত্মাকে আর আত্মার মর্ম্মমুখী দৃষ্টিকে অবিশ্বাস করিয়া আসিতেছিল। তার ছিল ভূতেই অচলা ভক্তি। এখনও বোধহয়, আত্মার পানে আর আত্মার গভীর পরতে পরতে যে সত্য প্রত্যয়ের অসন্দিগ্ধ খনি রহিয়াছে, তার পানে বিজ্ঞানের দৃষ্টি সুস্থির হইয়া ফিরে নাই। ফেরার উপক্রম হইতেছে মাত্র। নব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান নানা দিকে নানা প্রমাণ চয়ন করিয়া আনিয়া এই মোড় ফেরার সূচনা করিয়া দিতেছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের ভিতরে কেহ কেহ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অনুশীলনের প্রসাদে বিজ্ঞানের এতদিনকার দৃষ্টি-কার্পণ্য ও বুদ্ধি-সঙ্কোচ দূর করিয়া দিতে যত্ন করিতেছেন। সাধারণের জ্ঞান-বিশ্বাসের বুকে কিন্তু বাতিল বিজ্ঞানের সেই অন্ধ সংস্কৃতিগুলি এখন পর্যন্ত একটা গুরুভার জাঁতার মত চাপিয়া বসিয়া আছে। সাধারণের অঙ্গীকারে এখনও সেই পরাহত বিদ্যার দম্ভ এবং গোঁড়ামি বজায় রহিয়া গিয়াছে। অথচ এই দম্ভ আর গোঁড়ামি না ঘুচিলে ত' গোড়ার গোলই মিটিবার আশা দেখিতেছি না।

আমরা বিজ্ঞানকে লইয়া একটুখানি নাড়াচাড়া করিলাম, কিন্তু দর্শনকে বড় বেশি ঘাঁটাইলাম না। দর্শনের চতুষ্পাঠী যদি ডিবেটিং ক্লাব হয় তবে সে ক্লাবের মেম্বর হইয়া বড় একটা কিছু আদায় করিতে পারিব, এমন ভরসা আমাদের নাই। আমরা সমস্যাদুর্গের চারিধারে কোন কোন ছাউনি হইতে গণ্ডগোল ও ফাঁকা আওয়াজ আগেই লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু তাতে কাণ দেওয়ার তেমন আবশ্যকতা আছে মনে করি নাই। আজকাল অনেকে দর্শন শাস্ত্রটাকেই "বুড়া মানুষের বাচালতা" এই অজুহাতে "গো টু হেল্" করিয়া দিতেছে। আমরা অবশ্য সে দলের নই। প্রকৃত দর্শনের দাম আছে, এবং সম্মানও তার চিরদিন প্রাপ্য। কিন্তু বিজ্ঞানের দিকেই আমাদের বেশি পক্ষপাত করিতে হইল, কেন না সবাই বিজ্ঞানের দোহাই দিতেছে। যে বলে ঈশ্বর নাই, সে ঈশ্বরে দখল খারিজ করার পরওয়ানা না কি বিজ্ঞানেরই কাছে আদায় করিয়াছে। যে বলে পরলোক নাই, মৃত্যুর পর ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার নাই, এমন কি দেহাতিরিক্ত আত্মাও নাই, সেও না কি তার দলিলে বিজ্ঞানকে ইসাদি করিতে পারার দাবী করিতেছে। সত্য আর বিজ্ঞান, এ দুইটা সমান ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। এই বিজ্ঞান-পৌত্তলিকতার যুগে অনেক কিছু সত্য হইলেও, শ্রেয় এবং সুন্দর হইলেও, অপরীক্ষক অনুদার বিচারকের হাড়িকাঠে বলিদান হইয়া যাইতেছে। আমরা সভ্যতা ও কাল্চারের একটা সত্য লক্ষণ নিরূপণ করিতে চাহিতেছি। গোড়ায় কতকগুলি মূল সূত্র স্থির করিয়া না লইলে, নিরূপণ যাকে বলে তা হয় না। যদি ভগবান না থাকেন, পরলোক না থাকে, এ বিশ্বচক্র

ধর্মের শাসনে না চলে, মানুষের অবিনাশী আত্মার কথা বাদ দিয়া তার ভঙ্গুর দেহটার কথা ভাবিলেই যদি চলে, তবে অবশ্য মানুষের সভ্যতা ও কালচারের ভিত্তি একভাবে গঠিত হইবে। কিন্তু মানুষের ধর্মবিশ্বাস, অলৌকিক এবং অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস—এ সবে যদি কোন সত্যতা অথবা মূল্যবত্তা থাকে, তবে আমরা সভ্যতা ও কালচার অপর একটা ভিত্তির উপর গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিব। কোন্ ভিত্তিটা সত্য ভিত্তি, কোন্ ভিত্তির উপর সভ্যতার আয়তন গড়িয়া তুলিলে সেটা মঙ্গলের শ্রীনিকেতন হইবে, সেটা এই দারুণ বিষম সমস্যার দিনে নানা বিপ্লবের মুখে আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত হইবে না কি? ভারতবর্ষ একভাবে ভিত্তি-পত্তন করিয়াছিল, বর্তমানে রাশিয়া প্রভৃতি দেশ দেখিতেছি, অন্যভাবে ভিত্তি-পত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। এ অবস্থায় আমরা গোড়ায় সংশয় অপনোদনের একটা উপায় না করিয়া এই অবশ্যম্ভাবী ভাঙ্গন গড়নের কাজে লাগিয়া যাই কি করিয়া?

সেই পুরানো আর্যযুগের একটা গল্প আবার মনে পড়িয়া গেল। ইন্দ্র দেবতাদের রাজা, আর বিরোচন দৈত্যদের রাজা—দুজনেই একদিন এক অপহতপাপ্মা, বিরজা, বিমৃত্যু, বিশোক বস্তুকে পাবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। প্রজাপতির কাছে প্রপন্ন হইলেন দুজনেই। ব্রহ্মচর্যও করিতে হইল। তারপর, প্রজাপতির উপদেশে এক উদশরাবে তাঁরা নিজেদের ছায়ামূর্তি দেখিলেন। নিজেদের কায়াটাও দেখিলেন। প্রজাপতি বলিলেন—তোমরা সেই বস্তুটিকে জানিয়াছ, ফিরিয়া যাও। বিরোচন সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিলেন—ছায়াকেই কায়া বুঝিয়া, দেহকে, জড়কেই আত্মা বুঝিয়া ফিরিলেন। ইন্দ্র সংশয় লইয়া ফিরিলেন, কাজেই, আবার তাঁকে প্রজাপতির কাছে ধর্ণা দিতে হইল। তিনি সত্যকার কায়াটিকে না দেখিয়া ছাড়িলেন না। এই হইতে দৈবীদৃষ্টি ও দৈবীসম্পৎ, আর আসুরীদৃষ্টি ও আসুরীসম্পৎ বিভিন্ন ধারায় চলিয়া আসিতেছে। মানুষের ইতিহাসেও। ব্যক্তির ভিতরেও বটে, সমষ্টির ভিতরেও বটে। ভারতবর্ষ ধারা দুটিকে আলাদা রাখিতে যত্ন করিয়াছিল, গুলাইয়া যাইতে দেয় নাই। তার সভ্যতা ও সাধনার পেছনে কোন্ ধারাটির প্রেরণা বলবতী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়? আর, বর্তমান যুগে ধর্ম, পরকাল, ঋতের পন্থা প্রায় এড়াইয়া চলিয়া যে সভ্যতা ও সাধনার অনুশীলন ও অনুসরণ চলিতেছে, তার পেছনেই বা কোন্‌টা বলবতী বলিয়া মনে হয়? ইন্দ্রের অধিকার চলিয়াছে, না বিরোচনের? ভারতের যা দুর্গতি, সেটা ইন্দ্রের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াই, না, সে অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া? বর্তমান পাশ্চাত্যের যেটা সিদ্ধি-ঋদ্ধি, তার পেছনে অবশ্য তপস্যা রহিয়াছে। কিন্তু কে তপস্যা করিতেছে—ইন্দ্র না বিরোচন? এক বিরজা, বিমৃত্যু, বিশোক বস্তুকে পাবার জন্যই এ তপস্যা, সন্দেহ নাই। কিন্তু, ঋতস্য পন্থা অথবা অনৃতস্য পন্থা আশ্রয় করিয়া? বিরোচনের বংশে বলী জন্মিবেন,

কিন্তু তাঁকে বলি বা ত্যাগের দ্বারাই বলী হইতে হইবে। যে বলের দ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায়, সে বল এই বল। কালে হয়ত দৈত্যকুলে কুলপাবন প্রহ্লাদও জন্মিবেন। তখন সেই বিরজা বস্তুটির সন্ধান মিলিবে। তার আর কত বিলম্ব? ধরিত্রী ভারাক্রান্ত হইয়া বলিতেছে—কত বিলম্ব ?

বিজ্ঞান না প্রজ্ঞান?

বিজ্ঞানের যুগ চলিয়াছে—এ কথাটা আমরা অনেকেই মুখে আওড়াইয়া যাইতেছি। সজ্ঞানে আওড়াইতেছি, না বাতিকে আওড়াইতেছি, সেটা ভাবিয়া দেখা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। সকল জাতিই যেমন ধারা নিজের নিজের আভিজাত্যের যখন তখন মুখে জাহির না করিলেও অন্ততঃ অন্তরে পোষণ করে, সকল যুগকেই তেম্‌নি ধারা নিজের নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভে সব সময় ফুলিয়া থাকিতে দেখা যায় নাই বটে; কিন্তু কোন দুর্বিনীত যুগের অভিমান যে অতিকায় হইয়া অতীতের বিগত গৌরবকে অবজ্ঞা করিয়াছে, আর ভবিষ্যতের অনাগত অভ্যুদয়কে উপেক্ষা করিয়াছে, এটা অস্বীকার করিবে কে? একটা অতীত স্বর্ণযুগ বা সত্যযুগের স্বপ্ন, একটা আদিম ঋদ্ধি ও সৌষ্ঠব হইতে পতনের সংস্কার, সকল দেশেরই প্রাচীন ঐতিহ্য তার বুকে ধরিয়া আসিয়াছে। মানুষের স্মৃতির যাদুঘরে ভাঙ্গা পাথর, কঙ্কাল, আর বাতিল আসবাবপত্রের কুঠুরীই হয় ত' বেশী; কিন্তু দু'চারিটা মণিকোঠাও যে নেই এমন নয়। আর সে সব মণিকোঠায় মানুষের ঐতিহ্য এমন কোন কোন সামগ্রী হয় ত' সাজাইয়া রাখিয়াছে, যার শ্রী আর সৌষ্ঠব, যার মূল্যবত্তার প্রতি বর্তমানের গর্বিত দৃষ্টি স্পর্ধা দেখাইলে, সে অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। বর্তমান যুগ সমালোচক ও পরীক্ষক সাজিয়া সে-সব মণিকোঠার দুয়ারে আসিয়া হাজির হইলে তাকে ভিতরে ঢোকার ছাড়পত্র পাইতে বেগ পাইতে হয়। দেবমন্দিরের মতন শ্রদ্ধার পট্টবাস পরিয়া, নিষ্ঠার শুচিতা লইয়া সে-সব কোঠায় প্রবেশ করাই হইল প্রাচীন দস্তুর। হয় ত' সে মণিকোঠায় সেই ঈজিপ্টের পিরামিড-কক্ষ-নিহিত কোন এক বিস্মৃত অতীতের রাজরাজেশ্বরের মমিই রহিয়াছে। কিন্তু মরণ সেখানে এতটা সম্মান, এতটা ঐশ্বর্যের দ্বারা মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে, যতটা সম্মান, যতটা ঐশ্বর্য জীবনের কামনার সকল সীমা হয়ত ছাড়াইয়া গিয়াছে। একটা দীর্ঘায়ত অতীত যুগ তার শ্রদ্ধার মৌন তপস্যার বক্ষঃপঞ্জরের মাঝখানে যেন সেটাকে অজর, অক্ষয় করিয়া রাখার যত্ন করিয়া আসিতেছে। বর্তমান যুগ যে আজ শাবল দিয়া তার বক্ষঃপঞ্জর ফুঁড়িয়া তার যুগ যুগান্তরের জমাট বাঁধা মৌন রহস্য ভাঙ্গিয়া দিতেছে, তার রত্নপালঙ্কে শত শত পুরাকল্পের পূজারিণীর স্তব্ধ চামর-ব্যজনের তলে সুখশায়িত মণিকে নির্মম, নিষ্ঠুর, শ্রদ্ধাহীন স্পর্শে টানিয়া তুলিতেছে, তাতে, যারা—যে সব অতীত যুগাত্মা—এতদিন পাহারা দিয়া আসিতেছে, তারা নিশ্চয়ই নির্বিকার, নিরুদ্বেগ থাকিতে পারে নাই। আপন পিতৃপুরুষদের সমাধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া শব বাহির করিয়া তাতে ছুরি চালাইতে দিতে, কঙ্কাল তুলিয়া তাতে করাত চালাইতে দিতে, প্রসন্ন মুখে রাজি কেহই কোনদিন হইতে পারে নাই।

জবরদস্ত বর্তমানের অনেক জুলুম অবশ্য যাদুঘরের রক্ষীদিগকে সহিতে হইয়াছে। হালের কৌতুহলই শুধু যে গবাক্ষের ফুটা-ফাটা দিয়া যাদুঘরের সে সব কোঠার ভিতরে তাকাইয়া বিদ্রূপমাখা উপহাসের হাসি হাসিতেছে, এমন নয়; হালের পণ্ডিতীর অভিমানও চড়াও হইয়া তাদের ঘুণে-ধরা জীর্ণ দুয়ারগুলো ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে—রক্ষীদের যক্ষের ধন আগ্‌লানর বাধা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে; অনম্র, অদরদী হস্তে সে ভাণ্ডারের সব কিছু নাড়াচাড়া টানা হেঁচড়া করিয়াছে। যে সব অতীতের সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব শুধু কোনমতে তাদের রূপটি, রূপের বর্ণ ও রেখাবিন্যাসগুলি বজায় রাখিয়াছিল, কিন্তু তাদের "বস্তু"টিকে শিথিল হইতে দিয়াছিল, সে সমস্ত তার অদরদী স্পর্শে হয় ত' অনেক ভাঙ্গিয়া-চুরিয়াও গিয়াছে—একখানা খুব পুরানো কাগজ বা কাপড়ের ওপর খুব সুন্দর একটা ছবি বা নক্সার মতন। বর্তমানের অশ্রদ্ধার স্পর্শ এটা ভুলিয়া গিয়াছিল যে ঐ রূপটাই যে আসল বস্তু—কাগজ বা কাপড়খানা, যার উপর সে রূপটা ফলাইয়া তোলা হইয়াছিল, সেটা ত' আসল নয়;—অমন একখানা কাগজ বা কাপড় নষ্ট হইলে আবার মিলিবে; কিন্তু তার ওপর ফলান যে রূপের আদর্শ, যে সুষমার স্বপ্ন আজ ভাঙ্গিয়া গেল, বর্তমানের শত সাধনা আর ভবিষ্যতের সকল সিদ্ধি ও হয় ত' সেটাকে আর ফিরাইয়া দিতে পারিবে না। মানবীয় অনুভূতি ও উপভোগের সমগ্রতাও পূর্ণ আয়োজনে এমন অঙ্গহানি হয়ত' হইল, যার পুরণ কোন মতেই আর হইয়া উঠিবে না। আজকাল অনেক শিল্পসৌষ্ঠবের ফটো রাখিয়া হয়ত' তাদের আমরা ভাঙ্গিতেছি। তাতে কোন কোনও ক্ষেত্রে আসল বজায় রহিয়াই গেল ভাবিতেছি। হয় ত' কতক বজায় রহিতেছে ও। নড়া দাঁত তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া নকল দাঁতের পাটিতে ও কাজ চলে বটে, কিন্তু হাতখানা কাটিয়া কাঠের হাত লাগাইয়া কাজ চলে না। অঙ্গুলি উরগক্ষত হইলে কাটিয়া ফেলাই সুব্যবস্থা। কিন্তু সত্যকার প্রয়োজনের তাগিদে নয়, কেবল শ্রদ্ধার কুণ্ঠাও দরদের কার্পণ্যের দরুণ যদি পুরাতন মণিকোঠার বেদীতলে কোন সত্য আদর্শের স্থির সমাধি, অথবা কোন রূপ দক্ষ কল্প পুরুষের সৃষ্টির মঞ্জু স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিই, তবে মানুষের চিরবরণীয়, চির আদরণীয় সম্পদের ভাণ্ডারকেই মূল্যমাত্রায় অকারণ রিক্ত করিয়া দেওয়া হইল না কি? অতীতের সাধনার পরখ, তার সত্যতা ও মূল্যবত্তার যাচাই, কি রাসায়নিকের বিশ্লেষণে হইবে? দ্রাবকে না গালাইলে, ভাঙ্গিয়া কুটিয়া না ফেলিলে কি তার পরখ হয় না? জীবনকে মারিয়া তার নিদান মেলে না; রূপকে, আদর্শকে, প্রাণকে কুটিয়া গুঁড়ো করিয়াও তাদের নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করা যায় না, তাদের অবগুণ্ঠিত সত্য মূর্তিটিকে ফোটাইয়া তোলা যায় না।

বর্তমান যুগ যে একটা কালাপাহাড়ী হস্ত উদ্যত করিয়া অতীতের দেবমন্দিরগুলোর পানে চলিয়াছে, তার কারণ—সে সব দেবতায় তার আর বিশ্বাস নাই। তার বিচার

বিশ্বাস যেটাকে মিথ্যা বলিয়া বর্জন করিয়াছে, সেটার প্রতি কোনরূপ মমতা বা দরদ তার না হওয়াই স্বাভাবিক। যে অতীতের শব আজ তার দৃষ্টিতে শিব নহে, শব মাত্র, এমন কি, গলিত, পুতিগন্ধময় শবমাত্র, সেটাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকায় আজ তার কৃতার্থম্মন্যতা নাই। জীবন মৃত্যু নয় বলিয়াই, সে মৃতের স্পর্শ হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া লইতেছে। ইহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। জীবিতের কাছে মৃত অশুচিই রহিবে। যাদুঘরের পুরাতন রক্ষীরা যেটাকে তাদের মণিকোঠা বলিয়া সযত্নে পাহারা দেয়, সেটা সাচ্চা জহরতের কোঠা না হইয়া যদি ঝুঁটা রাবিশের ঘর হয়, এবং সে গুদাম পচা ও রদ্দি মালে ভর্তি করিয়া রাখার ফলে, কেবল খানিকটা ঠাঁই-এর অপব্যবহার নয়, লোকচিন্তা ও লোকব্যবহারের সমগ্র আয়তনের আবহাওয়াটাই দূষিত হইয়া পড়ার উপক্রম হয়, তবে তার দরজা জানালাগুলো খুলিয়া দিয়া, এমন কি আবশ্যক মত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াও, সেটাকে সাফ করার চেষ্টা কি সাধু চেষ্টা নয়? কোঠার ভিতর আদর করিয়া তুলিয়া রাখার মত জিনিষ হয়ত' কিছু রহিয়াছে, কিন্তু নির্মমভাবে ঝাঁটাইয়া ফেলার মত জঞ্জাল তার চাইতে ঢের বেশী জড়' হইয়া নাই কি? পূজারীর প্রবেশের আগে ঝাড়ুদার একবার সব আবর্জনা ঝাঁটাইয়া ফেলিলে ভাল হয় না কি? ঝাড়ুদার কাচ ভাবিয়া পরশ পাথর ও ঝাঁটাইয়া ফেলিলে ফেলিতে পারে—সে আশঙ্কা বিলক্ষণ আছে। এইজন্য বিজ্ঞ বিচক্ষণ জহুরির তদারকে সাফাই কাজটা হইলে ভাল হয়। কিন্তু মণিকোঠার দুয়ারে যারা প্রহরী, তারা যে পূজারী ও পূজার্থী ছাড়া আর সকলকেই "পঞ্চম", অস্পৃশ্য করিয়া দূরে রাখিতে চাহিয়াছে। কাজেই, নিদেনপক্ষে সত্যগ্রহের জুলুম করিয়াও ঢুকিয়া পড়ার দরকার পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে।

ঈজিপ্টের মমির কথা উঠিয়াছিল। আমাদের এদেশের মণিকোঠাটি ও ঐ রকম শবভাণ্ডারের মতন একটা কিছু? পুরাতন সভ্যতা ও সাধনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ও প্রতিরূপ যা-কিছু, সে-সব না কি ঐ মণিকোঠায় যত্নে তুলিয়া রাখা হইয়াছে। পাঁচ সাত হাজার বছরের আয়ু ভোগ করিয়াও সে সবের অনেক কিন্তু এখনও বাঁচিয়া আছে। কিন্তু মরার গাদায় চাপা পড়িয়া তারাও বুঝি মরার মতন। সত্যকার জীবন্ত ও চলন্তের সঙ্গে তাদের যোগ ততটা নাই, যতটা রহিয়াছে মৃত ও আড়ষ্টের সঙ্গে। যারা সত্যই জীবন্ত, তাদের মূলে সক্রিয়তার ও বিকাশের আনন্দ আছে বলিয়াই তারা জীবন্ত। আনন্দই সৃষ্টি-মহাপাদপের মূলে এবং শিরায় শিরায় সঞ্চরণশীল রস। বাঁচিয়া থাকিতে গেলে এই রস সঞ্চারের স্পষ্ট অথবা নিগূঢ় ধারাগুলোর সঙ্গে নিজের সংযোগের প্রণালী খোলা রাখিতে হইবে। আমাদের পুরাতন সভ্যতার যা কিছু এখনও ব্যক্তির ও সমষ্টির ভাবে, বেদনায়, কর্মে, ব্যবহারে বাঁচিয়া আছে, তাদের মূলে ও অবয়বে রসের যোগান বন্ধ হয় নাই নিশ্চয়। কিন্তু রস সঞ্চারের শিরা বা নাড়ীগুলি কিসের যেন বাধা পাইয়া আড়ষ্ট, সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। ভয় হয়, বুদ্ধি বা রসের চলাচল, স্বচ্ছন্দগতি বন্ধ হইয়া

গেল। প্রাণন ব্যাপারে যে ক্লেদ জন্মিতেছে, সে ক্লেদ বাহির না হইয়া ভিতরেই সঞ্চিত হইতেছে কি? যে অঙ্গে জীবনের সাবলীল সাড়া এখনও পাওয়া যাইতেছে, দুদিন বাদে হয়ত' তাতে পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিবে। এটা ভয়েরই কথা। মূলে রসের প্রাচুর্য রহিলে, ভয়ের ভিতরেও ভরসা থাকিতে পারে। কিন্তু মূল ছাড়িয়া আমরা যে শাখা লইয়া, ফল ফুল পাতা লইয়া বেজায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি! মূলের পরিচয় বোধ আজ আমাদের ভেতরে তেমন সজাগ নয়, তেমন স্পষ্ট নয়! কোন্‌টা সত্যকারের মূল, তাই বা কে জানে - এ সভ্যতাটির মূল কি বেদ? হয় ত' তাই। কিন্তু সে মূল সম্বন্ধে হালের পরিচয় ও ধারণা যে আমূল বদ্‌লাইয়া গিয়াছে।

প্রাচীনদের মণি কোঠায় ইহাই কিন্তু ছিল শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌। এই মাটিতে আর আর সব কিছুর মতন এর উদ্ভব হয় নাই। নীহারিকার পরপারে কোন্‌ অজানা কল্পলোকে নয়, আমাদের এই ব্যবহারিক জগতের সকল রকম অপূর্ণতা ও আপেক্ষিকতার ঊর্ধ্বে কোন্‌ সনাতন সত্যলোকে এর শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা। অজ্ঞানতিমিরান্ধ নরলোকের চক্ষে, দেখা শোনার পরপার হইতে হিরণ্যকেশ হিরণ্যবপুঃ কোন্‌ জ্যোতির্ময় পুরুষের ভাস্বর-অঙ্গুলি-ধৃত জ্ঞানাঞ্জনশলাকা যে এই বেদ! মণিকোঠার প্রহরী যারা, তারা যে তাকে পার্থিব মণি-মাণিক্য মনে করে নাই, ক্ষীরোদ সাগরে অনন্ত শেষ শয্যায় শয়ান ভগবানের বক্ষোভূষণ কৌস্তুভমণি বলিয়া জানিয়াছে। আজ রাসায়নিক তার পরীক্ষার আগুনে পোড়াইয়া, তার বিচারের দ্রাবকে গালাইয়া, সেটাকে কি সাব্যস্ত করিয়া ফেলিতেছে? এ নরলোকের সাচ্চা হীরাও ত' বিশ্লেষণে কয়লার বর্ণচোরা, ছদ্মবেশী সহোদর ভাই। কিন্তু মণিকোঠার ঐ কৌস্তুভমণি?—সেটাও নিতান্ত বাজে পাথরেরই একটা ঢেলা, স্ফটিকের নুড়ি? মিথ্যা সংস্কারের প্রসাধনে তাতে মিথ্যা জলুসের সৃষ্টি করার প্রভূত প্রয়াস হইয়াছে, কিন্তু সে সত্যকার হীরা কোন দিনই ছিল না বা হয় নাই। তাই কি? পাথরের নুড়িটি বিলেতী পণ্ডিতেরা আর তাঁদের দেশী সাক্‌রেদেরা বেশ করিয়া পিষিয়া গুঁড়ো করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁদের বেদিক কন্‌কর্ডান্স, বেদিক ইন্‌ডেক্স প্রভৃতিতে ঐ পুরাতন শক্ত, নিরেট নুড়িটি ধূলো হইয়া এক একটা পাহাড় সৃষ্টি করিয়াছে দেখিতেছি। ধূলো বালির পাহাড়। কোন কোন কারিগর ধূলো ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে দু'একটা চকচকে দানাও পাইয়াছেন বলিতেছেন। সত্যিকার হীরে বলিতে অনেকেই নারাজ। তবে, সেই দুটো-চারটে চক্‌চকে দানা কণার বাজার দস্তুর দাম করিয়া দিয়াছেন হালের পণ্ডিত জহুরীবর্গ। খুব বেশী দাম ওঠে নাই। বেদের জ্ঞান কাণ্ডের কিছু কদর হইয়াছে। কর্মকাণ্ডটা প্রায় ষোল আনাই বাজে। পুরাতন ইতিহাসের ও অভিব্যক্তির কিছু কিছু মাল মশলা তাতে পাওয়া যায়, এই জন্য একদম বাজে নয়। সত্যকার প্রয়োজনও উপাদেয়তার কষ্টিপাথরে কষিয়া তাদের দাম দেখিতে পাইতেছেন না বর্তমান বিপশ্চিতেরা। জ্ঞানকাণ্ড ও বিশ্বের হাটে খুব উচ্চ মূল্যে যে বিকাইতেছে, এমন নয়।

ম্যাক্‌ডোনাল সাহেবের মতন কেউ কেউ ঋগ্‌বেদের দশমমণ্ডলের "সং অফ্‌ ক্রিয়েশন্‌" এর তারিফ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে—আমরা শিশুর কেরামতিকে যেমন ধারা তারিফ করি। ডয়সন্‌ সাহেবের দল উপনিষদের পিঠ চাপড়াইয়াছেন, কিন্তু তাকে কান্ট-সোপেনহাওয়ার প্রমুখ ও দেশের তত্ত্ব-রসিকদের বৈঠকে বসিবার জন্য কোণে একখানা ইঁট দেখাইয়া দিয়াছেন মাত্র। খোদ সোপেনহাওয়ার উপনিষদের জয় ঢালা-প্রাণে গাহিয়াছিলেন ; গ্যেটের অন্তর-অধরেও শকুন্তলার কাব্য-মদিরা একটা অনাস্বাদিত-পূর্ব পীযূষ স্পর্শ আনিয়া দিয়াছিল দেখিতে পাই। কিন্তু দেশ, কাল, বর্ণের গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া এতটা নিবিড়, এতখানি সত্য সামঞ্জস্যের অনুভূতি সোপেনহাওয়ারেই অথবা গ্যেটেতেই সম্ভব। পশ্চিমের পণ্ডিতী বাজারে এ দেশের পুরাণো মণিকোঠার কোন সামগ্রাই তেমন উচ্চমূল্যে বিকায় নাই। এ দেশের ধর্ম-কর্ম, দর্শন-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প, সমাজ-রাষ্ট্র—এ সকলের বেশীর ভাগ বাতিল মালের গুদাম-জাত হইয়াছে। কিছু কিছু এখন বিশ্বমানবের কারবারে খাটিতেছে। কিন্তু "ক্রেডিট" তাদৃশ জবর নয়। যাঁরা বেশীর ভাগ এ দেশের ঐ সব বকেয়া ও মামুলি মালের কারবার করেন, আর কারবারটা সাবেকি ধরণে চালান, তাঁদের চেক সার্বজনীন নব্যশিষ্টজনজুষ্ট ব্যাঙ্কে সব সময় সমাদরে গৃহীত হয় না। পূর্বাচার্যেরা বেদ সম্বন্ধে যে সব উক্তি করিয়া গিয়াছেন, বিচার তুলিয়া তার যে ভাবে সমাধান করিয়াছেন, তা আজকালকার দিনে সরাসরি চালাইতে গেলে চলে না। মেকি মুদ্রা চলিবে কেন ? সত্যই মেকি কি ? এ দেশের সমাজ-রাষ্ট্রের অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাই ত' কোন এক অনগ্রসর মধ্যযুগের জেররূপে নিজেদের জড়ত্বধর্মের গুণেই এখনও কিছু "চলিতেছে"। সে চলাটাও বুঝি বা অচলের, পঙ্গুর চারিধারের চঞ্চলগতির মাঝখানে নিজেও চলার একটা ভ্রম। সত্যই ভ্রম ? সত্যই কি সে সব—সেই প্রাচীন সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি—অনগ্রসর মধ্যযুগেরই জের ? বর্তমান ডিমোক্রাসী, সোসিয়ালিজম্‌, কম্যুনিজম্‌ ইত্যাদির দিনে ও সব বর্ণাশ্রম, সমাজ প্রভৃতি কি একেবারে পরীক্ষা, এমন কি, মনোযোগের অযোগ্য কোন একটা গোরস্থান ? কেবল প্রত্নতাত্ত্বিক গিয়া সেখানে সনাক্ত করার জন্য কতকগুলো নিশানা আর ফলক লাগাইয়া দিয়া আসিবেন ? অতীতে যাই হ'ক, বর্তমানে সে আর স-প্রয়োজন ও সার্থক নয় ?

এ দেশের সাহিত্য শিল্প আর দর্শন মোটামুটি আদর এখন ও পাইতেছে। বিশ্বমানবের বৈঠকেও। গণিতের কথা ছাড়িয়া দিলে, সত্যকার বিজ্ঞান না কি এ দেশের মাটিতে গজায় নাই। আয়ুর্বিজ্ঞান, ফলিতজ্যোতিষ—এ সকল নাকি হালের টেষ্ট উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। ধর্মকর্মের ভূমির আড়তে সত্যকার সারাল' শস্যের সওদা করিতে যাওয়া না কি বৃথা। অন্ধকার নয়, তেলের প্রদীপ জ্বালিয়াই আড়তদারেরা তাদের ভূমির কারবার হাজার হাজার বছর ধরিয়া চালাইয়া আসিতেছে। তাদের মামুলি দার্শনিক প্রতিভাটি হইল সেই তেলের প্রদীপ। অন্ধকারে বসিয়া পোকধরা

ভূষির কারবার চালাইলে, দোকানদার খরিদ্দার দুজনারই ভুল হবার কথা। কিন্তু দিব্য ফুটফুটে প্রদীপের আলোয় এ ব্যবস্থা যে এতদিন নির্ঝঞ্ঝাটে চলিয়া আসিতেছে, এইটাই আশ্চর্য! ব্রহ্ম নিয়ে, আত্মা নিয়ে, কর্ম নিয়ে এত সূক্ষ্মদর্শিতা, অথচ, হাজার হাজার বছর ধরিয়া ঐ পোকাধরা ভূষির জাবর কাটিয়া মরিলাম। মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র—সেই অর্ধতমিস্রাযুগের ম্যাজিক—নিয়ে আমাদের ধর্মকর্ম! ম্যাজিক নাকি হালের বিচারকদের রায়ে "আদিম বিজ্ঞান"। কিন্তু ভারতে আদিম কি চিরদিনই আদিম রহিয়া যাইবে? এখানে যা কিছু দেখা দেয়, তাই কি স্থাণু, কূটস্থ, অনড়, অচল বনিয়া যায়? ভারতীয় মগজের ভিতরে ব্রহ্মজ্ঞান আর মন্তর-তন্তর এ দুই-ই স্বতন্ত্র দুই কুঠুরীতে খাসা আপোশ করিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে কিরূপে? এই রকম সব জেরা কেবল বিদেশী আলোচকদের নয়, অনুবাদক ও অনুকারক আমাদেরও অনেকের মনে আজকাল গজগজ করিতেছে।

সেই পুরাবিদ্যা—যার অভিজ্ঞান ও পরিচয় এ দেশে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রে কতকটা পল্লবিত রহিয়াছে—আর নব্যবিদ্যা—যেটা মুখ্যতঃ বিজ্ঞানের নামে নিজেকে চালাইতেছে—এ দুয়ের মাঝখানে একটা সুমেরু-কুমেরুর ব্যবধান দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এটা যদি সত্য সত্যই বিজ্ঞান হয়, তবে সেটা বোধহয় আর বিজ্ঞান নয়। "বোধহয়" বলিতেছি এইজন্য যে, হয়ত' হালের বিজ্ঞান বিজ্ঞানের সবটা না হইতে পারে; তার সীমার বাইরেও বিজ্ঞান থাকা সম্ভব, এবং সে বিজ্ঞান চল্‌তি বিজ্ঞানের পছন্দ মাফিক অথবা ফরমাসি একটা কিছু নাও হইতে পারে। মানুষের মামুলি বিশ্বাসের অনেক কিছু এর মধ্যেই বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারের দরজায় জোরে ধাক্কা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্মোহন-বিদ্যা, দূরশ্রুতি, দূরদৃষ্টি প্রভৃতি কোন কোন উপেক্ষিত অতিথি আজ স্বাধিকারের দলিলপত্র দেখাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—নিমন্ত্রণ-পত্রের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে নাই। প্রেততত্ত্ব, জন্মান্তরতত্ত্ব, যোগশক্তি প্রভৃতি এখনও হয়ত' বাহিরে দাঁড়াইয়া! কিন্তু কৃপাপ্রার্থী হইয়া নয়। কত দিন আর তাদের ঠেকাইয়া রাখিতে পারা যাইবে? যা কিছু পরীক্ষিত সত্য। যা-কিছু প্রমাণের ধোপে টিকিয়াছে। তাই যদি বিজ্ঞান হয়, তবে, চীনের প্রাচীর তুলিয়া তার এলেকার চৌহদ্দি ঠিক করিয়া রাখা যায় না। বিজ্ঞানের পুরী ক্রমেই বিপুলতরা হইতেছে। বিজ্ঞানের গতিও নিরবধি। এতদিন প্রাচীন ভাব-বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান নবীনের ঔদ্ধত্যের কাছে ঘেঁসিতে পারে নাই। জানোয়ার বিশেষের শিঙে ঠেকিলে হীরার ধারও ভাঙ্গিয়া যায়। আজ নানা কারণে তার ঔদ্ধত্য খর্ব হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন অসত্য বলিয়া, রিক্ত প্রয়োজন বলিয়াই যে এতদিন দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, এমন না হইতে পারে। প্রমত্ত নবীনের স্পর্ধার আতিশয্য একটুখানি খাটো না হওয়া পর্যন্ত দূরে সরিয়া থাকিয়া সে হয়ত' ভালই করিয়াছে। আপন স্বাধিকার যেখানে মত্ততা, সেখানে অন্যের

স্বাধিকারে অন্ধতাও আক্রোশ হওয়াই স্বাভাবিক। মত্তের পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠা হয় না, বিচারে নিগমন হয় না। এখন বিজ্ঞানের যেটা অঙ্গীকৃত ভদ্রাসন, তাতে আসিয়া বসবাস করিতে অনেক সত্য সিদ্ধান্তকেও লাঠালাঠি করিতে হইয়াছে দেখিতে পাই। অথচ, পরীক্ষিত সত্য, বিচারসিদ্ধ সমাধান মাত্রেই সে ভদ্রাসনে স্বাধিকারে বাস করিবার যোগ্য।

মত্ততার ঘোর কাটিয়া যাবার উপক্রমে আজ পুরাবিদ্যাও সেই ভদ্রাসনে আপন বেদখল স্বত্ব দখল করিতে আসিতেছে। তাকে অভদ্র বলিয়া আজ সে ভদ্রাসন হইতে বেদখল করিতে গেলে চলিবে না। "ও সমস্ত বর্বর যুগ, মধ্যযুগ; ও সমস্ত মিথ্যা কুসংস্কার"—এই রকম ধারা অসহিষ্ণুতার প্রগল্ভ কটুবাণী মত্তোচিত হইয়াছিল, ভদ্রোচিত হয় নাই। ওটা পরীক্ষকের নিশ্চিত ফল, বিচারকের নিরূপিত সিদ্ধান্ত হয় নাই; উদ্ধতের, স্পর্ধিতের, দুর্বিনীতের অশিষ্ট, অশোভন, অযুক্ত অপভাষণই হইয়াছিল।

বিজ্ঞানের মুখে আত্মশ্লাঘার সুর নরম হইয়া আসিতেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞানের প্রতি স্পর্ধার আস্ফালনও কমিয়া আসিতেছে। অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দী প্রজ্ঞান বা বোধিকে ভুয়া মরীচিকা ভাবিয়াই সুস্থির হইয়াছিল। ইন্দ্রিয় গোচরতাই ছিল বাস্তবতার একমাত্র প্রতিষ্ঠা। উপনিষদে দেখিতে পাই—ঋষিরা কে কার গতি, কে কার প্রতিষ্ঠা খুঁজিতে খুঁজিতে শেষকালে আকাশকেই নিখিলের গতি ও প্রতিষ্ঠা—জ্যায়ান্ এবং পরায়ণ—বলিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন। সে আকাশ শুধু যে এই ভৌতিক আকাশ এমন মনে না হইতেই পারে। চোখে দেখিয়া নয়, কেবলমাত্র বিচার করিয়া নয়, প্রজ্ঞানে, কি না, সমগ্র যেটি, পরম যেটি, সেটিকে অনুভবে পাবার যে উপায়, সেই উপায়ে, সেই আকাশের অনপিহিত মহিমা তাঁরা জানিয়াছিলেন। বিজ্ঞান ও নিখিলের যেটি গতি ও প্রতিষ্ঠা, সেটিকে খুঁজিয়া চলিয়াছে। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জড় বা ম্যাটার, আর তার পরিমাপযোগ্য শক্তি বা ফোর্স—এতেই যাইয়া তাকে অনেকদিন পর্যন্ত থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছে দেখি। যেখানটায় তাকে থামিতে হইয়াছিল, সেইখানেই বিজ্ঞান এবং বাস্তবতার (ফ্যাক্টের) প্রান্তসীমা মনে করার একটা সর্বনেশে মোহ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল, এও দেখি। ভৌতিক ইন্দ্রিয় ক'টা, আর তাদের সাহায্যের জন্য ভৌতিক যন্ত্রপাতি কতকগুলো, আর তার আঁকের খাতাখানা—এই মাত্র পুঁজি করিয়া বিজ্ঞানের ছিল পথযাত্রা। পায়ে শিকলি পরিয়াই তার যাত্রা সুরু হইয়াছিল। সোজা, সমান রাস্তায় শিকল পায়ে দিয়াও হয় ত' কায়ক্লেশে হাঁটা যায়। কিন্তু পথ বন্ধুর হইলে, পথে খানা ডোবা ডিঙাইবার থাকিলে, আর চলে না। ইন্দ্রিয়গোচরতাই হইল বিজ্ঞানের একমাত্র প্রামাণ্য, যুক্তি তার দাসীপনা করিতে নিযুক্ত; দেখা-শোনার হাত-ধরা ছাড়া বিজ্ঞান নাচার,

নিরুপায়; এই প্রতিজ্ঞাই, আর এই ধারণাই বিজ্ঞানবিদ্যাকে এবং বৈজ্ঞানিক সত্যকে একটা গোড়ায় গণ্ডী দিয়া পরিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সে প্রতিজ্ঞা, সে ধারণা না নড়িলে, সে গণ্ডী হইতে বিজ্ঞান বিদ্যার মুক্তি হইবে না। বিজ্ঞানের লোকায়ত জড়বাদ, দেহাত্মবাদ, নিরীশ্বরবাদ, ভোগবাদ প্রভৃতি গোড়ায় একটা বড় গোছের "বাদ" দেওয়ার ফলেই অমনধারা জমকাল' বৈজ্ঞানিক "সিদ্ধান্ত"রূপে নিজেদিগকে খাড়া করিতে পারিয়াছিল। গোড়াকার সেই বাদ দেওয়ার ফলেই, বিজ্ঞান শুধু চর্মচক্ষু মেলিয়াই চাহিতে পারিয়াছে, প্রজ্ঞাচক্ষু তার ফোটে নাই। প্রজ্ঞাচক্ষু দেখা-শোনার পরপারে, মাপাজোকা ও হিসাবের অতিগ লোকে যা কিছু দেখিয়াছে বলিয়া দাবী করিয়াছে, বিজ্ঞান এতদিন সেগুলোকে মায়া বলিয়া, মতিভ্রম বলিয়া একরকম তুড়ি দিয়াই উড়াইয়া আসিতেছে। জীবনের পরপার আত্মা, ভগবান্—এ সব হয় মিথ্যা, নয় অসিদ্ধ-প্রমাণাভাবাৎ। প্রমাণটা যে কি—সত্যের অবধারণ বা নিরূপণের উপায়টা যে কি—এই গোড়ার হিসাবটাই বিজ্ঞান ভাল করিয়া লইতে খেয়াল করে নাই। ভিতরে মন বা আত্মার নিজের কোন রোশনাই নাই; সে চাঁদের মতন পরের আলোতে বাহার দিয়া বেড়ায়; ইন্দ্রিয়ের গবাক্ষগুলোই আসল আলোর রাস্তা, এই বিশ্বাসটাকে অন্ধভাবেই আলিঙ্গন করিয়া সে পড়িয়াছিল। সবার পরীক্ষক ও সমালোচক সে—কিন্তু নিজের পরীক্ষা ও আলোচনাটা করাই সে অনাবশ্যক বুঝিয়া বসিয়াছিল। তার নিজের গোড়ার বন্দোবস্তটাকে সে অকাট্য অনড় মনে করিয়াছিল। এটা কিন্তু গোঁড়ামি—বিজ্ঞানের গোঁড়ামি। তাই বলিয়া সর্বনেশে নয়।

ম্যাটার আর ফোর্স যখন আর কুলাইল না, তখন ঈথার আসিল, দেশ-কাল—কন্‌টিনুয়াম আসিল। এদের আসার ফলে তার পায়ের শিকলি একেবারে খসিয়া না পড়িলেও শিথিল হইতেছে; তার গলার দড়ি না খুলিলেও লম্বা হইতেছে। তার চরিয়া খাবার ময়দান আজ আর তেমন ছোট নয়। ইন্দ্রিয়-গোচরতার খুঁটিতে সে এখনও বাঁধা বটে, কিন্তু খুঁটিতে বেজায় টান পড়িতেছে; গোঁজ উবড়াইবার আর বড় বেশী দেরি আছে মনে হয় না। তখন বন্ধনমুক্ত সে কোন্ অজানা ময়দানের পানে ছুটিয়া যাইবে? কিসের, কেমন ধারা ময়দানই বা সেটা?

বিজ্ঞানের মুক্তির অপেক্ষায় বিশ্বমানবের অন্তর-দেবতা আজ যে ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে! বিজ্ঞানের মুক্তিতেই প্রজ্ঞান। গণ্ডী দিয়া ঘিরিলে যেটি বিজ্ঞান, গণ্ডী ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে সেটাই প্রজ্ঞান। এ প্রজ্ঞানকে ঋষিরা ব্রহ্ম বলিয়াছেন। ব্রহ্ম—যেটি সমগ্র, যেটি পূর্ণ, যেটি ভূমা। প্রজ্ঞান তাই সমগ্রের, পূর্ণের জ্ঞান। তাই বেদ। পুঁথি কয়খানা বলিতেছি না। একটা পরিভাষা করিতেছি। সে পরিভাষা কোথায় লাগিবে না লাগিবে, সে আলাদা কথা। সকল দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য দেখি প্রজ্ঞানে বিশ্বাস করিয়াছে, "বেদ" মানিয়াছে। সে বেদ হয় ত' ঈজিপ্টে ছিল "বুক্

অফ্ দি ডেড্"; সুমের আকাডে আর একটা কিছু ("ক্যাল্‌ডীয় বেদ") চীনে অপর একটা কিছু। রূপ, চেহারা আলাদা আলাদা। তাতে তেমন কিছু আসিয়া যায় না। অতীন্দ্রিয় বিষয়ে "রবেরিব রূপবিষয়ে" এই প্রজ্ঞানের প্রামাণ্য প্রাচীন বিপশ্চিতেরা মানিতেন। হালের বিদ্যাও মানার দিকে না ঝুঁকিলেও—ও বিষয় উদ্‌গ্রীব, অবহিত হইতেছে। সংশয়াত্মা সে বিনাশের পথে চলিতে চলিতে আজ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাকে ফিরিতেই হইবে। তার যে সত্যে, যে বাস্তবে যে পদ্ধতিতে ছিল প্রতিষ্ঠা, সেটাই যে আজ সংশয়ে দুলিতেছে। তার পায়ের নীচে আজ যে আর শক্ত জমিন নাই। তার উড়িবার পাখা হইয়াছে—কিন্তু পাখার তলে, পাখাকে ঘিরিয়া জমাট বাতাস আজ যে আর নেই। বিজ্ঞানের মূল প্রস্তাবগুলি সবই যে হাল্‌কা হইয়া পড়িয়াছে। মরণের তরে তার এ পাখা উঠিল না কি? নিজেকে নাকচ নস্যাৎ করিয়া দিয়া নয়, নিজের পূর্ণতর, অধিকতর সমঞ্জস বিকাশের পথে এতদিনকার মিথ্যা, কল্পিত অন্তরায়গুলি সরাইয়াই, বিজ্ঞানকে আজ আবার নতুন করিয়া নূতন প্রাণ ও কলেবরে ভূমিষ্ঠ হইতে হইবে। সে নতুন, শৃঙ্খলমুক্ত, স্বচ্ছন্দগতি, পূর্ণতর বিজ্ঞান আর বোধহয় প্রাচীনের প্রজ্ঞানকে অশ্রদ্ধা করিবে না। বিজ্ঞানের যুগ চলিয়াছে; কিন্তু প্রজ্ঞানের যুগ বুঝি বা আসিতেছে। সন্ধিক্ষণে মানুষের মনে প্রশ্ন উঠিতেছে—বিজ্ঞান না প্রজ্ঞান?

অহল্যার তপস্যা

ঋগ্‌বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলে ১২৯ সূক্তের একটা মন্ত্র মনে আসিতেছে। তৃতীয় মন্ত্রে তমঃ সলিল ও তুচ্ছ অপিধান এই সকল কথা আছে। অনুভবের দিক দিয়া এ সকল কথার মর্ম বুঝিতে চেষ্টা করা স্বাভাবিক। আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভাবেও যে এ সকল কথা বুঝা যায় না, এমন নয় যাঁরা বাহিরে তাকাইয়া তমঃ সলিল প্রভৃতি বুঝিতে চাহিবেন, তাঁহাদিগকে আমরা ঠেকাইয়া রাখিতে চাহিনা। আমরাও "বেদ ও বিজ্ঞানে" বাহির হইতে সলিল প্রভৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সেখানেও সতর্ক করিয়া দিয়াছি এবং এখানেও দিতেছি যে, সে সব বাহিরের ব্যাখ্যা যত লাগসই হ'ক না কেন, আসলে বহিরঙ্গ ব্যাখ্যা, অন্তরঙ্গ নয়। কাটা-ছাঁটা বা আড়ষ্টভাবে যে মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করা উচিত নয়, তা আমরা আগে একাধিকবার বলিয়াছি। আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক স্তরের ব্যাখ্যা আগেও ছিল, মন্ত্রদ্রষ্টরা সেভাবেও তত্ত্বগুলি আমাদের বুঝাইতে চাহিতেন বলিয়াই ছিল। বেদের অনেক মন্ত্রে জলকে সকল ভেষজ বা ঔষধির আশ্রয় বলা হইয়াছে। এ কথার মধ্যে নিগূঢ়ভাবে একটা আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা থাকিলে থাকিতে পারে, হয়ত আছেও, কিন্তু সকল রোগ ব্যারাম যে একমাত্র জলের দ্বারাই সারান যাইতে পারে, এই বৈদ্যতত্ত্বটিও (Hydropathy), বুঝান তাঁদের অভিপ্রেত ছিল, সন্দেহ নাই। এইভাবে বেদমন্ত্রে অনেক যায়গায় জ্যোতিষতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব খতত্ত্ব প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের অনেকতত্ত্বই কথিত হইয়াছে। কিন্তু অখণ্ড অনুভব সত্তারূপে ব্রহ্মতত্ত্বই যে নিখিল শ্রুতিবাক্যের পর্য্যবসান, এ কথা শুধু আমরা বলিতেছি না, বেদের কর্মকাণ্ডের সহিত অভিন্নভাবে জড়িত যে জ্ঞানকাণ্ড বরাবরই প্রচলিত ছিলেন, সেই জ্ঞানকাণ্ডই স্বয়ং এই কথাটি আমাদের ভাঙ্গিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগে ফাঁকে ফাঁকে, ইসারায় ইঙ্গিতে, আরণ্যক, উপনিষৎভাগে খোলাখুলি ভাবে বটে, কিন্তু "হাটে বাজারে" নয়—"রহসি"। "নাদীক্ষিতায়োপদিশেৎ নানুচানায়"। এই ছিল তাঁদের দস্তর।

অশ্বমেধ যজ্ঞে সত্য সত্যই একটা অশ্ব দরকার হইত সন্দেহ নাই। আধুনিক যে সকল পণ্ডিতেরা "যজ্ঞ টজ্ঞ" সবই উড়াইয়া দিয়া নিজেদের মনগড়া একটা আধ্যাত্মিক অথবা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চান, তাঁদের এ কথাটি ভুলিলে চলিবে না যে, হাজার হাজার বছর ধরিয়া এ দেশে সত্য সত্যই অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত এবং ব্রাহ্মণ, শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে যে আকারে বর্ণনা আছে, সেই আকারেই অনুষ্ঠিত হইত। একটা নজির—বৃহদারণ্যক উপনিষদের ঠিক গোড়াকার মন্ত্রেই দেখি যে সাধারণ ঘোড়া লইয়া যজ্ঞ চলিলেও, যজ্ঞের মন্ত্রে ও ধ্যানে, সে ঘোড়া সাধারণ

ঘোড়া ছিল না। বৃহদারণ্যক সেই অশ্বের ভিতরেই ব্রহ্মের বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছেন, অর্জুন যেমনধারা একদিন পার্থসারথির ভিতরে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বটি যেমন মন্ত্রে ও ধ্যানে ব্রহ্ম, সে অশ্বের বলিদান ও তেমনি তেমনিধারা আসলে সেই ব্রহ্মেরই আত্মবলিদান—যে আত্মবলিদানের ফলে, অখণ্ড অসীম অনুভবসত্তা নানা খণ্ডে নিজেকে যেন বিভক্ত করিয়া ফেলেন এবং সেই বিভাগের ফলে আমাদের এই কারবারি জগৎরূপে নিজেকে সাজাইয়া দেখান। সৃষ্টির গোড়াতেই যে এইরকম একটা আত্মবলিদান আছে, প্রজাপতিকে তাই "যজ্ঞ" করিয়াই সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। আমরা "ঋতস্য পন্থা" প্রবন্ধে কথাটা কিছু ভাঙ্গিয়া দিয়াছি।

অশ্বমেধ যজ্ঞে অভিষেকের সময়ে যে সকল বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হয়, সে সবের মধ্যে ঋগ্‌বেদের প্রথমাষ্টকের সেই প্রসিদ্ধ শুনঃশেপ সূক্তগুলি অন্যতম। যূপকাষ্ঠে বদ্ধ শুনঃশেপ ঋষি মুক্তির জন্য দেবতাদের কাছে স্তব করিয়াছিলেন। স্তবের সেই মন্ত্রগুলি অশ্বমেধ যজ্ঞে অভিষেকের সময়ে পাঠ করিতে হয়। কেন এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে হয়, তার একরকম কৈফিয়ৎ আমরা অন্যত্র দিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু আসল কৈফিয়ৎটি বোধহয় এই—আমি অথবা ব্রহ্ম অথবা অখণ্ড অনুভব-সত্তা, সাধ করিয়াই হউক আর যে জন্যই হউক, সৃষ্টিরূপ এই যূপকাষ্ঠে, সেই শুনঃশেপ ঋষির মত, নিজেকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি বলির জন্য। যূপকাষ্ঠে এইরূপ বন্ধনের ফলে আমার সংসার এইরূপ বন্ধনের ফলে আমি বিরাট অসীম ও অখণ্ড হইয়াও, যেন ক্ষুদ্র, গণ্ডীবদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি। ইহাই হইল আমার বলিদান। অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বকে উপলক্ষ্য করিয়া, সম্রাট যিনি, তাঁহাকে এই মূল বলিদানের কথাটি চিন্তা করিতে হয়। না করিলে তাঁর যজ্ঞ সাঙ্গ ও সফল হয় না। তাঁর স্বরাজ্য-সিদ্ধি হয় না ; তিনি নামে সম্রাট হইলেও, আসলে স্বরাট হইতে পারেন না। স্ব বা আমিকে স্বরূপে না জানিলে ও পাইলে, কে কবে স্বরাট হইয়া থাকে, কার তবে স্বারাজ্য হইয়া থাকে ? এইজন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতাকে ওই অনুষ্ঠানের উপলক্ষে সৃষ্টিতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব ও যজ্ঞতত্ত্বের আসল রূপটি ভাবনা করিতে হয়। না করিতে পারিলে তাঁর যজ্ঞে পূর্ণাহুতি হইল না। ভারতবর্ষ আজ যদি আত্মবলিযজ্ঞে ব্রতী হইয়া স্ব-পরিচয়ের কেন্দ্র হইতে দূরে সরিয়া যায়, তবে তার "সম্রাট" হওয়া হয়ত হইবে, কিন্তু "স্বরাট" হওয়া হইবে না।

অবশ্য এটা বলা আমাদের অভিপ্রায় নয় যে অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞে অশ্ব প্রভৃতি কেবল বাজে উপলক্ষ্য মাত্রই ছিল, তত্ত্বচিন্তাই আসল উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ছিল। এ সব অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ব্যাপক ও বড় রকমের ছিল। মানুষের ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গই সে প্রয়োজনের সামিল ছিল। সুতরাং সে সব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া মানুষ ঐহিক ও পারত্রিক, দুই রকম শ্রেয়ঃ কামনা করিত এবং পাইত। সকল প্রকার শ্রেয়ঃ, নিঃশ্রেয়সের অনুগত ছিল। ব্রহ্মচিন্তা বা আত্মচিন্তার সাধক বা উপকারক

ভাবে অন্ন, রয়ি, গো, স্বারাজ্য ইত্যাদির চিন্তন ও সাধন চলিত। অন্ততঃ এইটাই ছিল বেদপন্থী সমাজের একটা দাবী।

অন্ন প্রভৃতি চাওয়ার যে মনোভাব আর ব্রহ্মকে চাওয়ার যে মনোভাব, এই দুইটি মনোভাবের মধ্যে কোন মিল থাকিতে পারে না—এই মনে করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বিষম ভুল করিয়াছেন। খৃষ্টানদের ধর্মশাস্ত্রে দেহকে, দেহের ভোগকে, জড়কে ও জড়ের উপকরণগুলিকে, একেবারে তুচ্ছ করার একটা ভাব গোড়া হইতে আছে দেখিতে পাই। মানুষের জন্মটাই যেন একটা পাপের মধ্য দিয়া, কেন না দৈহিক সম্পর্কের ফলে এই জন্ম হইয়া থাকে। আমরা সাধারণ মানুষ সকলেই এই গোড়ার গলদ হইতে জন্মিয়াছি। ত্রাণকর্তা যীশু অযোনিসম্ভব—আমাদের মত স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গে তাঁর জন্ম হয় নাই। সুতরাং সেই গোড়ার গলদ তাঁকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি জীবের ত্রাণের জন্য যে সুসমাচার প্রচার করিলেন, তার মূলমন্ত্র এই—এ দেহটা পাপময়, অতএব এ দেহের সম্পর্ক যতটা ছাড়িতে পারা যায় ততটাই ভাল। আমাদের দেশে কিন্তু দেহকে ও জড়কে এইরকম ভাবে "নোংরা" করিয়া দেখা গোড়া হইতে চলন ছিল না। শেষকালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে এবং আরও অন্যান্য কারণে সে রকম করিয়া দেখা আমাদের মধ্যেও কিছু কিছু চ'ল হইয়াছে। গোড়ায় ব্রহ্মবস্তু একটা আলাদা বস্তু, আর জড় একটা আলাদা বস্তু—এইরকম ধারা একটা ভেদদৃষ্টি তেমন বাহাল হয় নাই। তখন অদিতিরই আমল ছিল, দিতি ঠাকুরানী কশ্যপ ঠাকুরের "সুয়োরাণী" তখনও হন নাই। এই কারণে মনে হয়, যাঁরা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের মূলতত্ত্ব স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বও কিছু কিছু ভাবনা করিতেন। সময়ে সময়ে সেটা ভুলিয়া যাবার আশঙ্কা তাঁদের যে মোটেই ছিল না এমন নয়। আশঙ্কা ছিল বলিয়াই শ্রুতি অনেক স্থলে কেবল কর্ম্মের অনুষ্ঠাতাদিগকে বেশ একটু শাসাইয়া দিয়াছেন।

আচ্ছা আবার সেই গোড়ার কথায় ফিরিয়া যাওয়া যাক। ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল ১২৯ সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে আছে দেখিতে পাই—"তপসস্তমহিনা জায়তৈকম্"; এখানে তপঃ বা তপস্যার কথা আছে দেখিতেছি। কেবল এখানে বলিয়া নয়, সংহিতার আরও অনেক স্থলে এবং ব্রাহ্মণ-উপনিষদের অসংখ্য স্থানে আমরা দেখিতে পাই লেখা আছে—তিনি তপঃ করিয়াছিলেন; প্রজাপতি তপস্যা করিয়াছিলেন; তপস্যা করিয়াই এই সব সৃষ্টি করিলেন। এখন আমাদের তলাইয়া দেখা উচিত, এ 'তপঃ বা তপস্যা' কথার আসল মানেটা কি। মুণ্ডকোপনিষৎ বলিয়াছেন—"যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" তবেই আমরা দেখিতেছি যে আদি কারণের সেই তপস্যা জ্ঞানময় তপস্যা, আমাদের মতো একটা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন নয়। তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন মানে, তিনি জানিয়াছিলেন। কেন—যিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ, তাঁর আবার অজানা কি যে তিনি জানিবেন? তাঁর

জ্ঞান তো নিত্যপূর্ণ, অথবা সত্য অনন্ত জ্ঞানই তাঁর স্বরূপ। তাই যদি হয় তবে তিনি জানিয়াছিলেন এ কথার তাৎপর্য্য কি? অন্য প্রসঙ্গে অখণ্ড অনুভব সত্তার যে নথি আমরা তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছি সেই নথি দৃষ্টে ব্রহ্মের এই জ্ঞানময় তপঃ আমরা সহজে বুঝিতে পারিব। ব্রহ্মের দিক হইতে সত্য সত্যই সৃষ্টি স্থিতি লয় বলিয়া একটা কোন ব্যাপার আছে কিনা, তা আমরা জানিনা, জানিতে চাহিলে আমাদের বুদ্ধি ও কল্পনা দুই-ই হার মানিয়া ফিরিয়া আসে। সংহিতার ঐ সূক্তের প্রথমে ও শেষে সেই অনির্বচনীয়তার কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু আমরা আমাদের দিক হইতে, সৃষ্টি বা লয়ের মত কোন একরকম অবস্থা না ভাবিয়া যেন পারি না। আমরা দেখিয়াছি যে, আমাদের নিজেদেরই অনুভব সেই রকম ভাবিতে আমাদের প্ররোচিত করে। তাই আমরা ভাবি, এক সময়ে এ সব কিছুই ছিল না; তারপর প্রজাপতি সেই প্রলয়ের রাত্রির মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া এই সকল তৈয়ারী করিয়া ফেলিলেন। বলা বাহুল্য যে, এটা আমাদের ভাবনা। ভাবনা অনুভবের সঙ্গে মিলাইয়াও করা যাইতে পারে। অথবা অনুভবের সঙ্গে কোন রকম মিল রাখিবার চেষ্টা না করিয়াও করা যাইতে পারে। প্রথম রকমের হইলে সে ভাবনা সত্য হওয়া সম্ভব; শেষের রকম হইলে সে ভাবনাতে সত্য না থাকাই সম্ভব।

এখন নিজের অনুভব পুঁজি করিয়া আমরা ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্টির একটা নক্সা আঁকিতে বসিয়াছি। আমরা গোড়ায় একটা প্রলয়ের অবস্থা আঁকিলাম, এবং সেই অবস্থার নাম দিলাম রাত্রি ও সলিল। তারপর সে রাত্রি ও সলিলের মধ্যে আদি বস্তুটি লুকাইয়া বসিয়া আছেন, এই রকম আঁকিলাম। কেন যে এই রকম আঁকিলাম, তার কৈফিয়ৎ আমরা নিজেদের অনুভবের মধ্যেই এ রকম খুঁজিয়া পাইতে পারি। এখন এই রকম করিয়া ব্রহ্মবস্তুটিকে আঁকার মানে কি? এর মানে এই যে, তিনি সর্ব্বজ্ঞই হউন আর সর্ব্ববিৎই হউন, অনন্ত জ্ঞানময় হউন আর যাই হউন, আমাদের সুষুপ্তির মত একটা অবস্থা সাধ করিয়া তিনি লইয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁর অনন্ত জ্ঞান নিজের দেওয়া একটা অজ্ঞানের আবরণে যেন ঢাকা পড়িয়া যায়। অবশ্য আমরা নিজের মত করিয়াই ব্রহ্মকে আঁকিতেছি। এই রকম করিয়া আঁকা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নাই। এমন যদি কোন জীব থাকিত, যে জীব সব সময় জাগিয়া থাকে, আদপে ঘুমায় না, তাহা হইলে সে জীব ব্রহ্মের ছবি আঁকিতে হয়ত তার তুলিতে রাত্রি ও জলের রং অর্থাৎ ব্রহ্মের সুষুপ্তির অবস্থা মোটেই ফলাইতে চেষ্টা করিত না। পক্ষান্তরে যদি এমন জীব রহিত, যে জীব সব সময় ঘুমাইয়াই কাটায়, কুম্ভকর্ণের মত ছ'টি মাসও জাগে না, তাহা হইলে সে জীবের পক্ষে কোন রকম কাহারও ছবি আঁকা সম্ভবই হইত না, যদি বা হইত, তবে আমরা দেখিতাম যে, তার তুলি কেবল একটা কালো রংয়েই ডুবিয়া পটখানিতে কালিই লেপিয়া দিয়াছে, এবং সে কালির জমাটের ভিতর অন্য কিছুই আর

ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। অবশ্য আমরা মনে করি যে, এই দুই রকম জীবের মধ্যে কোন রকম জীবই সত্য সত্য বিদ্যমান নাই, সুতরাং আমরা যে ছবি আঁকিতেছি—একবার ঘুমান, একবার জাগা, আবার ঘুমান আবার জাগা—সেই ছবিটাই তত্ত্বের ও তথ্যের নিখুঁত ছবি।

অবশ্য মহাপ্রলয় বা প্রাকৃতিক প্রলয় ছাড়া ছোটখাট প্রলয়ের কথাও শাস্ত্রকারেরা, বিশেষতঃ পুরাণকার, আমাদের বলিয়াছেন। সেইসব ছোটখাট প্রলয়ে আমাদেরই কেউ কেউ নাকি সাক্ষীরূপে হাজির থাকিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের জবানবন্দী পাকা করিয়া লিখিয়া নথীভুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কল্পান্তজী মার্কণ্ডেয় ঋষির কথা আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে পারি। জগৎ একার্ণবীকৃত হইলে কারণ সলিলে বটপত্রে শিশুরূপী বিষ্ণু যখন ভাসিতেছিলেন, তখন মার্কণ্ডেয় সেই জলরাশির মধ্যে শিশুটিকে প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁর মনে হইল, কে এ ছেলেটি জলে ভাসিতেছে; এর মা বাপই বা কারা এবং কোথায়? শিশুটি হাঁ করিল; মার্কণ্ডেয় কিছু না জানিতে পারিয়াই তার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মুখের মধ্য দিয়া দেহের ভিতরে গিয়া দেখিলেন, সেখানে সৃষ্টি সবই অটুটভাবে বর্তমান আছে; পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, তারা, আকাশ দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য, ভূত, প্রেত—এ সকলই সেই শিশু-কলেবর মধ্যে স্ব স্ব স্থানে, স্ব স্ব অধিকারে পূর্ববৎ বাহাল রহিয়াছে, কিছুই লয় হয় নাই। মার্কণ্ডেয় কতকাল ধরিয়া যে সেই দেহমধ্যে বিচরণ করিলেন এবং কত কি দেখিলেন, তা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁর মনে হইল তিনি সৃষ্টি ও স্থিতির মধ্যেই রহিয়াছেন, লয়ের কোন লক্ষণ সেখানে নাই। কিন্তু কোন্ ফাঁকে তিনি আবার উগ্‌লাইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বাহির হইয়া দেখেন—সেই অনন্ত জলরাশি, তার মধ্যে আর কিছুই নাই, কেবল সেই বালকটি ভাসিতেছে। মার্কণ্ডেয় অবশ্য ছাড়িবার পাত্র নন্। ছেলেটি তাঁকে "মার্কণ্ডেয়" বলিয়া নাম ধরিয়া ডাকাতে প্রথমে চটিয়া গেলেন। যতক্ষণ ছেলেটি তাঁকে আপন বিশ্বরূপ দেখাইয়া বিস্মিত করিতে না পারিল, ততক্ষণ তিনি শান্ত হইলেন না।

এটা অবশ্য মহাপ্রলয়ের ছবি নয়। কিন্তু তা না হইলেও, এ ছবির ভিতর দিয়াও সেই মূল ছবির অনেকটা রকম সকম আমরা ধরিতে বুঝিতে পারি। মার্কণ্ডেয় আমাদের সাক্ষ্য দিতেছেন যে, সত্য সত্যই প্রলয়ের সময় ব্রহ্মের একটা অব্যক্ত অবস্থা হয়। এ জগৎটা একার্ণবীকৃত হইয়া যায়, নির্বিশেষে একাকার হইয়া যায়, আমাদের সুষুপ্তির সময় যেমন হইয়া থাকে তেমনিধারা। কিন্তু সেই একাকারের মধ্যেও বীজরূপে বিশ্বটি রহিয়া যায়। বালকরূপী সেই বীজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মার্কণ্ডেয় তাই সমস্ত সৃষ্টিটাই পূর্ববৎ বহাল দেখিতে পাইলেন, এমন কি বুঝিতেই পারিলেন না যে, সব লয় হইয়া গিয়াছে। এ গল্পের মধ্যে আর যা রহস্য আছে তা আমরা পরে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিব।

এখানে কথাটা এই যে, আমরা সৃষ্টির ছবি নিজের মত করিয়াই আঁকি, এবং আঁকিতে বাধ্য আছি। সেইরূপ আঁকায় আমরা দেখি যে, অনন্ত জ্ঞানময় অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ আদি বস্তুটিও কোনো রকম একটা অজ্ঞানের অব্যক্ত আবরণে নিজেকে যেন ঢাকিয়া ফেলিতেছেন; তার ফলে তাতে সব যেন সঙ্কুচিত ও লুক্কায়িত হইয়া যাইতেছে, একটা বীজের ভিতরে গাছ যেমন লুকাইয়া থাকে, তেমনিধারা অথবা তার চাইতেও ভাল দৃষ্টান্ত, আমাদের ঘুমের অবস্থার ভিতরে আমরা যেমন ধারা লুকাইয়া থাকি, তেমনি ধারা। ফলকথা এও একরকম অজ্ঞান। নিত্য জ্ঞানময়ে এ অজ্ঞানের আরোপ কি করিয়া করা যাইতে পারে, তার কৈফিয়ৎ আমরা বুঝিনা। এখন এই অজ্ঞানকে দূর করিবার জন্য, যোগনিদ্রা হইতে জাগিবার জন্য, ব্রহ্মাকে যে ব্যাপারটি করিতে হয়, অথবা করিতে হয় বলিয়া আমরা মনে করি, সেই ব্যাপারটির নাম তপঃ বা তপস্যা। সে তপঃ জ্ঞানময়, কেননা জ্ঞান ছাড়া অজ্ঞান আর কিছুতে দূর হবার নয়।

অবিদ্যা বা অজ্ঞানের অন্য নাম হইতেছে বাধা। শাস্ত্র যে বলিয়াছেন—"জ্ঞানাৎ-মুক্তিঃ", এ কথাটা আমাদের বেশ ভাল করিয়া বুঝা দরকার। জড়ের ভিতরে, প্রাণীদেহের ভিতরে এবং আমাদের অনুভবের ভিতরে অজ্ঞান একটা বাধাস্বরূপ হইয়া কাজ করিতেছে। কোনো একটা জড় পদার্থ যে সসীম বলিয়া আমাদের মনে হয়, সেটা কেবল আমাদের সবখানি না দেখার জন্যই হইয়া থাকে। কোনো একটা জড়পদার্থকে আমরা ছোট করিয়া দেখিতেছি বলিয়া, আসলে সেটি ছোট নয়। তার সত্তা ও শক্তিব্যূহ এই দুই-ই অসীম বিরাট। তবে সকল জিনিষকে অসীম ও বিরাট করিয়া দেখিলে, আমাদের কারবার চলে না বলিয়া, আমরা তাহাদিগকে এক একটা গণ্ডীর ভিতরে ভরিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। একথা সহজেই বুঝা যায় যে আমাদের প্রত্যেক অনুভবের পিছনেই বিশ্বের সকল শক্তি সম্মিলিতভাবে কাজ করিয়াছে ও করিতেছে। আমার স্নায়ুর কম্পনের ফলে আমি কোন একটা কিছু অনুভব করি। এখন এই কম্পনটি কোথা হইতে আসিয়াছে? আমরা মনে করি যে বাহিরে একটা তাল পড়ার শব্দ অথবা কোথাও একটা আগুন জ্বলিয়া উঠার উত্তেজনা আমার স্নায়ুস্পন্দনের মূলে রহিয়াছে। মোটামুটি হিসাবে কথাটা সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু সূক্ষ্ম হিসাবে দেখিতে গেলে, ঐ একটা ঘটনা নয়, বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা মিলিয়া মিশিয়া জমাট হইয়া একসঙ্গে আমার ভিতরে ঐ স্পন্দনটি উৎপন্ন করিয়াছে। এ হিসাবের মধ্য হইতে লক্ষ লক্ষ যোজন দূরবর্তী কোনো একটা তারার ঘটনাগুলিও বাদ পড়ে না। এ বিশ্বের সকল সামগ্রী পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা; কেউই আলাদা, একঘরে হইয়া নাই, থাকিতে পারে না। আমাদের পৃথিবীর কোনো একটা তুচ্ছ ঘটনার সঙ্গে সুদূরবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জের ঘটনাগুলির একটা নিবিড় সংযোগ রহিয়াছে। এ বিরাট বিশ্বযন্ত্রে কোনোখানে কোনোখানে কোনো একটা সুর যে বাজিয়া উঠে, তার হেতু এই যে, সমস্ত যন্ত্রটাই তার সকল ঘাটে ঘাটে পরদায় পরদায়

তারে তারে বাঁধা রহিয়াছে। অনুভবের কোন বিষয়ের সত্তা ও শক্তি সামান্য নয়, আসলে সেটা বিশ্বেরই সত্তা ও বিশ্বেরই শক্তি।

আমরা কারবারের খাতিরে জিনিষকেও ছোট ছোট করিয়া দেখি, তার শক্তিকে সামান্য মনে করিয়া থাকি, এবং তার সম্বন্ধগুলিও একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে আমরা বড় একটা দেখিতে পাই না। আমাদের কারবারে তার একটা নির্দিষ্ট মাত্রা ওজন ও সীমা আসিয়া পড়িয়াছে। যতদিন আমাদের কারবার চলে, ততদিন একটা জিনিষকে তার নির্দিষ্ট মাত্রা, ওজন ও গণ্ডীর ভিতরেই আমরা দেখিতে থাকি। এইভাবে বাহিরের সব জিনিষগুলি আলাদা আলাদা হইয়া রহিয়াছে এবং প্রত্যেক জিনিষের একটা আলাদা মাপ, ওজন ও চৌহদ্দি হইয়া আছে। জড়ের বেলায় এই লক্ষণগুলি খুবই পাকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা জড় পদার্থ যে জায়গাটুকুতে থাকে, সে জায়গাটুকু হইতে সে সরিয়া না গেলে আর একটা পদার্থ আসিয়া সে জায়গাটুকু দখল করিতে পারে না। ইহাকে বলে জড়ের স্থানাবরোধকতা। এই বন্দোবস্তের ফলে প্রত্যেক জড়পদার্থ আপন এলেকাতে "গ্যাট" হইয়া বসিয়া আছে, অপর কাহাকেও সে এলাকাতে ঢুকিতে দেয় না, ঢুকিতে চেষ্টা করিলে বাধা দেয়। জড় আপন এলেকার ভিতর দিয়া অপর কোন বস্তুকে বিনা ওজর আপত্তিতে যাইতে দেয় না। আগন্তুককে বাধা দেওয়া (resistence)—এও জড়ের একটা মৌলিক ধর্ম। এই ধর্ম আছে বলিয়া জড়বস্তুগুলি সকলে আপন আপন আকার প্রকার অনেকটা বজায় রাখিয়াই চলিতেছে। এ ছাড়া জড়ের ওজন বলিয়াও একটা লক্ষণ আছে। জড়ের এই সকল লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া আমরা যে সাধারণ কথাটি পাই, সেটা হইতেছে এই—জড়গুলি আলাদা আলাদা এলেকায় আপন আপন সত্তা শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া বিরাজ করিতেছে। এক রকম বাধা হইতেই এ সকলের জন্ম। আমরা অন্য প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, বিশ্বের সত্তা ও শক্তিকে এক-একটা বাধা দিয়া এক-একটা গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ না করিলে ঐ রকম পদার্থের উদ্ভব ও প্রত্যয় হইতে পারে না। তারপর বাধা লইয়া এবং বাধা দিয়াই সেই সকল পদার্থ আপন আপন অস্তিত্ব অধিকার বজায় রাখিয়া চলিতেছেন। যাতে জন্ম তাতেই আবার স্থিতি। যে পদার্থ মোটেই কোন রকম বাধা দেয় না, তাকে পদার্থ বলিতেই বৈজ্ঞানিকেরা নারাজ হইবেন। যে সকল জড় পদার্থ কঠিন তারা ত স্পষ্টই বাধা দিয়া থাকে। তরল ও বায়বীয় পদার্থ অল্পবিস্তর বাধা দেয়। এমন কি সর্বব্যাপী ঈথারের ভিতর দিয়া গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রচণ্ডবেগে ঘুরিতে ঘুরিতে একটু-আধটুখানি বাধা পাইয়া থাকে কিনা, তা লইয়াও বৈজ্ঞানিকেরা মাথা ঘামাইতে কসুর করেন নাই। হয়ত ঈথারও অল্পপরিমাণে বাধা দিয়া থাকে। আগন্তুককে বাধা দেওয়াই দ্রব্যের মূল লক্ষণ। আমাদের মনে হয় যে, অখণ্ড অনুভব সত্তায় কোনরূপ বাধা হইতে এদের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়াই এরা বাধা লইয়া এবং বাধা দিয়া টিকিয়া আছে।

বাধা দেওয়া যে জড়ের গোড়ার কথা, তা আমরা এই আলোচনায় দেখিলাম। আসলে এ বাধা যে অখণ্ড অনুভবসত্তায় অবিদ্যা বা অজ্ঞানের বাধা, তা আমরা একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি। কিন্তু সে যাই হোক, বাধা লইয়া এবং বাধা দিয়া জড় যেমন টিকিয়া আছে, তেমনি আবার বাধা অতিক্রম করিবার একটা স্বাভাবিক প্রেরণা জড়ের ভিতর দেওয়া আছে। এই স্বাভাবিক প্রেরণাটি আছে বলিয়াই জড় চুপ করিয়া বসিয়া নাই, চঞ্চল হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। ক ও খ দু'য়ের আপন আপন এলেকাতে নির্বিবাদে থাকিতে চায়, এটা ওটাকে বিনা বাধায় আপন এলেকার ভিতরে ঢুকিতে দেয় না। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা দেখি যে, একটা গিয়া অপরটার ঘাড়ে পড়িতেছে, এটার সঙ্গে ওটার ঘাত-প্রতিঘাত হইতেছে। এ ঘাত-প্রতিঘাতে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রকৃতির মালিক যিনি তিনিও আমাদেরই মত শক্তের ভক্ত ও নরমের যম। ক যদি নরম হয়, তবে খ গিয়া ক-কে চাপিয়া ধরে, তাকে কতটুকু করিয়া ফেলে। ক খ দুজনেই সমান হইলে ঘাত-প্রতিঘাতে উভয়েরই এলেকা কিছু না কিছু খাটো হইয়া যায়। ইংরাজিতে ইহাকে বলে impact স্বনামধন্য স্যার আইজ্যাক নিউটন জড়ের এই রকম impact লইয়া কয়েকটি আইন রচিয়া গিয়াছেন। সেই আইন কয়টির উপরেই আধুনিক জড়বিদ্যা একরকম প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া ধরা যায়। ক, খ'এর ঘা খাইয়া উল্টাইয়া ঘা দেয়; অহিংস নীতি জড়ের এলেকায় কোন মাহাত্ম্যই আজ পর্যন্ত চালাইতে পারেন নাই। নিউটন দেখাইয়াছেন যে ঘাত ও প্রতিঘাত এ দুইটা তুল্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ যেমন ঘাত, তেমনি প্রতিঘাত, যেমন ক্রিয়া তেমনি প্রতিক্রিয়া।

এই নিরন্তর ঘাত প্রতিঘাতের ভিতরে একটা সত্য আমরা প্রত্যক্ষ না করিয়া পারি না। সে সত্যটি এই—কোনো জড়ই আপন এলেকায় সুস্থির হইয়া থাকিতে রাজী নয়, সে চায় সে আরও বড় হইবে; সে তার প্রতিবেশীর এলেকাতে চড়াও হইয়া সেটুকু গ্রাস করিবে। এইটিই সেই স্বাভাবিক প্রেরণা, যার কথা আমরা একটু আগে বলিয়াছি। জড় কতবড় এলেকা পাইলে সন্তুষ্ট হয়? যতক্ষণ পর্যন্ত সে অসীম ও বিরাট না হইতেছে, সবই আপনাতে টানিয়া লইতে না পারিতেছে, ততক্ষণ তার স্বস্তি নাই। তাই সে অহরহঃ চলিতেছে, অপরের গায়ে পড়িতেছে, অপরকে আপন প্রভাবে বদলাইতে চাহিতেছে। সে নিজে যা, আর সবও তাই না হওয়া পর্যন্ত তার যেন শান্তি নাই। জড়ের ভিতর কোনো কোনো বস্তু খুব তেজাল ও রোখাল বলিয়া বোধ হয়, একটুতেই তাদের প্রভাব চারিধারে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। এক জায়গায় সামান্য একটু রেডিয়াম থাকিলে তার শক্তিব্যূহ যে কতদূর ছড়াইয়া পড়ে, তার সমাচার বৈজ্ঞানিক এখন আমাদের বেশ ভাল করিয়াই দিতেছেন। ঈথারের কোন স্থানে তড়িত-তরঙ্গ উৎপন্ন হইলে, সে গুলি বিনা তারেও যে কেমনধারা সুদূরে প্রসারিত হইয়া পড়ে, তা আমরা এই বেতার বার্তাবহের যুগে ভাল মতেই জানিতেছি।

আলোক-রশ্মি তড়িত-তরঙ্গ বলিয়াই এখন বৈজ্ঞানিকদের বৈঠকে সাব্যস্ত হইয়াছেন। এ আলোক-রশ্মি যে কতদুরের যাত্রী এবং চক্ষের পলকে সে যে কত দীর্ঘপথ চলিয়া থাকে, তা এখন আমাদের আর জানিতে বাকি নাই। এই সকল শক্তির খেলায় আমরা দেখিতে পাই যে, জড় ছোট হইয়াও আপন 'কোট' কতখানি বড় করিয়া লইতেছে। সামান্য সামান্য ব্যাপারেও এটা আমরা কিছু কিছু দেখিতে পাই। জলে একফোঁটা তেল পড়িলে সমস্ত জলের বুকের উপরে সেই তেলের ফোঁটাটি তৎক্ষণাৎ ছড়াইয়া পড়ে। ঘরের কোথাও একটুখানি কস্তুরী রাখিলে সমস্ত পাড়া তার গন্ধে ভরপুর হইয়া উঠে। এ-সব দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই যে, জড় ছোট হইয়া থাকিতে চায় না; আপনাকে বড় করিতে চায়। যে বাধা তাহাকে একটা গণ্ডীর ভিতরে পুরিয়া রাখিয়াছে, সে বাধাটি সে লঙ্ঘন করিতে চায়। সে চেষ্টা অহরহঃ তার ভিতরে চলিতেছে।

অনেক জড়বস্তুকে আমাদের নিতান্ত ভাল মানুষ গোবেচারি বলিয়া মনে হয়। ঐ একটা পাথর পড়িয়া রহিয়াছে, ওটাকে দেখিয়া মনে হয় না যে, ওর ভিতরে কোন রকম একটা বড় হবার বা ছোট হবার চেষ্টা আছে। আমরা দেখিতে জানি-না অথবা দেখিতে চাই না, বলিয়াই এই রকম করিয়া দেখি ও ভাবি। সে পাষাণপুরীতে কোনমতে ঢুকিতে পারিলে আমরা দেখিতাম যে, সেখানেও যে সত্তাশক্তিটি কঠিন নিগড়ে বাঁধা হইয়া পড়িয়াছেন, সে সত্তাশক্তিটিও "প্রাণপণে" সে বন্ধন হইতে আপন মুক্তির চেষ্টা করিতেছেন। তিনি অনন্তকাল ঐ পাথর হইয়া পড়িয়া থাকিতে নারাজ। প্রত্যেক পাষাণের ভিতরেই এইরূপে গৌতম-শাপভ্রষ্টা অহল্যার আত্মা একটা মুক্তির প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের পদরেণুর স্পর্শে পাষাণী মানবী হইয়াছিল শুনিতে পাই। কিন্তু প্রত্যেক পাথরের ভিতরেই যে একটা বদ্ধ সত্তা ভাবী মুক্তির আশা-পথ চাহিয়া রহিয়াছে, এ কথা আমরা একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব না কি? হিন্দুর দৃষ্টিতে পাথর বলিয়া আলাদা কোনো একটা জিনিস নাই। আত্মা বা অখণ্ড অনুভব-সত্তাই আপন লীলায় ও কর্মে ঐ পাথর হইয়াছেন। যতক্ষণ পাথর হইয়া আছেন, ততক্ষণ ঐ পাষাণপুরী হইতেছে তাঁর ভোগ-আয়তন বা ভোগ-শরীর। যেমন কর্ম তেমন ভোগ হইতেছে। ভোগের অবসানে সে ভোগ-আয়তনটি ভাঙ্গিয়া যাইবে; অপর ভোগের নিমিত্ত অন্য ভোগ-আয়তন তখন নির্মিত হইবে। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, জড় পদার্থের ভিতরেও বন্ধন হইতে মুক্তির একটা স্বাভাবিক প্রেরণা ও বন্দোবস্ত দেওয়া রহিয়াছে; বাধা যতখানি প্রবল, ততদিন বাধা ভাঙ্গিবার চেষ্টা থাকিলেও, বাধা রহিয়া যায়; ততদিন পাথর ঐ পাথর হইয়াই থাকে। কিন্তু ভিতরকার ঐ প্রেরণাটি প্রবল হইলে, বাধা শিথিল হইয়া আসে, এবং একদিন চলিয়াও যায়। তখন পাথরটি আর পাথর থাকে না, আর কিছু হইয়া যায়। পাথরের ভিতরে যে আকর্ষণটি গোপনে রহিয়া তাকে আত্মা বা স্বরূপে লইয়া যাইতে চায়, সেই আকর্ষণটি হইতেছে শ্রীরামের

পদ-স্পর্শ। লোকে যে বলিয়া থাকে, রাম নামে ভূত পালায়, ভূতের ভয় দূর হয়, সে অতি খাঁটি কথা। আমরা শ্রীরামকে যে রূপে এখানে চিনিলাম, সে রূপে প্রকাশ হইলে সত্য সত্যই ভূত আর ভূতভাবে চিরদিন থাকিতে পারে না। ভূতের ভয় আর কিছুই নয়, তার বাধা, তার গণ্ডী। এই বাধা বা গণ্ডীর "ভয়েই" পাথরটি পাথর হইয়া রহিয়াছে, নিজের অখণ্ড-অনুভবস্বরূপ যেন খোয়াইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু পাষাণ ও যে তপস্যানিমগ্ন—ব্রহ্মের জড় সমাধিমূর্তি!

যন্ত্র ও যন্ত্রী

ভূতসিদ্ধ, জড়পৌত্তলিক বৈজ্ঞানিকের "বেদের অপর এক সূক্ত" এই যে, এই জগতটা একটা বিরাট যন্ত্র মাত্র, ইহার কোথাও কোনরূপ স্বাধীনতা নাই, খোস খেয়াল নাই। এই বিরাট যন্ত্রের অন্তর্গত কোন একটা অবয়ব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চেতনই হউক আর অচেতনই হউক, ইহা দাবী করিতে পারে না যে, আমি স্বাধীন, আমি আপরুচি মত চলিব। সমগ্র যন্ত্রটা যে ভাবে চলিবে, সেই অঙ্গটিও সেই ভাবে চলিতে বাধ্য। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা একটা ছলনা মাত্র, ইহার কোন সত্য ভিত্তি নাই। জগতের মূল উপাদান সেই পরমাণুপুঞ্জ যে চালে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, ঠিক সেই চালে এই জগৎ এবং জগতের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ চলিতে বাধ্য আছে এবং থাকিবে। তারা যে পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, সে পথ হইতে এক চুল এদিক ওদিক হইবার অধিকার কোন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রাখেন না, সেই পথ নিয়তি। নিয়তি জড়, ইচ্ছা জ্ঞানাদি পরিশূন্য। আচার্য হক্সলি একবার বিজ্ঞানসভায় দাঁড়াইয়া জোরগলায় বলিয়াছিলেন যে, জগতের পরমাণুপুঞ্জের আদিম অবস্থার ভিতরে জগতের সমগ্র ইতিহাস একান্তভাবে নিহিত রহিয়াছে; যদি কোন সর্বদর্শী চক্ষু বিশ্বের সেই আদিম অবস্থা অবিকল পুরাপুরিভাবে দেখিতে পাইত, তবে তাহা গণিয়া বলিয়া দিতে পারিত যে, ১৯১৮ খৃঃ অব্দে পৃথিবীর ইউরোপখণ্ডে এক সর্বনাশী মহাসমরানল জ্বলিয়া উঠিবে এবং সেই সমরানলে জার্মাণীর বিশ্বগ্রাসী শৌর্য ও আভিজাত্যের অভিমান ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, জ্যোতির্বিদ যেমন গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থা গণিয়া বলিয়া দিতে পারেন—কবে, কোন্ সময়ে, কোন্ ধূমকেতুর উদয় হইবে, অথবা কবে কোন সময়ে কতক্ষণের জন্য সূর্যের বা চন্দ্রের কতখানি গ্রহণ হইবে। হক্সলি, হিকেল প্রমুখ পণ্ডিতদের ঐ জাতীয় কল্পনার সমালোচনা তখনকার দিনেও হইয়াছে, এখনও হইতেছে। জাঁদরেল বৈজ্ঞানিকেরা কেউ কেউ বৈজ্ঞানিক যুক্তির গরজেই জড়জগতের একটা গোড়া, আর সেই গোড়ায় একটা "অতিপ্রাকৃত" প্রভাব ও প্রচোদন মানিয়াছেন। কেউ বা ততদূর না মানিলেও, বলিয়াছেন—আমাদের বিজ্ঞানবিদ্যায় এমন কোন মারাত্মক সর্ত নাই, যাতে সেইরকম ধারা একটা অতিপ্রাকৃত ব্যাপার সম্ভাবনার মামলাটা সরাসরি খারিজ করিয়া দেওয়া চলিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—হালের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ জিনস্ সাহেবের লেখা এ প্রসঙ্গে পাঠ্য। বলা বাহুল্য যে ভারতবর্ষীয় ঋষিদের দৃষ্টিতে এই "পাষাণী" নিয়তি জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নহে। এই নিয়তির স্থানে ঋষিরা যাহাকে সার্বভৌম আধিপত্য দান করিয়াছেন, তাহার নাম ঋত। এই ঋতের পন্থা বিপশ্চিতেরা ভালমতে জানিয়াই বলিয়া গিয়াছেন। ঋত জীবের স্বাধিকার স্বাধীনতা হরণ করে না, বরং জীবের স্বাধীন ইচ্ছাকৃত কর্ম বা যজ্ঞই হইতেছে

ঋত। ঋত-যজ্ঞ-সত্য। ঋষিদের দৃষ্টিতে এই সমগ্র সৃষ্টি ব্যাপারটাই একটা বিরাট যজ্ঞ। ঋক্‌বেদ ও অথর্ববেদের প্রসিদ্ধ, পুরুষসূক্তে এই আদি যজ্ঞ কীর্তিত। স্বয়ং বিশ্বকর্মা বা প্রজাপতি এই মহাযজ্ঞের ঋত্বিক। এই যজ্ঞ বিশ্বকর্মার মানস যজ্ঞ, সৃষ্টিরূপ আহুতি বিশ্বকর্মার "কাম" "ঈক্ষা" বা "সঙ্কল্প"—এই আদিম বহ্নিতেই উৎসৃষ্ট। অথর্ববেদের প্রসিদ্ধ "কামসূক্ত" কি সুন্দর করিয়াই না এই আদিম ও চিরন্তন হবনের উদ্গাতা হইয়াছেন? তিনি ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব। সেই ইচ্ছা মাত্রেই তিনি বহু হইলেন; এই বিচিত্র বিবিধ জগৎ হইলেন। অতএব আমরা দেখিতেছি যে ঋষিদের দৃষ্টিতে সঙ্কল্পই (will to become) একেবারে গোড়ার কথা। ইহার আর কোন হেতু নাই, কৈফিয়ৎ নাই। এক অদ্বিতীয় তিনি, কেন, কোন উদ্দেশ্যে, এইরূপে বিশ্বরূপী, বহুরূপী সাজিলেন। তাহা নিরূপণ করার উপায় নাই। ঋষিরা রোমার ভাষায় বলিয়াছেন (যেমন বিষ্ণুপুরাণ ১।২।১৮, গরুড় পুরাণ ১।৪।৫)—বালকে যেমন খেলার ছলে ভাঙ্গে গড়ে, কোন উদ্দেশ্য তার খেলার পিছনে থাকে না, সেইরূপ সেই বিশ্বকর্মা ও এই বিশ্বটাকে লইয়া ভাঙ্গিতেছেন ও গড়িতেছেন, নিজের কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য লইয়া কিছু তিনি করিতেছেন না। যিনি নিত্যপূর্ণ, আপ্ত কাম, তাঁহার আর গরজ, বালাই কিসের? তাঁহার আদি যজ্ঞ সম্বন্ধে কোনরূপ জেরা বা কৈফিয়ৎ তোলা বা দেওয়া চলে না। (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৩) "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" বলিয়া সোজাসুজি হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। হালের বৈজ্ঞানিক (অবশ্য প্রবীণদের ভেতর ও কেউ কেউ) সকলে এখন জাগতিক কার্য-কারণ-শৃঙ্খলটাকে আগের মতন "নাগপাশের বাঁধন" সর্বথা ভাবিতেছেন না। এমন কি "ফিজিকাল ইভেন্ট" ও গড়পড়তায় মোটামুটি ঐ নাগপাশে ধরা দেয়, বাঁধা দেয়; স্বরূপে ও সাকল্যে দেয় কিনা সন্দেহ। সবই probable হইয়া দাঁড়াইতেছে। হয়ত সে ক্ষেত্রেও পিছনে আনন্দ ও লীলা রহিয়াছে। না, নাই—বলিবে কে আজ জোর করিয়া? বৈজ্ঞানিকের নিজের "ঘরওয়া খবর" আর ছাপা রহিতেছে কি? তিনি তাঁর গণিতের মূলসূত্রগুলিকেও —অন্য অন্য সূত্র ত দূরের কথা—অভ্রান্ত, সর্বদেশে সর্বকালে "স্বতঃসিদ্ধ" ভাবিতে পারিতেছেন কি? সবই কি "approximation" "average" "probability" এর হিসাব হইয়া দাঁড়াইতেছে না?

তারপর সেই আদিম পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ফলে যে সকল প্রজা এই সংসারে আসিয়াছে ও তারাও যে একেবারে কলের পুতুল, এমনটা ভাবিলে আমাদের চলিবে না। প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে নিজে প্রবেশ করিয়াছেন, এ কথার মানে এই যে প্রজাপতির সত্তাতে যে অনন্ত জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি রহিয়াছে, সেই শক্তি অল্পবিস্তর সসীম পরিচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টির সকল জীবের মধ্যেও বর্তিয়াছে; ছোট হউক, বড় হউক, সকল জীবই আপন আপন অধিকার অনুরূপ ভাগবতী সত্তা কিছু না কিছু ভোগদখল

করিতেছে। একটা ক্ষুদ্র ধূলিকণাতেও যখন তিনি বিদ্যমান, তখন আমাদের মনে করিতে হইবে যে সেই ধূলিকণাটিও তাঁহারই সত্তাতে সত্তাবান, সুতরাং সেই ধূলিকণাটির ভিতরেও কিছু না কিছু জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি বিদ্যমান আছে। জড়বিজ্ঞান যে গুলিকে পরমাণু, এটম প্রভৃতি বলিতেছেন, সে সকলের কোনটাই প্রকৃত প্রস্তাবে জড় নহে, ক্ষুদ্র নহে; প্রত্যেকটাই এক একটা বিশ্ব; প্রত্যেকটাই এক একটি বিশ্বেশ্বরের মন্দির। সুতরাং সেই গোঁড়া জড়বিজ্ঞানের সুরে সুর দিয়া আমাদের বলা চলিবে না যে, অণুর ভিতরে কেবলমাত্র জড়ত্ব আছে, প্রাণ বা চৈতন্যের কোন বীজ নিহিত নাই। বরং অণু যখন সেই মহান্ বিশ্বকর্মারই একটা ছদ্মবেশ, একটা গুহা, একটা পুরী, তখন আমাদের ইহাই মনে করা স্বাভাবিক যে, বাহিরের বেশটা বা আয়তনটা যতই তুচ্ছ, যতই ছোট হউক না কেন, তিনি সেই বেশে সাজিয়াছেন। সেই আয়তনে বিরাজ করিতেছেন; তিনি আসলে যা তাই-ই। এমন কি শ্রুতির সেই অপূর্ব ভাষায় পূর্ণ হইতে পূর্ণ বাদ দিলেও তিনি যে পূর্ণ সেই পূর্ণ ই রহিয়া যান।

আর কথা এই যে, সম্প্রতি কিছুদিন হইতে পশ্চিমদেশের জড়বিজ্ঞানেও এই তত্ত্বটিই উপস্থিত হইয়াছে। অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা বুক চাপড়াইয়া বলিতেন—আমরা এটমকে, শক্তিকে, বিধিকে নিয়তিকে ভালমতেই চিনিয়াছি; এটমের ভিতরে কোথাও রন্ধ্র নাই, ফাঁক নাই; সুতরাং খানিকটা শক্তি 'এটম' যে নিজের ভিতরে পুরিয়া রাখিবে, সে সম্ভাবনা নাই। বিলিয়ার্ড খেলার টেবিলের উপর লাঠির টক্কর খাইয়া বিলিয়ার্ড বলগুলি যেরূপ ছুটাছুটি ঠোকাঠুকি করে, বাহিরের কতকগুলি শক্তির প্রভাবে জড় এটমগুলি সেইরূপ অনন্ত শূন্য অথবা ঈথারে ছুটাছুটি ঠোকাঠুকি করিয়া বেড়াইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই বৈজ্ঞানিকের সেই অন্ধতামিস্রের জমাট ক্রমশঃ একটুখানি যেন পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। এখন ইলেকট্রন রেডিও ইত্যাদির অবতারের যুগে বৈজ্ঞানিকের চক্ষু হইতে অন্ধসংস্কারের ঠুলি ক্রমশঃ যেন খসিয়া পড়িতেছে এবং জড়ে প্রাণে এবং চৈতন্যে যে অভিন্ন তৈজস সত্তা বিদ্যমান, সেই সত্তাই আজ স্বহস্তে যেন বৈজ্ঞানিকের নবউন্মেষিত দৃষ্টিকে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা স্পর্শে ক্রমশঃ নির্মল করিয়া দিতেছেন। এই বিংশ শতাব্দীর কোন সমজদার বৈজ্ঞানিক এ কথা শুনিলে আর বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না যে, একটা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এটমের মধ্যে ও একটা গোটা বিশ্বের বন্দোবস্ত রহিয়াছে, সুতরাং একটা এটমের ভিতরেও অফুরন্ত তাড়িতশক্তির সঙ্গে বিজড়িত হইয়া অপ্রমেয় প্রাণশক্তি ও চৈতন্যশক্তি হয় ত থাকিলে থাকিতে পারে। এটমের বিরাট কূর্মরূপ বৈজ্ঞানিক তাঁহার নূতন চক্ষে একটু আধটু এরই মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু সে মহাকূর্মও যে আবার মহাকূর্মরূপী ভগবান, এ কথা বেশ করিয়া বুঝিতে তাঁর এখনও বোধহয় কিছু বিলম্ব আছে। যেদিন এটি তিনি বুঝিবেন, সেদিন তাঁহাতে ও ঋষিতে কোন তফাৎ থাকিবে না।

এক দিকে পশ্চিমদেশে জড়ের ও প্রাণের ভিতর দিয়া ভগবদ্বিগ্রহের সহিত বৈজ্ঞানিকের নব পরিচয় সুরু হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্য দিকে বিগত দুই তিন শতাব্দীর সেই মামুলি চিন্তার ধারা এখন ও সর্বত্র তার সাবেক খাত ছাড়িয়া নূতন দিকে মোড় ফিরিতে সুরু করে নাই। সুতরাং পশ্চিম দেশের চিন্তা জগতে বর্তমান কালে আমরা একটা অপরূপ অসঙ্গতি দেখিতে পাইতেছি, একটা গভীর "গাল্‌ফ্‌" যেন ও দেশের চিন্তার রাজ্যটিকে দুইটা এলেকায় বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। গাল্‌ফের অপর পারে কিন্তু একটা যুগান্তরের বিপ্লব উপস্থিত হইয়া সে-সকল সংস্কারগুলিকে চূর্ণ করিয়া দিয়া যাইতেছে। এপারের বাসিন্দার সঙ্গে ও পারের বাসিন্দাদের এখনও কারবার তেমন চলে নাই। রাজ্যের সেই মামুলি এলেকাতে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারাই অবশ্য দলে পুরা, সুতরাং তাঁহাদের মতই হইতেছে লোকায়ত। অপর পারের বাসিন্দারা সংখ্যায় দু'চারিজন মাত্র; দূর হইতে গড্ডালিকা প্রবাহপন্থী জনসঙ্ঘ সেই দুই চারিজন নব রহস্য পন্থীদের এবং তাহাদের উদ্ভুত মতবাদের পানে তাকাইয়া বিস্ময়ে হতভম্ব হইতেছে; সেই সকল "অদ্ভুত" মতবাদ তাহারা এখনও নিজেদের আট পৌরে জ্ঞান ও বিশ্বাসের ভিতরে টানিয়া লইতে পারিতেছে না। টানিয়া লইবার তাগিদও বা তেমন কৈ? কাজে কাজেই, এখনও পশ্চিমদেশে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সেই সকল মামুলি বকেয়া সিদ্ধান্ত ও অপসিদ্ধান্তগুলি কতক কতক বাহাল রহিয়াই গিয়াছে। ভগবানে বিশ্বাস কেহ বা করেন, কেহ বা করেন না, কিন্তু উভয় পক্ষই সেই মামুলি মলিকিউল, এটমস্‌, ইলেক্‌ট্রনস্‌ অথবা ঈথার বা "ফোরডাইমেনসনাল কন্‌টিন্যুয়াম" ইত্যাদি লইয়াই জগতের ইতিবৃত্তের অন্ততঃ প্রথম পরিচ্ছেদটি লিখিতে প্রয়াস পাইতেছেন। এখনও অনেকের জ্ঞানে ও বিশ্বাসে এই জগতের আদিম অবস্থা হইতেছে জড়ের অবস্থা; প্রাণের ও চৈতন্যের অভিব্যক্তি অনেক পরের কথা। একথাটা যেন "বিদ্বানের" কথা, ওয়াকিফ্‌হালের বার্তা। এ কথাটি না বলিলে হয় ত বিদ্বৎ বৈঠকে বসিতে এক কোণেও একখানা ভাঙ্গা ইট জুটিবে না।

পশ্চিমদেশে খৃষ্টিয়ান সমাজে বাইবেলে Book of Genesis হুবহু মানিতে প্রস্তুত আছেন, এমন ব্যক্তি কয়জন এখন বিদ্যমান তা বলিতে পারি না, ইডেন্‌ উদ্যানে মানবের আদিম জনক-জননী আদম ইভ সম্ভবতঃ অনেক বিজ্ঞ লোকের বিবেচনাতেই গির্জাবাসিনী ঠাকুরমার ঝুলিতে রূপকথার সামিল হইয়া গিয়া থাকিবেন। অবশ্য, মধ্যযুগ হইতেই "খৃষ্টিয়ান সায়েন্স" নামক একটা রহস্য বিদ্যা ও চলিত আছে। সে বিদ্যা 'বুক অব জেনিসিস্‌টি'কে তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, বিজ্ঞানের সঙ্গে মিল খাওয়াইয়া। এখন বোধহয় অধিকাংশ লোকের ধারণা ইহাই যে, মানুষ প্রথমে বনমানুষ আকারে এই ধরাপৃষ্ঠে দেখা দিয়াছে। গোড়াতে মানুষের দৈহিক আকৃতি অনেকটা বনমানুষের অনুরূপই ছিল এবং মানুষের মানসিক বিকাশ ও বনমানুষের সীমানা বড় বেশী ছাড়াইয়া

যায় নাই। তারপর নানা অবস্থা-বিবর্তনের মধ্য দিয়া, সম্ভবতঃ এই গত দশ পনর বিশ হাজার বৎসরের ভিতরেই মানুষের সভ্যতার সূচনা, মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রকৃত আরম্ভ। ইহার পূর্বে মানুষে ও পশুতে তফাৎ সেই দেড় হস্ত বই ছিল না। সুতরাং মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিলে, প্যালিওলিথিক বা প্রাচীন প্রস্তরযুগের যে স্তরে জিজ্ঞাসা ও মননের অঙ্কুরটি সবে দেখা দিতে সুরু করিয়াছিল, সেই স্তর হইতেই আমাদের আরম্ভ করিতে হইবে। এবং সে স্তরে ঐ অঙ্কুরটির অধিক আর বেশী কিছু অনুমান বা কল্পনা করিবার এক্তিয়ার আমাদের থাকিবে না। এ কল্পনা আমরা করিতে পারিব না যে, সেই প্যালিওলিথিক যুগে ভগবান মনুর মত, অথবা সপ্তর্ষিদের মত, উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক পদবীতে আরূঢ় কোন কোন পুরুষ সত্য সত্যই বর্তমান ছিলেন। জ্ঞানে, কর্মে, চরিত্রে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট, সে সব পরবর্তী কালে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে, পূর্ববর্তী কালে সে সকল ছিল না।

এই কষ্টিপাথরে ইতিহাসের ক্রমশঃ পর পর যুগগুলির যদি আমরা দর কষিতে যাই, তবে আমাদের আদিম যুগকে কোন মতেই স্বর্ণযুগ (Golden age) মনে করা চলিবে না। প্রথমে যে যুগ দেখা দিয়াছে, তাহা প্রস্তর যুগ; সে যুগে মানুষ এতটা বর্বর যে, ধাতুর ব্যবহার করিতে শিখে নাই। তারপর ধাতুর ব্যবহার যখন সে করিতে শিখিল, তখন অপকৃষ্ট ধাতুর "সভ্যতার" ধাতুগুলিকেই সে আপন প্রয়োজনে লাগাইতে পারিল। এইভাবে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে প্রাচীন প্রস্তর যুগ, নবীন প্রস্তর-যুগ, তাম্রযুগ, ব্রঞ্জযুগ, লৌহযুগ ইত্যাকার উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টযুগে বিভক্ত করিয়া সাজাইয়া তুলিয়াছেন—সেই লর্ড এড্‌বেরি ইত্যাদি যে ভাবে সূত্র ধরাইয়া দিয়া গিয়াছেন; স্বর্ণ-যুগ যদি সত্য সত্যই মানব সমাজে কখনও আসিয়া থাকে, তবে তাহারা অবশ্য পরবর্তী কালে আসিয়াছে বা আসিবে—সভ্যতার আদিম অবস্থায় আসে নাই।

বলা বাহুল্য যে, সকল দেশের পুরাণকারেরা অন্যরূপ বিশ্বাস ও ধারণা মনে পোষণ করিতেন। ভারতবর্ষে যেমন সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এইভাবে উৎকৃষ্ট যুগ হইতে অপকৃষ্ট আবর্তন বার বার হইয়াছে ও হইতেছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি অন্যান্য দেশেও প্রাচীন অভিজ্ঞান গুলিতে অনেকটা অনুরূপ বিশ্বাসের ছায়া আছে আমরা দেখিতে পাই। প্রাচীনেরা তাঁহাদের পূর্বপুরুষদিগকে বানর বা বানরের কুটুম্ব বানাইতে গররাজী ছিলেন। তাঁহাদের ধারণায় মানুষের আদিম যুগ সত্যযুগেরই মত একটা গৌরবের যুগ। আদিম মানবেরা হয় দেবতা ছিলেন, নয় ত বেদের ঋভুগণের মত দেবকল্প পুরুষ ছিলেন। সেই সকল দেবকল্প পুরুষ হইতে নানা দিকে নানা বংশশাখা নানাদেশ ও নানাযুগ ব্যাপিয়া প্রসারিত পল্লবিত হইয়া চলিয়াছে। পরবর্তীকালে সেই সকল বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা সাধারণতঃ সেই আদি নরদেবগণের সঙ্গে জ্ঞানে চরিত্রে শক্তিতে তুলনাযোগ্য হইতে পারেন নাই। ভারতবর্ষ বলিয়া কেন,

অপর অনেক প্রাচীন দেশে ভগবান মনু, এক অথবা অপর নামে, রাজবংশ ও অপরাপর বংশের প্রথম প্রবর্তকরূপে কল্পিত হইয়াছেন, কিন্তু প্রাচীনেরা এটা মনে করিতেন না যে, মনুর ভাবী সন্তানদের মধ্যে অনেকে জ্ঞানে চরিত্রে অথবা শৌর্যে স্বয়ং মনুকেও ডিঙ্গাইয়া যাইবেন। সুতরাং এইভাবে দেখিতে যাইলে আমাদের বলিতে হয় যে, ইতিহাসের রেখাটি ক্রমশঃ নীচে হইতে উপরের দিকে না উঠিয়া, উপর হইতে নীচের দিকে নামিয়া আসিয়াছে। শুধু চীনে কেন, সকল প্রচীন দেশেই, "সামাজিকেরা" আপন অবস্থাটিকে কতকটা ভ্রংশ, কতকটা পাতিত্যের অবস্থা মনে করিয়া গিয়াছেন। পিতৃপুরুষগণকে মহাজন ও উত্তমর্ণ এবং নিজদিগকে অনুগামী ও অধমর্ণ বিবেচনা করাই সাবেকী চিন্তার দস্তুর ছিল। এই কারণে প্রাচীনেরা তাহাদের পিতৃলোককে একটা উজ্জ্বল মহিমবর্ণে চিত্রিত করিতে চাহিতেন। পিতৃপুরুষেরা দেবতা অথবা দেবতাতুল্য না হইলে, তাঁহাদের যেন বিশ্বাস সুস্থির হইত না এবং শ্রদ্ধার অঞ্জলিটি যেন ভরিয়া উঠিত না। আধুনিকেরা প্রাচীনদের এই "রীত" করেন না বলিয়া, এবং ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহাদের থিওরি অন্যরূপ বলিয়া, প্রাচীনদের পুরাণ কথাকে রূপকথার সামিল করিয়া বসেন। তাঁহারা দেখিতে পান যে, প্রায় সকল প্রাচীন পুরাবিদেরাই পুরাকাহিনী লিখিতে বসিয়া গোড়ার একটা অবাস্তব, আজগুবী কল্পনার Mythologyর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা আক্ষেপ করেন যে, ভারতবর্ষ, মিশর, চীন, প্রভৃতি দেশে বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস পিছনে খানিকদূর পর্যন্ত যাইতে যাইতে শেষকালে এক একটা গল্প বা রূপকথার চোরাবালিতে নিজেকে লইয়া হাজির করিয়াছে। এই দৃষ্টিতে দেখিয়া ইঁহারা বিবেচনা করেন যে, বৌদ্ধযুগের পূর্বে ভারতবর্ষের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। অবশ্য কিছুকাল আগে মহেঞ্জদারো, হরপ্পার আবিষ্কার সেই ভয়াবহ "চোরাবালির" উপর দিয়া পুরাবৃত্তের বিশ্বাসযোগ্য সেতু গাঁথিতে সুরু করিয়া দিয়াছে।

তারপর, জড়বাদী বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার মূল থিওরি হইতে মানুষের ইতিহাসের প্রকৃতি ও ধারা সম্বন্ধে আর একটি সূত্র বাহির করিয়া থাকেন। জগতের ইতিহাসের মূল যখন জড় পরমাণু ও অন্ধ নিয়তি ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন মানুষের ইতিহাসে আমরা যদি কোন একটা নিরূপিত, নির্দিষ্ট পুরুষার্থ অথবা একটা নিয়ত বাহাল উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিতে চাই, তাহা হইলে ভ্রমে পতিত হইব, ঐরূপ একটা পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য অথবা ঐরূপ একটা উদ্দেশ্য লইয়া ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ঘটিতেছে না। একটা ধূমকেতুর উদয় অথবা একটা চন্দ্র সূর্যের গ্রহণ যেমন ধারা নৈসর্গিক নিয়তির বশে ঘটিয়া থাকে, তেমনি ধারা কোন একটা ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়তির দ্বারাই বাধ্য হইয়া থাকে। মানুষকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে লইয়া যাওয়াই ইতিহাসের উদ্দেশ্য, এমন মনে করিবার কোন অকাট্য যুক্তি বা স্বতঃসিদ্ধ হেতু নাই। যদি কার্যতঃ দেখা যায় উন্নতিই হইতেছে। তবে বুঝিতে হইবে যে তাহা নৈসর্গিক নিয়মে ঘটিতেছে,

কোনও দেবতা বা দানবের চেষ্টায় অথবা ব্যবস্থায় নহে। পক্ষান্তরে যদি দেখা যায় যে, কোন সমাজ-বিশেষের উন্নতি না হইয়া অবনতি হইতেছে, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, উহা নিয়তির ফলেই হইতেছে, উহার জন্য কোন দৈব অথবা দানবীয় নিয়ন্তা, ভাগ্য বিধাতাকে দায়ী করা ভুল। তলাইয়া দেখিলে, সেই সমাজ অথবা তার "পূর্বপুরুষ"ই বা সেটার জন্ম কতটুকু দায়ী? একটা যন্ত্র বা মেসিনের কোন কিছুতেই পক্ষপাত নাই, আপন নির্দিষ্ট প্রকৃতি ও নিয়মে চলিয়া যায়, সেইরূপ এই মানব-ইতিহাসের মূলে যে যন্ত্রটা রহিয়াছে তারও কোনদিকে কোনরূপ পক্ষপাত নাই। সে যন্ত্রের আবর্তনে মানুষের উন্নতিই হউক অথবা অবনতিই হউক, কল্যাণই হউক আর অকল্যাণই হউক, সুখই হউক আর দুঃখই হউক, যন্ত্র অথবা যন্ত্রের "অধিষ্ঠাত্রী দেবী" নিয়তি তার কোন তোয়াক্কা রাখে না। তাতে তার সম্পূর্ণ নির্বেদ। আমরা অভিমান করিতেছি যে, এই যন্ত্রের মালিক আমরা, সেটা আমাদের ভ্রম। প্রকৃত প্রস্তাবে, যন্ত্র আমাদের বাধ্য না হইয়া আমাদিগকেই বাধ্য করিয়া রাখিয়াছে। মানুষের অথবা অপর কোন লোকোত্তর নিয়ন্তার পুরুষার্থ চরিতার্থ করাই ইতিহাসের কাজ—এ আনাড়ীর কথা। এই গেল নিয়তির "নাগপাশ"। এ নাগপাশ ওদেশেও সম্প্রতি শিথিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক চিন্তার দিক্‌চক্রবালে গরুড় দেখা দিয়াছেন। বিষ্ণুর "পরম পদ" ইনি বহন করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষের ভাবুকেরা অনেকে জড়বাদীর এ কথাতে রাজী হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টিতে জীবের ভোগ ও অপবর্গ হইতেছে সৃষ্টির ও ইতিহাসের প্রয়োজন, কাজেই এ প্রয়োজন না থাকিলে আদৌ এ সৃষ্টির ব্যাপার হইত না ও চলিত না। পরমেশ্বর নিত্যপূর্ণ, সুতরাং সৃষ্টিতে তাঁর নিজের প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু জীবের কর্মানুরোধে, জীবকে তাহার কর্মানুরূপ বিচিত্র ভোগ এবং কর্ম-বাসনার ক্ষয়ে পরিণামে অপবর্গ দিবার জন্যই, তিনি এই সৃষ্টির খেলাটি এবং পাঠশালাটি পাতিয়া বসিয়া আছেন। পরমেশ্বরের দিক হইতে কোনরূপ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনের অবতারণা করা অসঙ্গত হইলেও, জীবের দিক হইতে সৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস যে অপ্রয়োজন, ইহা বলা যাইতে পারে, জীবের কর্ম ও অদৃষ্ট যখন এই সমস্ত ব্যাপারের মূলে, এবং অদৃষ্ট যখন কর্মের দ্বারাই নির্মিত, তখন মীমাংসকদের মত কর্মকেই এ জগতের প্রভু মনে করিলে হয়ত' অন্যায় করা হইবে না। আর ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, জীবের কর্ম কলের পুতুলের নাচমাত্র নয়। জীব চারিটি উপাদানে তৈয়ারী—জাতি, আয়ু, ভোগ ও কর্ম এই শেষের উপাদানটি আর তিনটির মূলে। অর্থাৎ জীবের যেমন কর্ম তেমনি জাতি আয়ু ও ভোগ হইয়া থাকে। কর্ম অন্যরূপ হইলে এ তিনটিও অন্যরূপ হইবে। কর্মের দ্বারা এ তিনটিকে বদলান সম্ভবপর। মার্কণ্ডেয় কর্মের দ্বারা কল্পান্তজীবী হইয়াছেন। বিশ্বামিত্র কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের গায়ত্রী মন্ত্রের দ্রষ্টা হইয়াছেন, স্বয়ং ইন্দ্র

অথবা ব্রহ্মা এঁরা কর্মফলেই ইন্দ্রত্ব অথবা ব্রহ্মত্বের অধিকার ভোগ করিতেছেন। কর্মের দ্বারা জাত্যাদি বিষয়ে উর্ধ্বগতি হইতে পারে। কর্মদ্বারা অধোগতিও সেইরূপ হইতে পারে। নহুষ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। নিয়তি এই কর্মের জননী নহে, কর্মই নিয়তির জনক। মানুষের ইতিহাস কেবলমাত্র যে একটা উদ্দেশ্যে চলিতেছে এমন নয়, সে উদ্দেশ্যে মানুষের পুরুষার্থ এবং সে পুরুষার্থের সিদ্ধি অথবা অসিদ্ধির জন্য মানুষ নিজেই মূলতঃ দায়ী।

ইয়োরোপ যে আজ ভোগের পথে ধাবিত হইয়াছে, চারিটি পুরুষার্থের মধ্যে অর্থ ও কামকেই বরণ করিয়া লইয়াছে, এরজন্য একটা বিরাট মমতাহীন জগদ্‌যন্ত্র অথবা একটা রাক্ষসী শয়তানী নিয়তিকে দোষী করিলে চলিবে কি? ইহাতে যদি কিছু দোষ, কোন সর্বনাশ হইয়া থাকে, তবে তার জন্য দায়ী মানুষ নিজে। পৃথিবীর পশ্চিম খণ্ডে আজ মদমত্ত মানবজাতি যে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে, সে যজ্ঞ যদি শান্তি যজ্ঞ না হইয়া মারণ-উচ্চাটনাদিরূপ অভিচার যজ্ঞ হইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য মানবের ভাগ্যবিধাতা কোন এক নিষ্ঠুর অপদেবতাকে দায়ী করিলে চলিবে না, সে যজ্ঞের যজমান্, হোতা ও ফলভাগী মানুষ নিজে। পুরাকালে ভারতবর্ষে ত্যাগ ও সংযমের আদর্শ অনুসরণ করার যত্ন হইয়াছিল; চারিটি পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষকে শ্রেষ্ঠ পদবী এবং ধর্মকে তার নীচেই আসন দেওয়া হইয়াছিল, অর্থ ও কামকে, ধর্ম ও মোক্ষের অবিরোধে সেবা করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। অন্ততঃপক্ষে, এইটাই ছিল তার বরেণ্য আদর্শ। ফলে, ভারতবর্ষের সভ্যতা পৃথিবীর ইতিহাসে একটা অপূর্ব সামগ্রী হইয়াছে। বর্তমান যুগের সভ্যতার সহিত ইহা আকৃতিতে অথবা প্রকৃতিতে মিলে না। এ সভ্যতা যে একটা বাহিরের বন্দোবস্তের ফল, নিয়তির অযাচিত দান, ভারতবর্ষের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা, সাধনা ও তপস্যার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই, এমনটা কে মনে করিবে? ভারতবর্ষে যজ্ঞ যে অভিচার না হইয়া শান্তিকর্ম, স্বস্ত্যয়ন হইয়াছিল, ইহা কেবল এইজন্যই যে, ভারতবর্ষ নিজে শান্তি ও স্বস্তিকে মধ্যে বরণ করিয়া লইয়াছিল, সাধনার মধ্যে অঙ্গীকার করিয়াছিল, তাহার জন্য যে যোগ ক্ষেম ও তপস্যা করা আবশ্যক, তাহা যে ধীর ও অকুণ্ঠিতভাবে করিতে পারিয়াছিল, ফল যদি শুভ হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, বাসনা শুভ ও চেষ্টা সাধু হইয়াছিল; সিদ্ধি যদি উত্তম হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে সাধন ও তদনুরূপ ও তদুপযোগী হইয়াছিল। ফল কথা কি বর্তমান ইয়োরোপে, কি প্রাচীন ভারতে বা অন্যত্র, মানুষ নিজের ইতিহাস নিজে গড়িয়া লইয়াছে। পুরাপুরিভাবে না হউক, অন্ততঃ মোটামুটি ভাবে যে, এ পক্ষে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের বর্তমান পাতিত্যের অবসাদ ও দৈন্যের ইতিহাসও তাহার স্বেচ্ছাকৃত।

প্রকৃতির ঋতু পরিবর্তনের ন্যায়, প্রাণীর জাগরণ ও স্বপ্নের ন্যায়, জাতির ভাগ্যেও

উত্থান পতনের, সুখ দুঃখের, একটা চক্রবৎ আবর্তন আছে বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে এই চক্রের আবর্তনে যেটি নাভি, সেই নাভিকমলে কর্মদেব বিরাজমান। অন্ধ, জুলুমবাজ, জবরদস্ত নিয়তির সত্যকার স্থান সেখানে নাই। নাভিতে তার স্থান নাই কিন্তু অর প্রভৃতিতে স্থান আছেই মনে হইতেছে। যাই হোক্, এই যে কালচক্র, যার আবর্তনে জীবের ভাগ্যে সুখ দুঃখের পালা চলিয়াছে, সে চক্র সুদর্শনরূপে ভগবান বাসুদেবের করপদ্মেই বিন্যস্ত। সেই বাসুদেব যে বৈকুণ্ঠধামে বাস করেন সেই বৈকুণ্ঠধাম যে প্রাণীর অন্তরাত্মার বাহিরে বিদ্যমান এমন নয়। তিনি প্রাণীর অন্তরাত্মায় 'বাস' করেন এবং তিনি 'দেবন', অর্থাৎ ক্রীড়াশীল, বলিয়া বাসুদেব। জীবের জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সেই বাসুদেবেরই বিগ্রহ। সুতরাং জীবের কর্মও বাসুদেবের লীলাবিগ্রহ। এ কথাটার সাদা মানে এই যে, সে সত্তাটি মানুষের ভিতরে থাকিয়া কর্ম করিতেছে, যে সত্তা, ভাগবতী সত্তা, সে সত্তা স্বরূপে স্বাধীন, লীলাময়, কালরূপী সুদর্শনচক্র সেই কর্মদেবতাই হাতে করিয়া ঘুরাইতেছেন, এবং সেই ঘুরাইবার ফলেই জীবের ভাগ্যে কখনও সুখ, কখনও দুঃখ, জাতির ইতিহাসে কখনও উত্থান কখনও পতন ঘটিতেছে। কর্মদেবতা নিয়ত ক্রীড়াশীল বলিয়া এই চক্রের গতিও অবিরাম, এবং এই সংসার মহানাটকের অঙ্ক-গর্ভাঙ্কগুলির বিচিত্র দৃশ্যপটগুলির গোড়াও নাই শেষও নাই। কর্মদেবতা যদি নিষ্ক্রিয় হইতেন, তাহা হইলে কালচক্রের আবর্তনও থামিয়া যাইত, আর সঙ্গে সঙ্গেই এ মহানাটকের যবনিকা পতন হইত। কিন্তু কর্ম নিষ্ক্রিয় হইবার নহে, কাজে কাজেই, কাল ও চলিতেছে; আর এ মহানাটকও খাসা চলিতেছে।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, 'নৈমিষারণ্যের' দৃষ্টিতে ইতিহাসের ধারা কদাপি উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন নয়। জাহ্নবীধারার উৎপত্তি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুপাদপদ্মেই বটে, এবং স্থিতি ব্রহ্মার কমণ্ডলু ও হরজটাজালে, সন্দেহ নাই, কিন্তু গতি সেই ভগীরথের শঙ্খনিনাদ অনুসরণ করিয়া যেখানে কপিলশাপে ভস্মীভূত সগর-সন্ততিদের দেহাবশেষ পড়িয়াছিল, সেই অভিমুখেই। সেই লক্ষের অভিমুখে বলিতে গিয়া জাহ্নবী-ধারাকে বাধা পাইতে হইয়াছে বিস্তর, কিন্তু সে ধারা একান্তভাবে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। মানুষের ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধেও সেইরূপ মনে করা যাইতে পারে। জড়বাদী বৈজ্ঞানিক যাহাই বলুন না কেন, আমাদের ঋষি ও পুরাণকারের দৃষ্টিতে, মানুষের ইতিহাস সুরু হইয়াছে স্বয়ং ভগবানের সঙ্কল্পাত্মিকী তপস্যায়, সুতরাং জাহ্নবী-ধারার মতই ইতিহাসের ধারারও মূল উৎস—সেই বৈকুণ্ঠধামেই খুঁজিয়া পাইতে হইবে। যিনি মনু বা আদি মানব তিনি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার মানসপুত্র এবং স্বয়ং প্রজাপতি। মূল প্রজাপতির ঐশ্বর্য এবং বিভূতি মনুর মধ্যেও অনেকটা সংক্রমণ করিয়াছে।

তারপর ব্রহ্মার কমণ্ডলু মধ্যে এবং হরজটাজালে সুরধুনী যেরূপ নিজেকে গোপন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আদিমানবের ঐশ্বর্যময়ী ভাগবতী সত্তাও কতযুগে কতবার

আত্মগোপন করিয়া নিজেকে হ্রস্ব ও বামন সাজাইয়াছে। সেরূপ সাজাইবার ফলে মানুষের মধ্যে অনেক সময় আমরা সেই আদি মানবের পরিচয় ও অভিজ্ঞান হারাইয়া ফেলি। আমরা দেখি যে, মানুষ পশুর মতন হইয়াছে, বর্বর হইয়াছে, এবং আবার সেই পশুত্ব হইতে ধাপে ধাপে উঠিয়া মানবত্বে ও দেবত্বে বদরিকাশ্রম যাত্রা করিয়াছে। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষ সভ্যতায় ও ক্ষমতায় দৃপ্ত হইয়াও, নীচ শয়তান হইয়া রহিয়াছে; সর্বত্যাগী কৌপিনমাত্র সম্বল হইয়াও দৈবীসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াছে। মানুষের এই যে ছোট বড় মাঝারি নানান চেহারা, নানান ঢং, এ সকল হইয়াছে শুধু এই কারণেই যে, আদি মানব ইতিহাসের ধারায় অবগাহন করিয়া নিজেকে সব সময় স্বভাবে ও স্বরূপে বাহাল রাখেন নাই। নিজেকে গোপন করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মার কমণ্ডলু মধ্যে এবং রুদ্রের জটাজালে আবদ্ধ হইয়া থাকাতেই সুরধুনীর চরিতার্থতা নাই ত! ভগীরথ তপস্যা করিয়া সুরধুনীকে স্বর্গ হইতে এই ধরার ধুলায় লইয়া আসিয়াছেন। তিনি সুরধুনীকে সাগর-সঙ্গমে লইয়া না গিয়া ত ছাড়িবেন না; পতিত উদ্ধারে প্রতিশ্রুতা জাহ্নবীরও ত কোথাও গোপন হইয়া থাকিবার যো নাই! সুতরাং গোমুখীর দ্বারে তাঁহাকে ভূতলে নামিয়া আসিতেই হয়, আর ভগীরথের শঙ্খধ্বনির অনুসরণ করিয়া চলিতেই হয়। পথে ঐরাবতের বাধা, জহ্নুমুনির কোপ এবং পদ্মাসুরের প্রলোভন—এ সকল অন্তরায় অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে যাইতেই হইবে সেইখানে, যেখানে উদ্ধত সগর-সন্ততিদের আত্মা তাঁর পুতসলিল স্পর্শলালসায় ব্যাকুল ও উন্মুখ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে!

ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। যুগে যুগে দেশে দেশে, মানুষ নিজেকে কতবার পশু বানাইয়া ফেলিয়াছে, বর্বর ও দানব করিয়া তুলিয়াছে। ফলে, ইতিহাসের মূলে যে ভাগবতী মানবসত্তা সেটি কতবার বহুধা গোপন হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু একেবারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পারে নাই। ইতিহাসের যেটি চরম লক্ষ্য ও গন্তব্য স্থান, সেই অভিমুখে ইতিহাসকে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া চলিতেই হইয়াছে। সেই চরম লক্ষ্য হইতেছে জীবের মুক্তি। দুঃখ হইতে পরিত্রাণ, বন্ধন হইতে অব্যাহতি, স্বাধীনতা, স্বরাজ্য। পতিত সাগর-সন্ততি দুঃখনিপীড়িত বদ্ধ জীবের দৃষ্টান্ত। কপিল 'আদি-বিদ্বান্'। সাক্ষাৎ বিবেক ও জ্ঞান। সেই বিবেক ও জ্ঞানকে অবহেলা ও উপেক্ষা করিয়া জীবের এই পাতিত্য ও ভস্মীভূতত্ব। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ"; আত্মাই হইতেছে আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই হইতেছে আত্মার শত্রু। বাহিরে কেহ শত্রু বা মিত্র নাই। আত্মার উদ্ধারের ভার আত্মাকেই লইতে হইবে। ভগীরথ সেই আত্মা—মুমুক্ষু আত্মা। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—আত্মাই আত্মজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। সগর কুলোদ্ভব ভগীরথ সগর-সন্ততি হইতে অভিন্ন। সগর-সন্ততি ও আত্মা, ভগীরথও আত্মা। বিশেষ এই

যে, একজন বদ্ধ ও অভিমানী ; অপরজন মুমুক্ষু ও নিরভিমান। সুতরাং একজন পতিত, অপরজন উদ্ধারকামী। এই মুমুক্ষু আত্মা, উদ্ধারকারী আত্মা—শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে সুরধুনীরূপ ইতিহাসের ধারাটিকে চালাইয়া গন্তব্যের অভিমুখে লইয়া যাইতেছেন। যোগীরা বলিবেন, শঙ্খধ্বনি হইতেছে মহামন্ত্র প্রণবের প্রতিনিধি ও প্রতীক ; কেন না "তজ্‌জপস্তদর্থভাবনম্‌" ছাড়া জীবের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই।

আমরা আর একটু স্থূল দৃষ্টিতে দেখিয়া মনে করিতে পারি যে শঙ্খধ্বনি হইতেছে জীবের অন্তরাত্মা হইতে উত্থিত দুঃখ নিবৃত্তির জন্য একটা ব্যাকুল, আর্ত অথচ আশায় ভরা সুর। যে সুরে বেদনার সঙ্গে আনন্দ, এবং উৎকণ্ঠার সঙ্গে অভয় মাখামাখি করিয়া রহিয়াছে, সেই সুর। এটি বিশ্বমানবের আত্মাকে বন্ধনও দুঃখের নাগপাশ হইতে শান্তির অভিমুখে লইয়া যাইবার প্রয়াস পাইতেছে। মানুষ ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে, ভুলভ্রান্তি করিয়াছে বিস্তর, পৈশাচিক ও দানবীয় খেলায় মাতিয়াছে বারবার। এই সেদিন ইয়োরোপে মহাকুরুক্ষেত্র হইয়া গেল। সে ত মানুষের দানবী-লীলার একটা উৎকট ও তাণ্ডব বিলাস। এইরূপ বার বার ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিবে। আদি বিদ্যানকে অবহেলা করিয়া মানুষের এই দুর্গতি এবং পাতিত্য। যখন একটা প্রকাণ্ড দম্ভ ও মোহ ঐরাবতের মত তার বিরাট বপু লইয়া আসিয়া ইতিহাসের ধারাকে সম্বোধন করিয়া বলে—"ওগো তুমি আমাকে ভজনা কর"—তখন সত্য সত্যই প্রাণে ভয় হয় যে, ইতিহাস হয় ত চিরদিনের তরে দম্ভ ও অভিমানকেই বরণ করিয়া রসাতলে, জাহান্নামে যাইবে ; কিন্তু মুমুক্ষু আত্মার ব্যাকুল আর্তনাদ শুনিয়া ইতিহাস দম্ভ ও অভিমানকে একান্তভাবে বরণ করিয়া লইতে পারে নাই কোনদিনও। কিছুকালের জন্য দম্ভ ও অভিমান ইতিহাসের ধারাকে রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেও শেষকালে দেখা গিয়াছে ইতিহাসের আবেগ তার সকল স্পর্ধা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

অতীতকালে রোমান্ ঈগল্ সসাগরা ধরিত্রীকে নিজের পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিয়া এমনি ধারা একটা দুর্জয় দম্ভের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল, কিন্তু সে দম্ভ শেষ পর্যন্ত টিকে নাই—এখন সে রোমান ঈগল্ চটকের না হউক পারাবতের ভূমিকাতেই বেশ তৃপ্ত হইয়াছেন দেখিতেছি। আর সেদিন ত জার্মানীও সেই পুরাতন ভূমিকাটি নূতন করিয়া অভিনয় করিতে চাহিল—সমগ্র ইতিহাসটিকে নিজের "Kultur" ছাঁচে ঢালিয়া লইতে মনস্থ করিল। কিন্তু ইতিহাস তার শাসন মানিয়াও মানিল না, তার ছাঁচের ভিতর ঢুকিয়াও ঠিক ঢুকিতেছে না। মানব সমাজ এইভাবে নানা আকারে ঐরাবতের ভূমিকা বার বার অভিনয় করিয়াছে। কখনও বা পুরাতন কার্থেজের মতন ধনগর্ব, কখনও বা রোমের মত সাম্রাজ্য-গর্ব, কখন ও বা জার্মানীর শৌর্য ও সভ্যতার গর্ব। গর্ব এইরূপ নানা পোষাক পরিয়া বার বার ষ্টেজে নামিয়া ঐরাবতের সেই মামুলি পাটটি অভিনয় করিয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, ষ্টেজের ড্রপসীন্ এখন ও পড়ে নাই। সাজ পোষাক ও দৃশ্যপটগুলি

বদলাইয়াছে, বদলাইতেছে মাত্র। দস্তুকে যে কয়টি চেহারায় আমরা অভিনয় করিতে দেখিয়াছি, এখনও সেই কয়টি চেহারায় সে অভিনয় করিয়া যাইতেছে। নূতন দুই একটা চেহারাও হয় ত হালে দেখা দিয়া থাকিবে। ডিমোক্রাসির গর্ব, সায়েন্সের গর্ব, কুলটুরের গর্ব, ইণ্ডাষ্ট্রির গর্ব, এমন কি সাহিত্য শিল্পেরও গর্ব। এ সব গর্ব একেবারে নূতন না হইলেও এ সকলের বর্তমান ধরণটি কতক কতক নূতন।

ইতিহাসের পথে কেবল যে ঐরাবতই একমাত্র বাধা এমন নহে, জহ্নুমুনির কোপ এবং পদ্মাসুরের প্রলোভনের বাধাও আছে। এ দুইটি বাধা যে কি, তাহা সুধী ব্যক্তি ভাবিয়া দেখিবেন। আমরা এ স্থলে আর কিছু বলিব না। আমাদের মোদ্দা কথাটি এই যে, মানুষের ইতিহাস নানা অবস্থা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়াও একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যের পানে চলিয়াছে। এরূপ হইবার কারণ এই যে, যে মহাপাদপের শাখা হইতেছে মানবের ইতিহাস, সেই মহাপাদপের বীজটাই একটা স্থির বিশ্বজনীন উদ্দেশ্য লইয়াই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। গাছের একটা ডালে যদি আমরা দেখি যে এক রকমের পাতা ও ফুল ও ফল হইতেছে। তবে ইহাই মনে করিতে হইবে যে, সেই গাছের গোড়াতে সেই রকম পাতা ফুল ও ফল হবারই বন্দোবস্ত দেওয়া আছে। মানুষের ইতিহাস, জগতের ইতিহাসের একটি শাখা। মানুষকে বিশ্ববৈঠকে একান্তভাবে "একঘরে" করার চেষ্টা মিছে। বিশ্বব্যবস্থা একটা বিরাট স্নায়ুযন্ত্রেরই মতন। অথবা আগে যা বলিতেছিলাম—একটা মহাবৃক্ষেরই মতন। ঋক্‌বেদ সংহিতা (১।১৬৪।২২) "বৃক্ষের" কথা বলিয়াছেন। বায়ুপুরাণ, ৯ম অধ্যায় ১১৩—১১৬ শ্লোক ও ১১৯ শ্লোক এই মহাবৃক্ষের নিদান, অবয়বসংস্থান শুনাইয়াছেন। এটি "ব্রহ্মবন"। এই ব্রহ্মবনে স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মাও "দিশেহারা"। জগতের ইতিহাস একটা মহান অশ্বত্থবৃক্ষ বা ব্রহ্মবন। একটি অব্যক্ত বীজশক্তি লইয়া এই বিপুল অশ্বত্থের বিকাশ হইয়াছে ও হইতেছে। সেই বীজশক্তিরই এইটি মূল বন্দোবস্ত যে, মানুষ আদর্শ মানব হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও নিজ কর্ম-গুণে বা দোষে অপূর্ণতা বন্ধন ও দুঃখের মধ্যে গিয়া পড়িবে। এবং তাহা হইতে নিজেকে আবার মুক্ত করিতে চাহিবে। গোড়ায় আদর্শ, মাঝখানে আদর্শ হইতে বিচ্যুতি বা পতন, শেষ কালে আবার আদর্শের দিকে যাত্রা। মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিজীবনের এই ভঙ্গীটি তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি। যদি আমরা মনে রাখি যে, সৃষ্টির মূলে অব্যক্ত বীজশক্তির প্রেরণার মধ্যেই ইহার বন্দোবস্ত নিহিত রহিয়াছে। গাছের কোন একটা ডালে কখনও বা পাতা ফুল ফল গজায়, কখনও বা তাহারা বেশ পরিপুষ্ট হয়। কখনও বা তাহারা পাকিয়া ঝরিয়া পড়ে। ইহার কৈফিয়ৎ পাতা ফুল বা ফলের ভিতরে এমন কি সেই ডালটির ভিতরে খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না। কৈফিয়ৎ খুঁজিতে হইবে মূল গাছটারই গোড়ায়। জড় নিয়তিবাদীও তাই খোঁজেন—এক ভাবে; আদর্শবাদীও খোঁজেন অন্যভাবে। নিয়তিবাদি খুঁজিয়া যেটিকে বাহির করেন, সেটি হইতেছে—

যন্ত্র বা মেসিন। আদর্শবাদী যাঁকে খুঁজিয়া পান, তিনি যন্ত্রী:—তিনি একহাতে শঙ্খ ধরিয়া শব্দপ্রভব বায়ুর বিশ্বযন্ত্রটার বীজশক্তি বপন করিতেছেন। আর এক হাতে পদ্ম ধারণ করিয়া সেই যন্ত্রবীজটিকে উত্তরোত্তর অভিব্যক্ত করিতেছেন, আর একহাতে চক্র ধরিয়া যন্ত্রটিকে কালশক্তিতে চালাইতেছেন। এবং আর এক হাতে গদা লইয়া যন্ত্রটিকে আবার ভাঙ্গিতেছেন। এ চারিটি ব্যাপার যুগপৎ চলিতেছে। মানুষের ইতিহাসে পাওয়া জিনিসের হারানো এবং হারানো জিনিসের নূতন করিয়া পাওয়ার চেষ্টা চলিতেছে এই কারণেই যে, যিনি এই সৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোত লীলাময়। তিনি সাধ করিয়া হউক আর যে জন্যই হউক, এই মজার লুকোচুরি খেলাটি চালাইয়া দিয়াছেন। তিনি নিজে যে খেলা খেলিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্ট সকল পদার্থ সেই খেলা খেলিয়া যাইতেছে। বিশেষ এই যে, তিনি খেলেন সাধ করিয়া, "ক্রীড়তো বালকস্যেব" আমরা খেলি "দায়ে" পড়িয়া। তাঁহার খেলার আদি অন্ত মধ্যে আনন্দ; আমাদের খেলাতেও তলায় তলায় তাই। তবে আনন্দ ঢাকিয়া যে জ্বালা ব্যথায় ও বেদনায় ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাতে এও বলিয়া ফেলিতেছি—"সর্বং দুঃখং দুঃখম্"। ঝকমারি বটে।

গোড়ার ছবি-নূতন ও পুরাতন

তলাইয়া দেখিতে গেলে, গোড়ার কথা বা সৃষ্টিতত্ত্বের ভিতরেই ইতিহাসের বীজ রহিয়াছে। কেমন করিয়া, কি লইয়া, গোড়া-পত্তন হইয়াছে, তাহা না জানিলে ও বুঝিলে ইতিহাসের আসল প্রকৃতি ও আকৃতি, গতি ও ভংগী—এ দুয়ের কোনটাই, ভালমতে জানিতে ও তলাইয়া বুঝিতে পারা যাইবে না। ভারতবর্ষের পুরাণকার এইজন্য সৃষ্টিতত্ত্ব হইতেই পুরাণ-কথা সুরু করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৬ অধ্যায়ে পরাশর-মুখে পুরাণ-লক্ষণ এবং পুরাণগুলির নাম কথিত হইয়াছে। "সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। সর্বেষ্বেতেষু কথ্যন্তে বংশানুচরিতঞ্চ যৎ ॥ ২৫ ॥" ইত্যাদি। এইটাই হইল স্বাভাবিক ব্যবস্থা—বীজ হইতে গাছের আরম্ভ ও বিকাশ যেরূপ। বীজ একরকমের না হইয়া যদি অন্য রকমের হয়, তাহা হইলে গাছেরও সে রকমের না হইয়া অন্য রকমের হওয়াই স্বাভাবিক। নিছক জড়বাদীদের মতো যদি আমরা ভাবি যে কতকগুলি অণু পরমাণুর সংঘাতে এই জগতের গড়ন ও ভাঙ্গন চলিতেছে, ঐ ব্যাপারের মূলে চিৎ-শক্তির কোনরূপ কর্তৃত্ব বা প্রভাব নাই, তাহা হইলে জগতের ইতিহাসের বীজতত্ত্বটি এক রকমের হইল; এবং সে বীজ হইতে ইতিহাসরূপ পাদপটির বিকাশও এক রকমের হইবে। বহুদিন পূর্বে W. K. Clifford যেমন-ধারা বলিয়াছিলেন—"On the whole, therefore we seen entitled to conclude that during such time as we have evidence of, no intelligence or volition has been concerned in the events happening within the range of the solar system, except that of animals living on the planets." কথা কটা সতর্ক-ভাবে বলা হইলেও, স্পষ্ট। সবই অণু পরমাণুর নিজেদেরই খেলা হইলে, গোড়াতে ভগবান্, দেবযোনি, সপ্তর্ষি, মন্বাদি—এই সকল উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক-বিভূতি-সম্পন্ন সত্তার কল্পনা করা চলে না। এ কথা বলা চলে না যে, প্রজাপতি ও মনু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অলৌকিক পুরুষেরা এই জগতের ধারাটিকে চালাইয়া দিয়াছেন, এবং এই ধারা কোন্ কোন্ প্রণালীতে কোন্ কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত হইবে, তাহা ধার্য করিয়া দিতেছেন। সর্গ, প্রতিসর্গ মন্বন্তর ও যুগান্তর—এ সকল পুরাণকার যে ভাবে আমাদের শুনাইয়াছেন, সে ভাবে আদৌ ঘটিতে পারে না। প্রসঙ্গ ক্রমে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল—ন্যায়-বৈশেষিক-দর্শন স্বতন্ত্র পদার্থ ও সমবায়ি কারণ রূপে পরমাণু প্রভৃতি মানিয়াছেন বটে, কিন্তু আত্মা, পরমেশ্বর, দিক্, কাল, আকাশ—এ সকল তত্ত্বের স্বীকারের ফলে সিদ্ধান্ত মোটেই জড়বাদ হয় নাই। দেহাতিরিক্ত আত্মা ও জগৎকর্তা পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত করিতে আচার্যেরা

প্রচুর যত্ন করিয়াছেন। ম্যাক্‌ডোনেল প্রমুখ পণ্ডিতেরা (History of sanskrit Literature, pp. 385 ff.) ষড়দর্শনের মধ্যে অন্ততঃ চারিটিকে গোড়ায় নিরীশ্বর ছিল বলিয়া অনুমান করেন। যথা—P. 405—"Neither the Vaisheshika nor the Nyāya Sutras originally accepted the existence of God ; and though both school later became theistic, they never went so for as to assume a creator of matter. Their theology is first found developed in Udayanacharya's Kusumanjali which was written about 1200 A. D. etc." ষড়দর্শনগুলির কোন কোনটির মূল খৃঃ পূঃ অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইঁহারা বলেন। এ ক্ষেত্রে এ কথার আলোচনা অনাবশ্যক।

যাহা হউক, পাশ্চাত্য জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের সুরে সুর দিয়া আমরা বলিতেছিলাম যে, অণু পরমাণুগুলি নৈসর্গিক নিয়মে নানা রকম জোট বাঁধিয়া প্রথমতঃ জড় জগতেরই একটা কাঠামো তৈয়ারি করে; সে কাঠামো প্রাণহীন, সংজ্ঞাহীন, বুদ্ধি-বিবেকহীন। সেই কাণ্ট, লাপ্‌লাস্ প্রভৃতি যে আকারে স্তেবুলা হইতে সৌরজগতাদির নক্সা ছকিয়াছিলেন; অথবা পরবর্তী কালে অপরে যে আকারে ছকিয়াছেন বা ছকিতেছেন। অবশ্য, যে কেহ এ কাজে হাত দিয়াছেন, তিনিই যে নাস্তিক, এমন কোন নিয়ম হইয়া নাই। তারপরে, সেই বিশ্বকারখানায় অণু-পরমাণুদের নানারূপ গড়ন-পেটন ও জোড়াতালির সঙ্গে ক্রমশঃ প্রাণ ও সংজ্ঞা অভিব্যক্ত হয়। সেই চার্বাকগণ যেরূপ বলিতেন,—চুণ ও হরিদ্রা এ দুয়ের কোনটাতেই লৌহিত্য নাই; দুয়ের সংমিশ্রণে লৌহিত্য আগন্তুকরূপে আসিয়া হাজির হয়। জড়বাদী বৈজ্ঞানিকও সেইরূপ বলিবেন—কার্বণ পরমাণু এ দুয়ের কোনটাতেই প্রাণ নাই; প্রধান ভাবে এ দুই পদার্থের একটা বিশিষ্ট রাসায়নিক সংযোগ হইলে প্রাণ আসিয়া দেখা দেয়; তখন সেই যৌগিক পদার্থে আমরা প্রাণের লক্ষণগুলির পরিচয় পাই; যতক্ষণ সেই সংযোগবিশেষটি বাহাল থাকে, ততক্ষণ পর্যন্তই সে পদার্থটি প্রাণী; কোন রকমে সেই সংযোগটি ভাঙিয়া গেলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণেরও শেষ হইয়া যায়। এ প্রসঙ্গে "Colloidal Theory" ইত্যাদি চিন্তনীয়। এই ভাবে দেখিতে গেলে জগতের গোড়ায় প্রাণ বলিয়া কিছু ছিল না, প্রাণের প্রাণহীন মসলাগুলিই বিদ্যমান ছিল; ভাবীকালে, কোনরূপ নৈসর্গিক বা আকস্মিক কারণে, সেই মসলাগুলি মিলিয়া মিশিয়া প্রাণ নামক বস্তুটি পায়দা করিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেকে (সকলে নহেন) প্রাণের নৈসর্গিক উৎপত্তিবাদ (Spontaneous Generation) অথবা প্রাণহীন হইতে প্রাণের উৎপত্তি (Abiogenesis) মানিয়াছেন। অবশ্য, বিশ্বব্যাপী প্রাণসত্তা (Cosmozoic Theory) ইত্যাদিও ও-দেশে বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা কখন কখন স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে প্রাণ সম্বন্ধে ধারণার কতকগুলি স্তর আমরা দেখিতে পাই। (১) প্রাণ=ব্রহ্ম; (২) প্রাণ=হংস=বৈশ্বানর=আদিত্য=হিরণ্যগর্ভ; (৩) প্রাণ=অণু;

(৪) প্রাণ—প্রাণাপানাদি কতিপয় "বায়ু"। মোটামুটি এই কয়েকটা স্তর। এ সকলের সম্যক্ বিচার এ দেশের দার্শনিকেরা করিয়াছেন। তবে কোন আস্তিক সম্প্রদায়েই প্রাণকে একেবারে জড় পরমাণুর সমষ্টির বৃত্তি বা বিকার মনে করা হয় নাই। "জড়" কথাটা আমাদের সাবধানে ব্যবহার করিতে হইবে। এটি পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের জড় বা "ম্যাটার" নয়। সাংখ্য-দর্শনে প্রকৃতি—জড়, কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃতি—"ম্যাটার" নয়। সাংখ্য-কারিকায় দেখিতে পাই—"স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্য-সৈষা ভবত্যসামান্যা। সামান্য-করণ-বৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ॥" (২৯) "অন্তঃকরণত্রয়ের আপন আপন লক্ষণ, অর্থাৎ বুদ্ধির অধ্যবসায়, অহঙ্কারের অভিমান ও মনের সঙ্কল্প অসাধারণ বৃত্তি; উহাদের সাধারণ বৃত্তি প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু॥"

জড়বাদীর মতে, ভবিষ্যতে যদি জড়জগতের প্রকৃতি ও অবস্থা বদলাইয়া যায়, তবে হয়ত আবার সেই মিশ্রিত মস্‌লাগুলি (কার্বন্, হাইড্রোজেন্ ইত্যাদি আলাদা আলাদা হইয়া যাইবে, সুতরাং তাদের সৃষ্টি, প্রাণও অন্তর্হিত হইয়া যাইবে; তখন আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রাণ ও প্রাণী বলিয়া কিছু থাকিবে না। প্রাণের "বস্তু" প্রোটোপ্লাজমের দানা বা মলিকিউল্ ত জটিল যৌগিক বস্তু; সে ত' হামেশাই ভাঙিয়া যাইতে পারে যাইতেছেও; কেমিকাল্ এটম্‌গুলোই ভাঙিয়া যাইতেছে, এবং সম্ভবতঃ নূতন করিয়া পায়দাও হইতেছে। প্রাণীজগতে ইভোলিউশনের মতন, জড়জগতেও ইন্‌অরগ্যানিক্ ইভোলিউশন্ হইতেছে। এখনও পণ্ডিতদের অনুমানে এই বিপুল বিশ্বের মাঝে বোধহয় মাত্র গোটা দুই রেণুর উপরে প্রাণ ও প্রাণী বাস করিতেছে; তাছাড়া আর সকল জায়গাতেই প্রাণের কোন সাড়া আমরা পাইব না। সেই রেণু দুইটি হইতেছে আমাদের এই ধরিত্রী, আর হয়ত' ধরণীগর্ভ-সম্ভূত, লোহিতাঙ্গ "কুমার" মঙ্গলগ্রহ। ওই যে সাক্ষাৎ জ্যোতিঃপিণ্ড ভাস্করদেব, উনি হালের পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে, খানিকটা বেজায় গরম ভূতের গোলা; উঁহার উত্তাপ কয়েক হাজার ডিগ্রির কম নয়; উঁহার বিশাল কুক্ষিদেশে আমাদের এই পৃথিবীর মত তের লক্ষটা গ্রহ স্বচ্ছন্দে বেমালুম ভাবে বাস করিতে পারে; কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে—ওই বিরাট বিপুল তৈজস বপু একেবারে প্রাণহীন মৃত। পুরাণে আছে, দেবমাতা অদিতির গর্ভে মৃত অণ্ড হইতে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া সূর্যদেব "মার্তণ্ড" আখ্যা পাইয়াছিলেন। যথা—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১০৫ অধ্যায় ১৯ শ্লোক—"মারিতং তে যতঃ প্রোক্তমেতদণ্ডং ত্বয়া মুনে। তস্মান্মুনে সুতস্তেঽয়ং মার্তণ্ডাখ্যো ভবিষ্যতি॥" হালের বৈজ্ঞানিক বলিবেন—মার্তণ্ড কেবল যে মৃত অণ্ড হইতে জন্মিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি মৃত হইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন; অদিতি দেবী এক্ষেত্রে জীবিত "বৎস" প্রসব করেন নাই। সূর্যে যখন প্রাণের অভাব সাব্যস্ত হইতেছে, তখন সংজ্ঞা চৈতন্য প্রভৃতির কথা আর উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। সূর্যের ভাগ্যে যাই ঘটুক, এ বিশ্বের একজন "কবি", কল্পয়িতা ও নির্মাতা অবশ্য এ-দেশে ও-দেশে অনেকে মানিয়াছেন। এ বিশ্বের

রচনা-কৌশলের উপপত্তি করার জন্য অনেকে জগৎকর্তা মানিয়াছেন। অবশ্য, জড়-বাদীদের তাতে সম্মতি নাই। আমাদের শরীরে চোখের মতন কারিগুরি আর বোধহয় কিছুতে নাই ; কিন্তু হেল্ম্ হোল্‌জ বলিয়াছিলেন—কোন অপ্‌টিসিয়ান্ যদি মানুষের চোখের মতন একটা যন্ত্র বানাইয়া আমাকে পাঠাইয়া দেয়, তবে আমি তাহাকে আনাড়ী সাব্যস্ত করিতে বাধ্য হইব—এতসব মারাত্মক খুঁৎ ও যন্ত্রটায়।

আমাদের ভারতবর্ষের ঋষিদের দৃষ্টিতে সূর্য বেজায় গরম গ্যাসের বা আর কিছুর গোলা মাত্র নহেন। যাহা হইতে এই সৌর জগতের নিখিল প্রাণ ও চৈতন্য নিঃসৃত হইতেছে, সেই মূল উৎস কখনই স্বয়ং প্রাণহীন ও চৈতন্যহীন হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে প্রাচীন তত্ত্বদর্শীদের মত আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১৯১ অধ্যায়ে এবং অন্যত্র শুনিতে পাই। উক্ত অধ্যায়টি পড়িয়া দেখা উচিত। আমরা আর উদ্ধৃত করিলাম না।

সেখানে আমরা সংক্ষেপে পাইতেছি যে, সূর্যের স্থূল সূক্ষ্মভেদে সপ্তরূপ হইয়াছে—ভূঃ ভুবঃ প্রভৃতি। অতএব সূর্যকে কোন ক্রমেই মাত্র "Sun" করিয়া দেখিতে পারা যায় না। তার পরের অধ্যায়ে এই কথাগুলি রহিয়াছে (বঙ্গানুবাদ দিতেছি)—"হে ব্রাহ্মণ! তৎপরে সেই ছান্দস (বৈদিক) উত্তম তেজোমণ্ডলীভূত হইয়া পরে শ্রেষ্ঠ তেজ ওঙ্কারের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে ঐ তেজ আদিতে (প্রথমে) উদ্ভূত হইয়াছেন বলিয়া আদিত্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। হে মহাভাগ! ইনিই এই বিশ্বের অধ্যাত্মক কারণ। ঋক্, যজুঃ ও সাম নাম্নী সেই ত্রয়ীই প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও অপরাহ্ন কালে তাপ দান করেন। হে মুনি-শ্রেষ্ঠ! তন্মধ্যে প্রাতে ঋক্ সকল, মধ্যাহ্নে যজুঃ ও অপরাহ্নে সামসকল তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব উল্লিখিত প্রকারে বেদাত্মা, বেদসংস্থিত ও বেদবিদ্যাময় ভগবান্ ভাস্বান্ পরম পুরুষ বলিয়া কথিত হন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী এই শাশ্বত আদিত্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব নাম প্রাপ্ত হন! সর্বদা দেবগণ কর্তৃক পূজ্য সেই দেবমূর্তি নিরাকার অথচ অখিল প্রাণীগণের মূর্তিরূপে মূর্তিমান্, জ্যোতিঃস্বরূপে আদিপুরুষ সেই ভগবান্ আদিত্য বিশ্বের আশ্রয় স্বরূপ, অবেদ্যধর্মা, বেদান্তগম্য এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর।"

যে প্রাণ বিচিত্র বিবিধ রূপে পৃথিবীতে আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই প্রাণরূপী জাহ্নবীধারার গোমুখী হইতেছেন ওই জ্যোতির্ময়ী, বেদময়ী, ভগবতী আদিত্যতনু। কেবল প্রাণ বলিয়া কেন, চৈতন্য বলিয়াও ওই কথা। "কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে" বৃঃ উঃ, ৩।৯।৯—শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন কে সেই একদেবতা? গুরু উত্তর করিলেন—সেই একদেবতা হইতেছেন প্রাণ, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে "ত্যৎ" বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন। "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ"—ছাঃ উঃ, ৩।১৯।১—বিদ্বানেরা আদিত্যকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিতে আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং এই দুইটি মন্ত্রে আমরা পাইতেছি যে, যিনি প্রাণ, তিনি ব্রহ্ম, এবং যিনি ব্রহ্ম

তিনি আদিত্য। সুতরাং, আদিত্য ও প্রাণ—এ দুই অভিন্ন। অন্যত্র শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে "আদিত্যো বৈ প্রাণাঃ"—(মৈত্র্যুপনিষৎ ষষ্ঠ খণ্ডে আদিত্য এবং প্রাণের সম্বন্ধ, এবং গায়ত্রী মন্ত্রের সবিতার বরণীয় ভর্গের ভাবনা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে হইবে) ইত্যাদি বলিয়া প্রাণ ও আদিত্যের তাদাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। তারপর প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রে সূর্যের বরণীয় জ্যোতিঃকে আমাদের ধীবৃত্তি সমূহের প্রেরক বলা হইয়াছে। ইহার শুধু এইমাত্র তাৎপর্য নহে যে, প্রভাতে সূর্যদেব উঠিলে আমাদের সুপ্ত চৈতন্য জাগিয়া ওঠে, এবং নানা দিকে নানা ভাবে প্রবৃত্ত হয়, আর সূর্যদেব অস্তাচলের পরপারে ডুবিলে আমাদের চৈতন্যও গুড়িগুড়ি স্বপ্নপুরীর দিকে চলিতে আরম্ভ করে। ইহার তাৎপর্য আরও গভীর, আরও ব্যাপক। একটা মহাজ্যোতিঃ হইতে যেমন চারিধারে বিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে, তেমনি প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্যদেব হইতে নানা বিস্ফুলিঙ্গ বিশ্বময় বিচ্ছুরিত হইয়া ঘটে ঘটে, জীবে জীবে, ব্যষ্টি প্রাণ ও ব্যষ্টি চৈতন্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। আমার মধ্যে যে বস্তুটি প্রাণরূপে স্পন্দিত হইতেছে এবং চেতনা-রূপে সুখ দুঃখাদির আস্বাদ করিতেছে, সে বস্তুটি ঐ বিরাট আদিত্যরূপী হিরণ্যগর্ভ হইতে বিক্ষিপ্ত একটা স্ফুলিঙ্গ বই আর কিছুই নহে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের একটা প্রসিদ্ধ সূক্তে বিষ্ণুরূপী আদিত্যের সেই পরম পদের কথা আছে, যে পরমপদ সূরিগণ অবলোকন করিয়া থাকেন। "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইত্যাদি।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ যে বলিয়াছেন—অক্ষির অভ্যন্তরভাগে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্তীদের উপর উপর বুঝিলে চলিবে না—ইহার মর্মে প্রবেশ করিয়া বুঝিতে হইবে। অক্ষির মধ্যে যে পুরুষটি বাস করেন, তিনি অধ্যাত্ম, আর আদিত্যমণ্ডলে যে পুরুষটি রহিয়াছেন, তিনি অধিদৈবত ও অধ্যাত্মের সম্পর্কটাই রহস্য। সে সম্পর্কটা সাদা কথায় এই—কোন একটা চৈতন্যময় সত্তা এই বিশ্ব-ভুবনে ওতপ্রোত রহিয়াছে; সে সত্তার কোন বিচ্ছেদ নাই অবচ্ছেদ নাই। সে সত্তা অসীম, ভূমা। জগতে যেখানে যত গণ্ডী, যত অবচ্ছেদ রহিয়াছে, সে সকলের মধ্যে সে সত্তা বর্তমান, অথচ সে সকল গণ্ডী ও অবচ্ছেদ তাহা অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে। এক একটা গণ্ডী এক একটা গুহা; এক একটা পুর। গুহাতে সেই সত্তা শয়ান রহিয়াছে বলিয়া শ্রুতি তাহাকে গুহাশয়, গুহাহিত বলিয়াছেন; প্রত্যেক পুর বা পুরীতে তিনি শয়ন করিয়া আছেন বলিয়া শ্রুতি আবার তাঁহাকে পুরুষ বলিয়াছেন। কিন্তু গুহাশয় পুরুষ হইলেও, তাঁহার বিরাট, সীমাহীন সত্তার অন্যথা হয় না; যেমন ঘটের মধ্যে আকাশ থাকুক আর মঠের মধ্যেই থাকুক আকাশ আকাশই; জল গোষ্পদেই থাকুক আর সমুদ্রেই থাকুক, জল জলই। সেই বিরাট সত্তা হইতেছে প্রাণ বা চৈতন্য। সূর্যরূপী আদিত্যদেব সেই বিরাট সত্তার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি ও প্রতীক। আমরা সাধারণ জ্ঞানে যেটিকে সূর্য বা Sun বলিয়া জানি, সে বস্তুটি আদিত্যদেবের পূর্ণ, সমগ্র অভিব্যক্তি নহে; স্থূল সসীম

অভিব্যক্তি মাত্র। আদিত্য এমন একটা সত্তা যাহার কোন ছেদ নাই, খণ্ড নাই। এক কথায়, আদিত্য ব্রহ্মই। একটা Cosmic Reservoir of Energy—যা হইতে জড়ে, প্রাণে, মনে নিখিল শক্তির সরবরাহ হইয়াছে ও হইতেছে,—বৈজ্ঞানিকদেরও অনেকে মানিয়াছেন। অবশ্য ঠিক বৈজ্ঞানিক "যুক্তি"র উপর ষোল আনা নির্ভর করিয়া হয় ত' নহে। যাই হোক্—সেই বিশ্বাত্মা, বিশ্বাশ্রয়া ও বিশ্বাত্মিকা শক্তিই আদিত্যসত্তা। প্রত্যক্ষগোচর সূর্য তার প্রতীকমাত্র।

শ্রুতি আদিত্যদেবের যে কোষ্ঠী তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতেই তাঁর স্বরূপ প্রকটিত। অদিতির অপত্য বলিয়া তিনি আদিত্য। অদিতি কে? যে সত্তার ছেদ নাই, খণ্ড নাই, সেই সত্তাই অদিতি। সায়নাচার্যাদি অনেকে ঐ ভাবেই নিরুক্তি করিয়াছেন দেখিতে পাই। বৈজ্ঞানিকও দেখিতেছি গুড়িগুড়ি সেই অদিতির (Fundamental Continum) পানেই হাতড়াইয়া চলিয়াছেন। ঈথার, দেশ-কাল বা দিক্কাল —এ সকল তাঁর নতুন নতুন অদিতি-পরিচয়। সে পরিচয়টি সবে সুরু হইয়াছে মাত্র। অদিতির আত্মজ আদিত্য অদিতি হইতে অভিন্ন; যিনি অদিতি তিনিই আদিত্য; যিনি মাতা তিনিই পুত্র। ঋগবেদ-সংহিতা ১।৮৯।১০—"অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ। বিশ্বে দেব অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্॥" বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগে আদিত্যগণের কথা শুনিতে পাই বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, সে "গণ" ব্যবহারিক মাত্র; পারমার্থিক নহে; যেমন ব্যবহার চালাইবার জন্য, লোককে বুঝাইবার ও বলিবার জন্য "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি," সেইরূপ এক অদিতি ও আদিত্য আমাদের লৌকিক কারবারের খাতিরে "যজ্ঞ প্রয়োজনে," বহু হইয়া "গণ" সাজিয়া বসিয়া আছেন।

এখন এই যে ব্যাপক প্রাণ-সত্তা ও চৈতন্য সত্তা, যাহাকে আমরা আদিত্য বলিয়া অভিবাদন করিতেছি, তাহা হইতে বিস্ফুলিঙ্গের মত নানা ছোট ছোট প্রাণী ও জীব এই বিশ্বের বিপুল আসরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আদিত্যরূপী প্রজাপতি নিখিল প্রজার সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন এবং তাহাদের ভিতরে থাকিয়া নিজের মহত্ত্ব ও ভূমত্বকে তিনি গোপন করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার গুহায় বা পুরীতে শয়ন করা। এইরূপ শয়ন করিবার ফলে এমন একটা ভেদ, এমন একটা গণ্ডী ব্যবহারে আসিয়া দেখা দেয়, যে ভেদ বা গণ্ডী সত্যসত্যই, তত্ত্বতঃ নাই। সে ভেদ হইতেছে—ভিতর ও বাহিরের ভেদ এবং সঙ্গে সঙ্গেই, যিনি ভিতরে থাকেন ও যিনি বাহিরে থাকেন, তাঁহাদের ভেদ। এই কারণে মনে হয়, যেটা ভিতর সেটা বাহির নয়, এবং যিনি ভিতরে রহিয়াছেন, তিনি আর বাহিরে নাই। যিনি ভিতরে রহিয়াছেন তাঁহার নাম দিই অধ্যাত্ম, যিনি বাহিরে রহিয়াছেন তাঁহার নাম দিই অধিদৈবত ও অধিভূত। এই কথাটা মনে রাখিলে আমরা বুঝিতে পারিব, কি উদ্দেশ্যে শ্রুতি অক্ষিমধ্যবর্তী পুরুষটিকে

অধ্যাত্ম এবং আদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্তী পুরুষটিকে অধিদৈবত বলিলেন। সত্য সত্যই কোনরূপ ভেদ করা অভিপ্রেত নয়, বরং সমীকরণ করা, মিলাইয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য; অর্থাৎ আমাদের ভিতরে যে সত্তা ক্ষুদ্র হইয়া, অল্প হইয়া রহিয়াছেন, সেই সত্তা আবার আদিত্যে বিরাট হইয়া ভূমা হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং খাঁটি ভারতবর্ষীয় দৃষ্টিতে আদিত্যে কেবলমাত্র প্রাণ ও চৈতন্য যে আছে এমন নহে; আদিত্যই নিখিল প্রাণ ও চৈতন্যের অধিষ্ঠান ও উৎস। অবশ্য অদিতি ও আদিত্যের মায়ের ও পোএর স্বরূপ পরিচয়টি আগে করিয়া লওয়া আবশ্যক।

আমরা দেখিয়াছি, জড়বাদী বৈজ্ঞানিক এ সকল কথায় সায় দিতে পারেন না। তবে, বৈজ্ঞানিক মাত্রেই জড়বাদী ছিলেন না, এখনও নেই। নিছক জড়বাদ (Materialism), এমন কি, নিছক নিয়তিবাদ (Cosmic Determinism) এখন বে-ফ্যাসান্ হইয়া পড়িতেছে বৈজ্ঞানিক মহলে। যাই হোক, তাঁহার দৃষ্টিতে আদিত্য হইতেছেন Sun, এবং সে পদার্থে প্রাণ ও চৈতন্য থাকারই যে কোন প্রমাণ নাই এমন নয়, তাহাতে প্রাণ ও চৈতন্য আদৌ থাকিতে পারে না। সূর্য যে অবস্থায় রহিয়াছে, সে অবস্থায় কোন জ্যোতিষ্ক রহিলে, তাহাতে প্রাণের অঙ্কুর দেখা দিতে পারে না; কার্বন্ হাইড্রোজেন প্রভৃতি মসলার সংযোগে প্রোটোপ্ল্যাজম্ নামক বস্তুটি পয়দা হওয়া চাই; আর সেই বস্তুটিকে আশ্রয় করিয়া প্রাণের বিকাশ হইতে পারে; প্রোটোপ্ল্যাজম্ তাই "the physical bogis of life"। পৃথিবীতে যে অবস্থা বর্তমান, মোটামুটি সেই অবস্থার ভিতরেই প্রোটোপ্ল্যাজম্ ভূমিষ্ঠ হইতে পারে, সূর্যের মত অবস্থাতে, এমন কি চন্দ্রের মত অবস্থাতেও, তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এমন কি, আমাদের পৃথিবীরও বাল্যে ও কৌমারে সে অবস্থাপুঞ্জ বর্তমান ছিল না। সুতরাং জগতে যতদিন না পৃথিবী ভূমিষ্ঠ হইয়া বর্তমান অবস্থার কাছাকাছি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ততদিন জগতের ইতিহাসে কোন মৌজাতেই প্রাণ বা চৈতন্যকে দখলিসত্ত্ব দেওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীতে প্রথম জীবাবির্ভাবের যুগ অবশ্য কোটি কোটি বৎসর পিছাইয়া লইয়া যাইতে পারিয়াছেন। ভূতত্ত্ববিদেরা নানা প্রকারের জীব আবির্ভাবের পরিচয় বা অভিজ্ঞান পাইয়া পৃথিবীর স্তরগুলিকে ও যুগগুলিকে নানান্ স্তরে সাজাইয়াছেন, এবং তাদের এক-একটা আনুমানিক বয়স নির্ধারণও করিয়াছেন। প্রস্তরকঙ্কালের সাহায্যে মানুষের আবির্ভাবের যুগও এখন বহু লক্ষ বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে। সার আর্থার কিথের মতন কোন কোন হালের পণ্ডিত বেশ লম্বা "পাঁতি"ই দিয়াছেন। তা হইলেও সমগ্র ইতিহাসের তুলনায় প্রাণের এই কয়টা যুগ একটা পলক বলিলেও চলে।

জড়বাদী বৈজ্ঞানিক জগতের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া জড় অণু পরমাণুগুলিকে আদিম ও প্রাচীন বানাইয়াছেন; প্রাণ ও চৈতন্য তাঁহার দৃষ্টিতে নিতান্তই আগন্তুক ও অর্বাচীন বনিয়া যাইবে। শুধু ইহাই নহে। জগতের পর পর অবস্থাগুলি তাঁহার দৃষ্টিতে,

সাধারণতঃ, পূর্ব পূর্ব অবস্থাগুলি হইতে বেশী উন্নত বিবেচিত হইবে; অর্থাৎ, জগতের আদিম বা প্রাচীন কোন অবস্থার তুলনায় নবীন বা আধুনিক কোন অবস্থা, সাধারণতঃ সমধিক উন্নত ও বিকশিত। অবশ্য, এ নিয়মের কচিৎ ব্যভিচারও আছে। ইহাই হইল বৈজ্ঞানিকদের মামুলি ইভোলিউশন্ থিওরি। হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি একে সার্বভৌম অধিকার দেন। প্রাণি-জগতে এমিবা প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীবেরাই আগে দেখা দিয়াছে; তাহাদের মধ্যে প্রাণের পরিচয়টি নিতান্ত সরল ও সংক্ষিপ্ত; চৈতন্য এক রকম নাই বলিলেই হয়। তার পর, উত্তরোত্তর যেমন একদিকে প্রকৃতির কারখানা হইতে ভাল ভাল প্রাণীর কাঠামো সব বাহির হইয়াছে, তেমনি আবার অন্যদিকে সেই সব কাঠামোর ভিতরে প্রাণের ও চৈতন্যের বিকাশ ও পরিচয় তত বেশী স্পষ্ট, বিশদ ও বিচিত্র হইয়াছে। চৈতন্য বা Consciousness বস্তুটিকে অনেক সময় মস্তিষ্কের অবস্থাবিশেষের সঙ্গে নিয়ত সম্পর্কে, এমন কি অবিনাভাব সম্বন্ধে, সংযুক্ত করিয়াই রাখা হইয়াছে। মস্তিষ্কের ব্যাপারে একটা "লুপ্ লাইন", একটা "কর্ড লাইন", এমন কি "গ্রাণ্ড্ কর্ড লাইন"ও আছে দেখান হয়। কর্ড লাইনে ব্যাপার হইলে চৈতন্য সম্ভবতঃ প্রায়ই থাকে না; প্রায় "অজ্ঞাতসারে"ই ব্যাপার নির্বাহ হইয়া যায়। লুপ লাইনে ব্যাপার হইলেই "জ্ঞাতসারে" "সচেতন ভাবে" হয়। মস্তিষ্ক আর তার "লাইন" ও "স্টেশন্"গুলি যত বিচিত্র হইয়াছে, চৈতন্যও নাকি ততই বিকশিত ও বিচিত্র হইয়াছে। এই গেল একদিকের কথা। যাই হোক্, সেই সকলের নীচের ধাপে এমিবা, আর এই সকলের উপরের উৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিবৃত্তি-ওয়ালা মানুষ। মানুষও গোড়াতে মনুরূপে, সপ্তর্ষিরূপে আবির্ভূত হয় নাই। আদিম অবস্থার মানুষ বনমানুষ, বানরের জ্ঞাতি ভাই; অষ্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে সেই আদিম মানবতা এখনও ওয়ারামুঙ্গার সাজ পরিয়া কোন মতে "কোণঠেসা" হইয়া আত্মরক্ষা করিয়া রহিয়াছেন; (তাস্মেনিয়া দ্বীপের বুনোবেচারীরা ত' লোপাটই হইয়া গিয়াছে) সুসভ্য মানুষের আগ্নেয়-অস্ত্রে তিনি নির্বংশ হইলে, আমরা আর আমাদের আদি-পুরুষের সজীব কাঠামো কোথাও খুঁজিয়া পাইব না, মাটি খুঁড়িয়া কবর হইতে শুধু তাঁর পাইথেক্যান্থ্রোপাস্ প্রভৃতির প্রস্তরকঙ্কাল বাহির করিয়া দেখিয়া আমাদের কৃতার্থম্মন্য হইতে হইবে। অবশ্য, এই "বনমানুষ" সম্বন্ধে ধারণা পশ্চিম দেশেও কিছু কিছু বদ্‌লাইয়া না গিয়াছে এম নয়। Edward Carpenter Civilisation: its Cause and Cure" নামক গ্রন্থে বলিতেছেন—

"Without committing ourselves to the unlikely theory that the "noble savage" was an ideal human being physically or in other respect, and while certain that in many points he was decidedly inferior to the civilised man, I think we must allow him superiority in some directions; and one of these was his comparative freedom from

disease. Lewis Morgan, who grew up among the Iroquois Indians and who probably knew the North American natives as well as any white man has ever done, says (in his Ancient Society p. 45) "Barbarism ends with the production of grand Barbarians." And though there are no native races on the Earth to-day who are actually in the latest and most advanced stage of Barbarism ; yet if we take the most advanced tribes that we know of such as the said Iroquois Indians of twenty or thirty years ago, some of the kaffir tribes round Lake Nyassa in Africa, now (and possibly for a few years more) comparatively untouched by civilisation, or the tribes along the river uampes, 30 or 40 years back of wallace's Travels on the Amazon—all tribes in what Morgan would call the middle stage of Barbarism—we undoubtedly in each case discover a fine and (which is our point here) healthy people."

রুশোর সেই "noble savage এখনও নানা দিক দিয়া অনেকের শ্রদ্ধা ও প্রশস্তি পাইতেছেন দেখিতেছি। যাই হোক, সৃষ্টি সম্বন্ধে গোঁড়া জড়বাদীর ও অভ্যুদয়বাদীর মত মানিতে গেলে ইতিহাসের আলেখ্যখানা মোটামুটি এক ভাবে আঁকা হইবে আমরা দেখিলাম। এ দেশের ও অপর কোন কোন দেশের নৈমিষারণ্যে সে আলেখ্য অন্ত ভাবে আঁকা হইত, তাও আমরা কটাক্ষে মোটামুটি দেখিলাম। কোন্ আলেখ্যখানা যাথার্থ্যের বেশী অনুরূপ—এ প্রশ্নের জবাব জরুরী সন্দেহ নাই ; কিন্তু জবাব এখনও পাওয়া যায় নাই! বিজ্ঞানের দম্ভ এতদিন সেই সব নৈমিষারণ্যের পুরানো আলেখ্য তুচ্ছ করিয়া ছিঁড়িয়াই ফেলিতে চাহিত। আজও বিজ্ঞান যে সে আলেখ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথায় তুলিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছে, এমন নয়। তবে, এটা ঠিক যে—এই বিংশ শতাব্দীতে সে আলেখ্য হাতে তুলিয়া ধরিয়া বিজ্ঞান ইতস্তত করিতেছে ; তার হাত ও কাঁপিতে সুরু হইয়াছে, মস্তকও কিছু আনতও হইতেছে। দেখা যাক কতদূর কি গড়ায়!

ইতিহাস ও নিয়তি

বেদ-ব্যাখ্যার মামুলি বা সম্প্রদায়গত রীতিটির ক্রটী দেখাইতে গিয়া ম্যাক্‌ডোনেল্ সাহেব লিখিতেছেন :—"The method of natural science which has led to such an astounding edvancement of knowledge, for instance in the sphere of physics, chemistry, and medicine, during the preceding and the present century, is fundamentally the same as that which has been applied to modern European scholorship. To this have been due such marvellous achievements as the decipherment of the cuneiform writings of Persia and of the rock inscriptions of India, and the discovery of the languages concealed under those characters which had for many centuries been absolutely un-intelligible to the natives of those countries. The application of this method has also resulted in the extraordinary progress being made in the study of the literature of othar ancient civilizations, such as that of the Babylonians, Egyptians, Hebrews and Homeric Greeks. Considering that the aids accessible to the vedic researcher are more abundant than in the aforesaid cases, there is good ground for supposing that the ultimate achievements will be correspondingly greater. The essential nature of the critical method is the patient and exhaustive collection co-ordination, sifting and evolution of the facts bearing on the subject of investigation. The sole aim here being the attainment of truths, it is a positive advantage that the translators of ancient sacred books should be outsiders rather than native custodians of such writings. The latter could not escape from religious bias; an orthodox Brahman could not possibly do so.

The modern critical vedic scholar has at his disposal for the purposes of interpretation practically all the traditional material accessible to Sayana in the 14th century. But over and above this common material the scientific scholar possesses a number of valuable resoureces which are unknown to the commentators. These are

evidences of the Avesta, of comparative Philology, of comparative mythology, of the Anthropology of ancient peoples besides the application of the historical method to traditional evidence as well as to classical Sanskrit as throwing light on the Veda."

বিস্তারিত ভাবে উদ্ধৃত করিলাম, কেন না ইহাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আমাদের বেদ পুরাণ প্রভৃতি বুঝিবার ও বোঝাইবার দাবীটি, যার কৈফিয়ৎ, খুব বড়ো গলা করিয়া আমাদের শোনানো হইয়াছে। আর যিনি দাবী উপস্থিত করিতেছেন, তিনি নিতান্ত কেও-কেটা নন; স্বয়ং ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব, অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের বোডেন প্রফেসর। আমরা নিজেদের বেদ বুঝিতে ততটা লায়েক নই, যতটা লায়েক বৈজ্ঞানিক রীতির প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত (adept) বিলাতী পণ্ডিত মহাশয়রা। বেদ এখনও আমাদের জীবনে—বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের মাঝে—মরিয়া যায় নাই, বাঁচিয়া আছে;— এইটিই হইল আমাদের বৈজ্ঞানিক রীতিতে বৈদিক সত্য আবিষ্কারের পথে প্রবল ও প্রধান অন্তরায়। বেদ-বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ ত' এযুগে বেদে একান্ত অনধিকারী—ম্যাক্‌ডোনেল্ সাহেব ব্যবস্থা দিলেন। শুধু আমরা বলিয়া কেন, মহামহোপাধ্যায় সায়ণও অনধিকারী হইয়া পড়িলেন। বেদ বুঝিবার সবখানি সুবিধা তিনিও পান নাই। সায়ণের অন্তত: দুই হাজার বছর আগে নিরুক্তকার যাস্ক বেদ বুঝিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও "সন্তোষজনক" রূপে পারেন নাই। এমন কি, বেদের মন্ত্রভাগের উপর যে সকল ব্রাহ্মণ ভাগ "রচিত" হইয়াছিল, সে সকলেরও মন্ত্র বুঝিবার পুরা সুযোগ ও সৌভাগ্য হয় নাই, কেননা, সাহেব বলিতেছেন—"The investigation of the Brahmanas has shewn that, being mainly concerned with speculation on the nature of sacrifice, they were already far removed from the spirit of the composers of the Vedic hymns, and contain very little capable of throwing light on the original sense of those hymns." পক্ষান্তরে নব্য পণ্ডিতেরা Avestaর সংগে মিলাইয়া তুলনা-মূলক ভাষা-শাস্ত্র প্রভৃতি "বিজ্ঞানের" সাহায্যে বেদ যতটা যেভাবে বুঝিতে পারগ হইবেন, তাহার আভাস ও পরিচয় ম্যাক্‌ডোনেল্ সাহেবের বড় বড় বিশেষণ গুলার অতিশয়োক্তির ভিতরে নিজেকে জাঁকালো করিয়া কাঁপাইয়া ধরিয়াছে।

ন্যায়ের এবং যাথার্থ্যের উচ্চ আদালতে আপীল করিলে কিন্তু এ বিলাতী দাবী টিঁকিবে না। জড়-বিজ্ঞানে যে রীতির অনুসরণ করিয়া আমরা ফল পাইয়াছি, ইতিহাসে,—বিশেষত: যে ইতিহাস শুধু ঘটনা আর তথ্য জড়' করিতেই প্রবৃত্ত নয়, যে ইতিহাস ঘটনাবলীর পিছনে মানুষের নিয়ত চঞ্চল প্রাণধারাটিকেও বুঝিতে চায়; শুধু facts নহে; interpretation ও যার উদ্দেশ্য—সে ইতিহাসে সে রীতির অনুসরণ

করা তেমনধারা সম্ভবপরও নয়, ততটা যুক্তিযুক্তও নয়। চেতনা ও প্রাণকে বাদ দিয়া ভূস্তর-বিন্যাসের অথবা ভূতবর্গের রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগের বিবরণ দেওয়া চলে; গ্রহ-তারকাদের গতিবিধির ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিয়া ডাইনামিক্স নামক অঙ্কশাস্ত্রখানা আর ফিজিক্স বা জড়পদার্থ বিজ্ঞানখানা সংগে রাখিলেই একরূপ যথেষ্ট হইল; গ্রহ-নক্ষত্রদের ইচ্ছাশক্তি, রাগদ্বেষ (love and hate) এখন জ্যোতিষে আমোল পায়না। এইসব তথ্য কেবলমাত্র যে বাহিরের (objective) এমন নহে। আমরা বিজ্ঞানে এদের যেভাবে দেখি বা নিই, তাহাতে এদের ভিতরে "আত্মিক" (subjective) কোনও কিছু নাই। এদের ভিতরে চেতনা নাই, ইচ্ছা নাই, প্রাণ নাই। এরা যেন গতি বিজ্ঞানের আইন-কানুনের নাগপাশে একান্তভাবে বদ্ধ (absolutely determined by the Laws of Motion); স্বাতন্ত্র্য (Spontaneity) বলিয়া কোনও কিছু এদের ভিতরে নাই। বিলিয়ার্ড বলের মতন বাহির হইতে টক্কর খাইয়া এরা ছুটিতেছে, পরস্পরের সংগে ঠোকাঠুকি করিতেছে। আবার শুধু এইটুকুই নহে। এরা নিজেরা যেমন ইচ্ছাদি-শূন্য, তেমনি ইহাদের সত্ত্বও কোনও ইচ্ছাদি-শক্তিমান্ পুরুষের দ্বারা পরিচালিত নহে; অথবা হইলেও, সে পুরুষ এদের আইনে বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, এদের "রুটিনে" তিনি আর হস্তক্ষেপ করিতে নারাজ। সত্যসত্যই এদের এই বিবৃতি যথার্থ কিনা, তাহা লইয়া দার্শনিকেরা বিস্তর বিবাদ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন; কিন্তু, বিজ্ঞান, এই বিবৃতিটাই একরূপ স্বতঃসিদ্ধের মতন মানিয়া চলিয়াছেন। অণুর অন্দর-মহলও এখন আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু সেই সাব্-এটমগুলার জগতে পদার্থবিৎ অসংকোচে, দ্বিধাশূন্য চিত্তে, সেই মামুলি গতিবিজ্ঞানের আইনগুলিই চালাইতেছেন। সেখানে যে "শৃঙ্খল" একটুখানি শিথিল হইলে চলিতে পারে, সে বিষয়ে কোন সংশয়ই অদ্যাপি তাঁর মনে জাগে নাই। নিউটনের গড়া "শিকল" অনেক পুরানো বলিয়া মরিচাধরা হইয়া গিয়াছিল; সম্প্রতি আইন্স্টাইন্ প্রমুখ হালের বৈজ্ঞানিক বিশ্বকর্মা মিথুনীকৃত দেশকালের "হাপরের" সাহায্যে সে শিকল নূতন করিয়া ঝালাইয়া দিয়াছেন। শিকল কোথায়ও গলিয়া টুটিয়া যায় নাই। ভবিতব্যতার গর্ভে কি আছে তা বিজ্ঞানের ভাগ্যদেবতাই বলিতে পারেন।

ইতিহাসের তথ্যগুলি আদপে এ জাতীয়ই নয়। সে তথ্যনিচয়ের পিছনে বিশ্ব-মানবের প্রাণ বিচিত্র আনন্দে ও বেদনায়, বিবিধ আবেগে ও চেষ্টায় চিরদিন চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। গণ-দেবতার এবং গণ-নায়কদের আত্মার বিচিত্র আবেগগুলিই এই নিরন্তর, নিরবধি ঐতিহাসিক ধারার উৎস। বেদনা ও ইচ্ছাই ঘটনাবলীর প্রসূতি। ঘটনা ত বাহিরের সাজ বা খোলস। যে ভিতরে সাজিয়াছে সে হইতেছে নিয়ত রস-পিপাসু একটা প্রাণ। প্রাচীন ঋষিরা এই প্রাণের মহিমা গাহিতে ভালবাসিতেন। ইতিহাসের এই নিগূঢ় সত্তা, এই প্রেরণাটাই ("motive") আসল জিনিস। প্রাচীন

আসিরিয়া বা ভারতবর্ষের 'তথ্য'গুলি এক হিসাবে বহিরঙ্গ—(objective), সন্দেহ নাই; কিন্তু সে হিসাব বাহিরেরই হিসাব। তাদের অন্তরঙ্গ ভাবটিই আসল এবং factগুলি, এইভাবে দেখিলে, subjective কথাটা সোজা, বিস্তার করার প্রয়োজন নাই। ঐতিহাসিক "মালমশলা" আর জড়বিজ্ঞানের "তথ্য"গুলিকে কোনমতেই এক কোঠায় ফেলা যায় না। বিজ্ঞানে দেখিয়া-শুনিয়া, সাজাইয়া-গোছাইয়া হিসাব গণাগাঁথা করিয়া একটা বিশিষ্ট রীতির (method-এর) অনুসরণ করে। এক কথায়, বিজ্ঞানের রীতি—পরিমিতি, "Science is measurement." এ রীতির অনুসরণ করিয়া আসিরিয়ার "কিউনিফরম্" লিপিগুলির একটা সূচী অথবা বেদের শব্দব্রহ্মের একটা সূচী (Index), অবশ্যই বহ্বায়াসে কিন্তু নিরাপদে করা যাইতে পারে; কিন্তু বলা বাহুল্য, ক্যাটালগ্ ও ইন্‌ডেকস্ খুব দরকারী হইলেও ইতিহাস নহে। ইতিহাস মানবাত্মার বেদনা-প্রসূত বলিয়া তার ঘটনাবলী পরিমাপ-যোগ্য (measurable, calculable) নহে। প্রাচীন এরিডু নগরে সভ্যতালোকবাহী "মৎসাবতারের" উপাখ্যানটি কবে সুরু হইয়াছিল; পঞ্চনদ-উপত্যকায় অথবা নীল-উপত্যকায় তার অনুরূপ কিছু ছিল কিনা, যদি থাকে ত', কোনখানে তাদের মিল, কোন্ যায়গাটাতেই বা গরমিল; এ উপাখ্যানের আমদানী কোথা হইতে—কে মহাজন, কেই বা খাতক? এ সকল "ইসু" অবশ্য তুচ্ছ করিবার নহে; এবং একথা ঠিক যে, বৈজ্ঞানিক রীতিতে এ সকল ইসুর সমাধানের কতকটা কিনারা করা চলিতে পারে। সত্যসত্যই "কিনারা" করার কোন লক্ষণই এ যাবৎ হয় নাই; হওয়াও দুষ্কর। চেষ্টা বৈজ্ঞানিক রীতিতে চলাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কিনারা হইলেও আমরা আসিয়া যেখানটায় নামিলাম সেটা সত্যিকার ইতিহাসের "পাকা ঘাট" নহে।

অবস্থাপুঞ্জ (assemblage of conditions) ঠিক ঠিক জানা থাকিলে বিজ্ঞানবিৎ ঘটনা কি ঘটিয়াছে অথবা কি ঘটিবে বলিয়া দিতে পারেন। যেমন কবে কখন কতটুকু চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হইবে; কবে কোথায় ধূমকেতু বিশেষের উদয় হইবে ইত্যাদি। ইতিহাসের ঘটনাবলী সম্পর্কে পারিপার্শ্বিক অবস্থাপুঞ্জের প্রভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তবু একথা ঠিক যে, আমরা যেগুলিকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলিয়া জানি, কেবলমাত্র তাদের দ্বারাই কোনও বড় বা ছোট ঐতিহাসিক ঘটনা "বাধ্য" নয়। নিত্য নব নব বেদনা-ব্যাকুল মানবাত্মার ঈপ্সা ও আবেগ ঐ সকল ঘটনার কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে। গাছের বীজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহায়তা নেয় বটে, কিন্তু তার নিজস্ব প্রকৃতি ও বিকাশ প্রবৃত্তি তার নিজের মধ্যেই দেওয়া আছে। বিকাশের পক্ষে সে নিজেই যথেষ্ট সমাপ্ত নয় বটে, কিন্তু বিকাশের আইনটি আর বিকাশের প্রবৃত্তিটি সে কাহারও কাছে ধার করিতে যায় না। ভারতে বৌদ্ধ বিপ্লব, অথবা ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব অথবা ইয়োরোপীয় মহাসমর—এ সকল ঐতিহাসিক ব্যাপারই ঐ জাতীয় জীবধর্মী

organic। শুধু বাহিরের অবস্থাগুলির বিশ্লেষণ করিয়া এদের ব্যাখ্যা বিবৃতি দেওয়া ত' যায়ই না, এমন কি, সেই সেই সময়কার "সঙ্ঘ আত্মা" (collective Mind)র অবস্থা মোটামুটি পর্যালোচনা করিয়াও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেওয়া শক্ত। ভিতরে কি যেন একটা নিগূঢ় শক্তি প্রেরণারূপে, আবেগরূপে (Vital Impetus রূপে) জাগিয়াছে, মাথা তুলিয়াছে, চঞ্চল হইয়াছে; তন্ত্রের ভাষায় এটা বীজের বা বিন্দুর উচ্ছুনাবস্থা (swelled condition)। অভিব্যক্তির ভিতরকার এই নিগূঢ় আবেগটিকে দার্শনিক হেনরি বার্গসোঁ Elanvital বলিয়াছেন। এ আবেগটি মৌলিক (original, creative)। কার্যকারণ সম্বন্ধের ফরমুলা দিয়া ইহাকে বাঁধিতে পারা যায় না। এ আবেগ আপনা হইতেই দেখা দিয়া নিজের অনুকূল অবস্থাপুঞ্জ অনেকটা নিজেই তৈয়ারি করিয়া অথবা বাছিয়া লয়; প্রতিকূল অবস্থাপুঞ্জকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চায়। এইটি সাক্ষাৎ প্রাণের ধর্ম। ইতিহাসের ঘটনা প্রাণেরই বিকাশ, জীবনেরই অভিব্যক্তি। সুতরাং সেও প্রাণের ধর্ম মানিয়া চলে; জড়ের আইনে বাধ্য সে কখনই একান্তভাবে নয়। প্রজ্ঞানেত্র দ্বারা এই ঘটনার বীজশক্তি বা বীজমন্ত্রটি যিনি ধরিতে পারেন, তিনিই কবি। শুধু "অবস্থাপুঞ্জ" বিশ্লেষণ করিয়া ইতিহাসের মন্ত্রোদ্ধার অথবা মন্ত্রচৈতন্য কেহ করিতে সমর্থ হইবেন না।

একটা কেজো উদাহরণ দিই। গিবন রোমক সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। অতবড় জাতিটার অধঃপতনের নিদান তিনি যেরূপ ভাবে করিয়াছেন, তার চেয়ে ভাল করিয়া করিতে আর কেহ পারিত কিনা সন্দেহ। গ্রীক প্রভৃতি অনেক পুরাতন সভ্যতারই আমরা এই ভাবে পতন দেখিতে পাই। ভারতবর্ষও সেইসব অপহৃত গৌরব "পতিত"দের অন্যতম—হয়ত, তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। ভারতের অধঃপতনের নিদান তেমন ভালো করিয়া কেহ আলোচনা-অন্বেষণ করেন নাই। যাঁরা করিয়াছেন, তাঁরা আমাদের পূর্বকথিত সাতকাণার হাতী দেখার পুনরভিনয় করিয়াছেন। বিলাতী পণ্ডিতরা অনেক সময় নানা রকমের থিওরি লইয়া "শব ব্যবচ্ছেদ" জুড়িয়া দেন; তার মধ্যে সবচেয়ে সর্বনেশে থিওরি হইতেছে এই যে—তাঁদের শ্বেত সভ্যতাই একমাত্র সত্যকার সজীব ও দামী সভ্যতা; বাকি আর কিছু, তারা হয় মৃত নয় মুমূর্ষু। অতীত যুগে তাদের যতটুকু দাম থাকুক না কেন, বর্তমানে জীবনের উপাদেয়তার কষ্টিপাথরে কষিয়া দেখিতে গেলে, তাদের দাম না থাকারই সামিল। দাম যে নাই—তার সবচেয়ে প্রবল ও অকাট্য প্রমাণ তারা জীবন-সংগ্রামে তলাইয়া গিয়াছে, নয় "কোণ-ঠেশা" হইয়া রহিয়াছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের "ধোপে" তারা টিকে নাই। এই যুক্তিতে তাঁরা ভারত প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতাকে এক রকম "শব" মনে করিয়াই ছুরি চালাইতে লাগিয়া যান। শবের সূক্ষ্ম শিরায় শিরায় এখনও চঞ্চল প্রাণরূপী শিবের কোনও সন্ধান তাঁরা সকলে পান না। যেহেতু তাঁদের সংস্কার,

তাঁদের থিওরি গোড়া হইতেই তাঁদের সেদিকে পরাঙ্মুখ করিয়া রাখিয়াছে। মৃত্যু যে মোহ হইতে পারে, অবসাদ হইতে পারে, এমন কি সুষুপ্তির বিশ্রান্তি হইতে পারে, এ সংশয় তাঁদের আত্মপ্রসাদের কোয়াসার মাঝখানে একবারও একটা ক্ষীণ রশ্মিরেখার মত লব্ধপ্রবেশ হয় নাই। এ ব্যাধি আমাদিগকেও প্রবল ভাবে আক্রমণ করিয়াছে। ইহা অসাধ্য না হইলেও কষ্টসাধ্য। ইহার প্রতিকারের উপায় আমাদের চিন্তা করিতে হইবে। এখন কথাটা হইতেছে এই ভারতবর্ষ না মরিলেও, মৃতকল্প না হইলেও, সুস্থ ও সবল নাই। প্রাচীনেরা বলহীন ও বিমূঢ়াত্মাকে একই মনে করিতেন; এবং স্বাস্থ্যকে স্বারাজ্যেরই অন্তর্ভূত করিয়া দেখিতেন। ভারত তাই আজ আত্মস্থ নয়,—স্বারাজ্যে, ছান্দোগ্যের সেই "স্বে মহিম্নি" আজ সে সুস্থির নয়। কেন এমনটা হইল ইহাই প্রশ্ন। অবশ্য একদিনে হয় নাই, সহস্র বৎসর লাগিয়াছে। কিন্তু ভারত তার প্রাণশক্তির কেন্দ্র হইতে ধীরে ধীরেই বা চ্যুত হইয়া পড়িল কেন?

এ প্রশ্নের জবাব অনেকে অনেক রকমে দেবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবাসীর মুখে "অদৃষ্ট" কথটা অবশ্য খুবই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁরা এটাকে "ফেট" বলিয়া তরজমা করেন, তাঁরা বড়ই ভুল করেন। কর্মফলবাদী ভারতবাসীর চিন্তার ভিতরে "ফেটের" কোনই স্থান নাই। যেটাকে "দৈব" বা "ভাগ্য" বলা হয়, সেটাও কর্মেরই নামান্তর ও রূপান্তর। "কর্মেতি মীমাংসকাঃ"—এই কর্মকেই মীমাংসকেরা ঈশ্বরের সিংহাসনে বসাইয়াছেন। "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে"—কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, নিয়তির জনক কর্ম, এবং নিয়তিঃ কর্মণা বাধ্যতে। এখানে বিচার অপ্রাসঙ্গিক, তবে একটা কথা—ব্রহ্ম আনন্দ, আনন্দ হইতেই সব হইয়াছে, হইতেছে এবং আনন্দেই সব লয় পাইতেছে; আনন্দের স্বরূপ লীলা—সে স্বরূপ সকল বাধ্য-বাধকতার ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত; জীবও এই আনন্দেরই অভিব্যক্তি—বিবর্ত ভাবেই হউক, আর অংশ ভাবেই হউক; সুতরাং জীবও স্বভাবে লীলাময়—তার কর্ম কার্য-কারণ-পরম্পরা-জালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও স্বাধীন। দার্শনিক কান্ট্ এই স্বাতন্ত্র্যটিকে Autonomy of the Practical Reason বলিয়াছেন। বাধ্যতা (determinism) এই জীবরূপী লীলাময়ের ছদ্মবেশ, নিজেকে লুকাইবার "গুহা" বই আর কিছুই নহে। সচ্চিদানন্দ-ঘন ভগবান্ লীলাময়, তাঁর অংশ জীবও লীলাময়, এই জন্যই ভক্ত-ভগবানে লীলা-বিলাস সম্ভবপর হইয়া থাকে; পুতুলের সংগে লীলা হয় না, পুতুল লীলা-প্রতিযোগী হয় না। অদৃষ্টের মূলে তাই কর্ম।

এখন, ভারত কোন্ কর্মফলে এমন ধারা অবসন্ন, নিস্তেজ হইয়া পড়িল? এক কথায় উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়, তপস্যা ও মেধার অনুশীলনের অভাব। ভারতীয় প্রাণশক্তির কেন্দ্র ঐ তপস্যা ও মেধায়—প্রজাপতি যে তপস্যা ও মেধায় এই বিশ্বসৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। তপস্যা ও মেধার লক্ষণ নির্দেশ করার চেষ্টা এখানে করিব না; ভারতীয় মেধা ও তপস্যার বৈশিষ্ট্য কোথায় বা কিসে, তারও বিচার এখানে করিব না।

শুধু একটা প্রশ্ন করিব—ভারতে তপস্যা ও মেধার ত অভাব ছিল না; ছিল না যে, তার প্রমাণ—হাজার হাজার বছর ধরিয়া ভারতবর্ষ জগদ্‌বরেণ্য ছিল, জগদ্‌গুরুর আসনে স-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারত শুধু আধ্যাত্মিকতায় বড় ছিল—আমুষ্মিককে যেমন ভাবে চাহিয়াছিল, ঐহিককে তেমন ভাবে চায় নাই, সুতরাং, জীবনের কার্যকরী শক্তি-নিচয়ের বেশ একটা সুস্থির সামঞ্জস্য (balance) গড়িয়া লইতে পারে নাই—এ অভিযোগ আমরা আজকাল বড়ই লঘুচিত্তে উপস্থিত করিয়া থাকি। কিন্তু এ অভিযোগ অযথার্থ। বেদে, উপনিষদে ভারতের যে পুরাণী মূর্তি দেখিতে পাই, সে মূর্তি সর্বাবয়বে পূর্ণ—পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক এই তিন লোকেই তিনি "ত্রেধা নিদধে পদং" করিয়াও পরিসমাপ্ত হন নাই, সেই বিরাট পুরুষের "সহস্রশীর্ষ" চির ভাস্বর দ্যুলোকে উত্থিত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার "সহস্রাক্ষ" অগণিত স্থির জ্যোতিঃ নক্ষত্রের মত অন্তরিক্ষে আতত দৃষ্টি মেলিয়া রহিয়াছে, তাঁহার "সহস্রপাৎ" এই পৃথ্বীতলে সহস্র জীবনযজ্ঞ-বেদিকায় স্থির-প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। ঋষিরা সেই পুরাণী-মূর্তি ধ্যান করিতে বসিয়া কোনরূপ পক্ষপাত করিতে সাহস করেন নাই। এই দৃশ্যমান আর ঐ অদৃষ্ট,—"অয়ং লোকঃ" আর "অসৌ লোকঃ"—উভয় এই আতত মূর্তি হইতে তাঁরা বল, তেজঃ, যশঃ, অন্ন, এক কথায় চতুর্বর্গ, আহরণ করিয়া লইতে চাহিয়াছেন। তাঁদের দৃষ্টির যেমন কোনও কার্পণ্য ছিল না, তাঁদের সাধনার তেমনি কোনও কুণ্ঠা ছিল না, তাঁদের চাওয়ারও কোনও সঙ্কোচ ছিল না। সোম হইতে, বরুণ হইতে তাঁরা অন্ন চাহিতেছেন, সে অন্ন শুধু দেহের অন্ন নয়, ইন্দ্রকে তাঁরা বৃত্র বা অহিকে বধ করার জন্য বজ্র উদ্যত করিতে অনুরোধ করিতেছেন; কিন্তু সে বৃত্র বা অহি কি কেবলই বৃষ্টিরোধকারী কোনও মানুষের নৈসর্গিক শত্রু? যে সবিতার বরণীয় ভর্গঃ (জ্যোতিঃ) ঋষি বিশ্বামিত্র ধ্যান করিতেছেন, সে জ্যোতিঃ কি শুধুই সূর্যের প্রাণদ তেজঃ? "সোলার মিথ" বলিয়া বড় বড় উপাখ্যানগুলিকে খতম করিয়া দেওয়া চলিবে কি? উপনিষদে আসিয়া ব্যাপক যে দৃষ্টির পরিচয় আমরা বিশেষ ভাবে পাই, সে দৃষ্টি কি মন্ত্রযুগে অপ্রস্ফুটিত ছিল? তেমন মনে করার কোনই সঙ্গত কারণ নাই।

সে যাই হউক, প্রাচীন কালে ভারতীয় বিদ্যা, ভারতীয় সভ্যতার যে চেহারা দেখিতে পাই, সেটা অপূর্ণাঙ্গ নহে। ঐহিক, বর্তমান, উপস্থিতকে উপেক্ষা করার কোন লক্ষণই তাহাতে নাই। যিনি আত্মবিৎ, তিনি আবার তেজস্বী, বীর এমন কি "অন্নাদ"-জৈবলি প্রবাহণের মতন।

পরবর্তী কালে, দৃষ্টি-সংকোচ হওয়ার লক্ষণ অবশ্য উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সেটা ভিতরে নিস্তেজ হওয়ার, তপস্যা ও মেধা হইতে ক্রমশঃ বিচ্যুত হওয়ার ফলেই হইয়াছে। তখন হয় ত "অয়ং"কে উপেক্ষা করিয়া "অসৌ"এর দিকে পক্ষপাত হইয়াছে। বৌদ্ধযুগে এ পক্ষপাতের লক্ষণ স্পষ্ট। বেদে অবশ্য যতিধর্ম বা "ফকিরি" লওয়ার রাস্তা দেওয়া ছিল।

ব্রহ্মোপনিষৎ, জাবালোপনিষৎ, আরুণিকোপনিষৎ, সন্ন্যাসোপনিষৎ, পরমহংসোপনিষৎ, প্রভৃতি অনেক উপনিষদে বিশেষভাবে এই ফকিরিরই কথা আছে। কিন্তু আচার্য রামেন্দ্র সুন্দরের অনুমান বোধহয় ঠিক হইয়া থাকিবে যে, বৌদ্ধেরাই এদেশে "দলবাঁধা বৈরাগীর" সৃষ্টি করিয়াছিল। বঙ্কিম বাবুও বৈরাগীর উপর তেমন প্রসন্ন ছিলেন না। আচার্যের অনুমান পুরাপুরিভাবে সমূলক কিনা, তার বিচার পণ্ডিতেরা করিবেন। তবে কথাটা ঠিক যে বৌদ্ধের শূন্যবাদ, ক্ষণিকবাদ, নির্বাণ, মোক্ষবাদ প্রভৃতি ইহলোকের পুরুষার্থ (values) গুলাকে একরকম "বাদ" দেওয়ার দিকেই ঝুঁকিয়াছিল। এ সকল বাদ অবশ্য একেবারে পড়িতে পারে না; অশোকের মতন মহারাজ চক্রবর্তীরাও একেবারে হাওয়ার উপর সিংহাসন পাতিয়া রাজত্ব করেন নাই! কিন্তু ঝোঁক—tendencyটা নিবৃত্তির দিকে, এটাকে ছাড়ার দিকে। এ ঝোঁক ভাল কিনা তার বিচার স্থল ইহা নহে। তবে, কথাটা এই যে, প্রাচীন ধারার (যেটার পূর্ণ বিকাশ উপনিষদাদিতে দেখিতে পাই) কতকটা মোড় ফিরিয়াছিল বৌদ্ধ যুগে। সনাতন ধারাটি যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। দুইটা ধারার মাঝখানে এক প্রকাণ্ড চরা জাগিয়া দুইটাকে যেন মিশিতে দেয় নাই। ঐহিক জীবন ও পারমার্থিক জীবন এই দুইটি যেন বিচ্ছিন্ন ধারা। বৌদ্ধ যুগে দ্বিতীয় ধারাটির খাতেই সব স্রোতটাকে চালাইবার চেষ্টা কথঞ্চিৎ হইয়াছিল। চেষ্টা করিলেই নৈসর্গিক প্রবাহের মুখ ফিরাইয়া দেওয়া যায় না। ইঞ্জিনীয়ারগণ "ড্যাম্" নির্মাণ করিয়া সেটা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু চিন্তা, বৌদ্ধ শ্রমণাদির জীবনাদর্শ ও শিক্ষা—এই সকল "ড্যাম" গড়িয়া নৈসর্গিক স্রোতটিকে অন্য দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। বৌদ্ধযুগ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তার তৈরী "ড্যাম্" এই আড়াই হাজার বছর ধরিয়া ভারতীয় জীবনস্রোতটিকে কতকটা দ্বিধা বিভক্ত করিয়াই দিতে চাহিয়াছে, এবং তার ফলে বহু শতাব্দী ধরিয়া আমাদের ঐহিকের খাতে প্রাণের স্রোতটি মন্দা হইয়া আসিয়াছে। এ মন্দা স্রোতে আর আমাদের সাংসারিক জীবনের বড় বড় জাহাজ কেন, ছোট ছোট পান্‌সিও ভাসিতে চাহে না। মাঝিরা হালে আর "পানি" পায় না; দাঁড়ী-মাল্লার বৈঠা তুলিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে হাত অবশ করিয়া ফেলিয়াছে; পাল হাওয়ার অপেক্ষায় এলাইয়া পড়িয়া আছে; যখন হাওয়া আসে, তখন অগভীর জলে পান্‌সি ছুটিয়া, চরায় উঠিয়া, একেবারে বানচাল হবার মতন হয়। এ দুর্দশার সূত্রপাত হইয়াছিল হাজার হাজার বছর আগে।

আচার্য শঙ্কর প্রভৃতি কেহ কেহ এই সনাতন অবিভক্ত ধারাটিকে আবার বহাইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ঠিক আগেকার মতন সবল ভাবে, গভীরভাবে, সতেজভাবে সে স্রোত আর বহে নাই। যতই অধিকারী সম্বন্ধে বাছ-বিচার করিতে চান না কেন, গৌড়পাদ শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ এবং রামানুজ, মাধব, নিম্বার্ক, বল্লভ প্রভৃতি আচার্যগণের প্রবর্তিত ভক্তিবাদ ভারতবর্ষের খাতে অনৈহিকতার (Other worldliness) ঝোঁকটাকে

আগেকার মতন সংযত ও সুসমঞ্জস করিয়া দিতে পারগ হয় নাই। প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্মের পাকা ভিত্তিটার তেমন সংস্কার সাধন হইয়া উঠে নাই, কুমারিল ভট্ট, আচার্য শঙ্কর নিজে, আরও অনেকে সংস্কারের জন্য যতই চেষ্টিত হইয়া থাকুন না কেন। হাজার বছরের উপেক্ষায় ও প্লাবনে বুনিয়াদ দমিয়া, ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল; তাকে আবার সিধে দৃঢ় তেমন করিয়া কেহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অনধিকারী সন্ন্যাসীর দল, বৈরাগীর দল উত্তরোত্তর বাড়িয়া গিয়াছে বই কমে নাই। যে বিশাল জনসঙ্ঘ ব্যবহারিক জীবনটাকেই ধরিয়া রহিয়াছে, তাদের মুষ্টিও ক্রমে শিথিল হইয়া আসিয়াছে; প্রাণের উপাসনায় বিরত হইয়া তারা প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং তাদের জীবন সাংসারিক হিসাবেও ব্যর্থ (failure), ত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিক দিয়াও ব্যর্থ। এ জীবনের লক্ষণ এক কথায় কার্পণ্য, দৈন্য, ক্লৈব্য।

বরং তন্ত্রের সমন্বয় (Synthesis)—নানা দিকে নানা ব্যভিচার সত্ত্বেও—সেই পূর্বের সামঞ্জস্য ও স্বাস্থ্যটিকে আবার ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া আংশিক ভাবে কৃতকার্য হইয়াছিল। এই সমন্বয়ের মূল কথা—জীবকে, সকল অবস্থার ভিতরেই ভোগে ও যোগে, নিজের মধ্যে শিবশক্তির মিলন করিতে হইবে। মহাশক্তি নিজের মধ্যেই রহিয়াছে, শক্তিস্বরূপই নিখিল বস্তু। এই শক্তি উদ্‌বুদ্ধ করিতে হইবে; তার ফলে সিদ্ধিই শুধু করতলগত হইবে এমন নয়, জীব নিজের শিবশক্তির অভিন্নভাব উপলব্ধি করিয়া পরম কৈবল্য লাভ করিবে। মায়া বলিয়া কিছুই উড়াইয়া দিবার প্রয়োজন নাই—সকল কর্ম এবং সকল তত্ত্বের মধ্যেই ব্রহ্ম বা শিবশক্তির অবিনাভাব দেখিতে হইবে। সকলই আনন্দময়ীর লীলাবিলাস। সাধককে তাই "বীরভাবে" ভোগের মধ্যে দিয়াই যোগারূঢ় হইতে হইবে। পশুভাব পাশবদ্ধ অবস্থা; এভাবে জীব নিজেকে শৃঙ্খলিত, নিরুপায় মনে করে। নিজেকে আনন্দবিগ্রহ, লীলা সমর্থরূপে জানিতে বুঝিতে পারে না। বীরেরা সাধনে কুলার্ণব তন্ত্রের ভাষায়, "ভোগো যোগায়তে মোক্ষায়তে সংসারঃ।" এমন কি "পঞ্চতত্ত্ব"—যাতে পশুজীবের সচরাচর পতন—তাহাকেই মোক্ষ পাওয়ার সোপান করিয়া লইতেছেন তিনি। মহানির্বাণতন্ত্র অবধূতকে যে মন্ত্রে সন্ন্যাস গ্রহণের আবশ্যক হোমটি করিতে বলিতেছেন, সেই মন্ত্রই তন্ত্রোক্ত জীবনের মূল মন্ত্র—"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং, ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম সমাধিনা"। একথার বিস্তার এখানে করিব না; কথাটা এই যে, তন্ত্রের পথ, বেদের নির্দিষ্ট পথ হইতে আপাত-দৃষ্টিতে বাহ্যতঃ কতকটা আলাদা হইলেও, বেদোক্ত সেই সনাতন মার্গের ধরণটা ঠিক বজায় রাখিয়াছে; এক-লক্ষ্যানুবর্তিতা ত' আছেই। মহা-নির্বাণতন্ত্র প্রভৃতি কলিযুগের জন্য বৈদিক বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাটিকে কতকটা "ঢালিয়া সাজিয়াছেন" সন্দেহ নাই; কিন্তু সে প্রাচীন ব্যবস্থার প্রাণ (spirit) তাঁরা অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন বলিয়াই হিন্দুত্বের ক্রোড়ে বেদ ও আগমের নিবিড় মিলন হইয়া গিয়াছে। তন্ত্রের মূল ভারতবর্ষের

বৈদিক ধর্মের ভিতরে বাহিরে যেখানেই থাকনা কেন, বৌদ্ধ যুগেই ইহার বিশেষ পরিণতি হইয়া থাক্ বা নাই-ই থাক্, একথা অসন্দিগ্ধ যে, পরে বেদাম্নায় ও তন্ত্রাম্নায়ের মাঝখানে আর কোন মারাত্মক "খানা" রহিয়া যায় নাই। বৌদ্ধযুগে "ঐহিকের" সঙ্গে যোগটিকে যেখানে যেখানে শিথিল করা হইয়াছিল, হিন্দু তন্ত্রে সে যোগটিকে আবার বেশ দৃঢ় করিয়াই দেওয়া হইয়াছিল; এমন ভাবে যে, যেন সে "যোগ" (অথবা "ভোগ") প্রকৃত যোগের অন্তরায় না হইয়া বরং তার সাধকই হইতে পারে। জীবনের ছোট বড় সকল রকমের কাজগুলিকে এইভাবে ধর্মসাধন করিয়া নেওয়া, সব কাজ সুচারুরূপে করিয়া তার ভিতর দিয়াই ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্মনিষ্ঠা অর্জন করা—এইটাই ছিল বৈদিক ঋষি ও স্মৃতি শাস্ত্রকারদের সম্মত পন্থা। কাজের একটু আধটু রকমারি করিয়া দিলেও, তন্ত্রশাস্ত্র এ পন্থা হইতে নামিয়া পড়েন নাই। স্মার্তদের মতনই তন্ত্রশাস্ত্র ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ,—এই ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধ না করিয়া (অর্থাৎ "আনৃণ্য" লাভ না করিয়া) কাহাকেও অবধূত হবার অনুমতি দিতেছেন না। যাঁরা শ্রুতি "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"—এই পাঁতির দোহাই দিয়া দলে দলে স্বামী পরমহংস করিতেছিলেন, তাঁরা তন্ত্রের দরবারে তেমন জোর সনন্দ পাইবেন না। এমন কি গুরুর লক্ষণে "আশ্রমী" গুরুরই প্রশংসা বেশী। অপরাপর নানা দিকে, নানা বিষয়ে, তন্ত্র ঐহিকের সংগে আমাদের যোগটি সতেজ ও দৃঢ় করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। এ অবসাদের যুগে, নৈষ্কর্মের যুগে, তন্ত্রের আসল ধর্মটা তাই যুগ ধর্ম। বলা বাহুল্য, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, সকল প্রকার তন্ত্রই আছে, এবং তন্ত্রোক্ত সাধনসিদ্ধি আছে।

ঋগ্বেদে যেমন বলের পুত্র বা শক্তির পুত্র ("সহসঃ সূনুঃ") ভাবে ইন্দ্রের উপাসনা করার কথা আছে (বিশেষতঃ সেই সব ঋক্ গুলিতে, ভরদ্বাজ ঋষি যাঁদের দ্রষ্টা), ইন্দ্রের হস্তে সাক্ষাৎ বজ্র আয়ুধরূপে দেওয়া হইয়াছে, যে আয়ুধের দ্বারা তিনি বৃত্র, অহি প্রভৃতি বধ করিয়া দেবতা ও মানুষের কাছে সকল শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ বর্ষণ করিয়া দেন; উপনিষদের অন্তর্দৃষ্টিতে তেমনি এই পরমতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—বলহীন কখনই আত্মাকে লাভ করিতে সমর্থ নয়। শঙ্করাচার্য "বলহীনেন" মানে লিখিতেছেন—"বলহীনেন আত্ম-নিষ্ঠাজনিত-বীর্যহীনেন"। বেশ কথা, বীর্যহীন, ক্লীব, অশক্ত ব্যক্তি কখনও আত্মনিষ্ঠও হইতে পারে না, আত্মজয়ীও হইতে পারে না। শ্বেতাশ্বতর যোগের উপদেশ করিতে গিয়া বলিতেছেন—"দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং, বিদ্বান্ মনোধারয়েতাপ্রমত্তঃ"—বিদ্বান, অপ্রমত্ত, কিনা স্থিতধী হইয়া দুষ্টাশ্বযুক্ত এই মনোরূপী যানটিকে ধারণ ও পরিচালন করিবেন। হৃদয়ে প্রভূত শক্তি না থাকিলে, এসব দুর্নিবার অশ্বদের "লাগাম" টানিয়া রাখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণও গীতায় অর্জুনকে "মহাবাহো" এই বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং, অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।" মহাবাহু যিনি, তাঁহারই এ কাজ।

পাতঞ্জল সূত্রে রহিয়াছে "তীব্রসম্বেগানামাসন্নঃ"—যাঁরা তীব্র সম্বেগ, মহোৎসাহ সম্পন্ন, তাঁহাদেরই সিদ্ধি আসন্ন। দুর্বলের রাস্তা-এ নয়। তখন আলপ্‌স্‌ পর্বতমালা ফুঁড়িয়া রেলের "ট্যানেল" তৈয়ারী হয় নাই, কিন্তু তথাপি মহাবীর নেপোলিয়ানের বিজয়-অক্ষৌহিণী মার্শাল "নে"র অঙ্গুলি হেলনে দুর্লঙ্ঘ্য, তুষার-কিরীটি তুঙ্গগিরি অতিক্রম করিয়া একটা মহা শ্যেনের মতন ইতালীর বক্ষোভূমিতে গিয়া পড়িল; যিনি আত্মবিৎ হইতে চান, তাঁহারও "অভিযান" এইরূপ "অসাধ্য সাধনে" প্রস্তুত হওয়া চাই। এ যদি বীরের আচার না হয়ত বীরের আচার কি? প্রাচীন "জীবনবেদে" বীর্য ও ব্রহ্মচর্যই গোড়ার কথা। বীর্যই বীজমন্ত্র। তন্ত্র শক্তিকে কেন্দ্রে বসাইয়া সেই পুরাতন জীবনবেদকে সঞ্জীবিতই করিতে চাহিয়াছেন। বেদ ও তন্ত্রের মধ্যে বিরোধটাকেই যাঁরা বড় করিয়া দেখেন, তাঁদের এই নিগূঢ়, সত্যকার মিলনটির দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

আমরা বেদেরই কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মাঝখানে সাধ করিয়া খানা কাটিয়া বসিয়াছি—বলা বাহুল্য, "আপনি মজিতে এবং লঙ্কা মজাইতে"। মুক্তির জন্য কর্ম ও জ্ঞানের "সমুচ্চয়" স্বীকৃত হউক আর নাই হউক, একথা ঠিক যে, প্রাচীনেরা কর্মকে শ্রদ্ধা করিতেন, কর্মের দ্বারা অন্ন, যশঃ ও বীর্য অর্জন করিতেন, এবং কর্মের প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন। যাঁরা উপনিষৎ বা বেদান্ত পড়েন, তাঁরা সময় সময় ভুলিয়া যান যে, যজ্ঞ লইয়াই, কর্মকাণ্ডের মন্ত্র অনুষ্ঠান লইয়াই তাঁদের "আঙ্গিরস" বা "অঙ্গানাং রসঃ" নিঙড়াইয়া বা দোহন করিয়া বাহির করার প্রয়াসেই বেদান্তের সৃষ্টি। যেটা বহিরঙ্গ, সেটাকে অন্তরঙ্গ, যেটা বহির্মুখ, সেটাকে অন্তর্মুখ করিয়া নেওয়া হইতেছে যজ্ঞ, যজ্ঞাঙ্গ—এ সবটাকে idealize, spiritualize করার চেষ্টাতেই উপনিষৎ।

ইতিহাসের দৃষ্টিকার্পণ্য

প্রকৃত প্রস্তাবে, ইতিহাসকে একটু বড় করিয়া দেখা দরকার। মানবাত্মার নিতুই নব সাজপোষাকের ইতিহাস গাড়ী গাড়ী লিখা হইয়াছে বা হইতেছে। সাজপোষাক আমাদের অনাবশ্যক বোঝা বা জঞ্জাল সব সময়ে নহে, অনেক সময় সাজপোষাক দেখিয়া যে সাজিয়া বেড়াইতেছে তার কতকটা ধাঁজ ধরণ আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু সাজ অনেক সময় ছদ্মবেশও হইতে পারে। অর্থাৎ, যে ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া একটা দেশের প্রাণ আমরা বুঝিতে চাহিতেছি, হয়ত, বাহ্যদৃষ্টিতে, সে ঘটনাবলী সেই প্রাণের স্বরূপটিকে ঢাকিয়াই ফেলিয়াছে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কাজের ভিতর দিয়া আমরা জাহির না হইয়া যেমন ঢাকা পড়িয়া যাই। যে ব্যক্তি আমাদের খাঁটিভাবে জানে, সে হয়ত তেমন কাজ আমাদের করিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়। এইজন্য শুধু সাজপোষাক বা ঘটনার ক্যাটলগ বানাইয়া ইতিহাস লেখা যায় না। কোনও একটা বড় কাটা কাপড়ের দোকানে বহুলোকের মেলা অর্ডারি পোষাক মজুদ রহিয়াছে দেখিয়া আমাদের ইহা ভাবিলে চলিবে না যে, পোষাকের খোদ মালিকেরাই খাসা আলমারিজাত হইয়া বাস করিতেছেন। অবশ্য পোষাকের মধ্য দিয়াই তাঁহাদের রুচি, এমন কি প্রকৃতিও কিছু না কিছু ধরাছোঁয়া দিয়াছে; আমরা যাহা কিছু স্পর্শ করি, তাহারই উপর আমাদের প্রকৃতির ছাপ কিছু না কিছু লাগাইয়া দিই—একথা এই অস্পৃশ্যতাবর্জনের যুগেও নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে।

প্রধানতঃ তিন কারণে শুধু ঘটনা অবলম্বন করিয়া সত্য ইতিহাস লেখা যায় না। প্রধানতঃ, বিশেষ সাবধান হইয়া সমীক্ষা করিলেও ঘটনা-পুঞ্জের সবখানি, এমনকি আসলটাই, আমরা না জানিতে পারি। বিশেষতঃ, ঘটনাপুঞ্জ যেখানে বর্তমান নহে, আমাদের সম্মুখে উপস্থিত নাই। বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি এমনিই জটিল (লক্ষণে ও নিদানে), যে অনেক সময়ই দেখা যায়, কোন একটা বড় ঘটনার বিবৃতি ও ব্যাখ্যা দিতে গিয়া একজন যাহা বলিলেন, আর একজন ঠিক তাহা বলিলেন না, এমন কি, হয়ত' কতকটা বিরুদ্ধই বলিলেন। সাত কাণার হাতী দেখার মত, তাঁরা ঘটনাটির বিভিন্ন অঙ্গে হাত বুলাইয়াছেন মাত্র। একজন যে দিক (angle) হইতে দেখিয়াছেন, অপরে ঠিক সে দিক দিয়া দেখেন নাই। হয়ত একদিক দিয়া দেখিয়াও, একজনে যে সব প্রত্যঙ্গে (featuresএ) মনোযোগ করিয়াছেন, অপরে ঠিক সেই সব জায়গাতেই তেমন খেয়াল করেন নাই। আমাদের রোজকার রোজ জীবনেও, ছোটখাট দেখা শোনায় আমাদের সাক্ষ্য গরমিল হইতে দেখা যায়। ভারতে বৌদ্ধযুগ অথবা ফরাসি-বিপ্লব—এই রকম একটা প্রকাণ্ড, জটিল ঘটনা-পরম্পরার বেলায় (বিশেষ, যেখানে

ঘটনাস্থলে আমরা স্বয়ং হাজির থাকিতে পারি না), সেখানে গরমিল না হওয়াই আশ্চর্য। অভিজ্ঞ বিচারক হয়ত অনেকে সাক্ষ্য মিলাইয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত জাব্দা—তাহাতে একান্ত নির্ভর করা যায় না।

ঘটনার অবিশ্বাসিনী হওয়ার দ্বিতীয় কারণ এই যে, যতখানি উদার অপক্ষপাত লইয়া ঘটনার জটলা আমাদের ঘাঁটিতে যাওয়া উচিৎ, ততখানি অপক্ষপাত আনিয়া ফেলা সব সময় সম্ভবপর হয় না। স্বাভাবিক রাগদ্বেষ ত' আছেই, তার উপরে আবার বদ্ধমূল সংস্কারের বেমালুম শাসন ও প্রিয় থিওরির সোহাগের অত্যাচার। সংস্কারের ঠুলির চারিভিতে দেখার সাধ্য সাধারণতঃ আমাদের নাই, থিওরির ফরমাইস মতন আমাদের চলিতে হইবে। "বেদ চাষার গান"—এই থিওরি স্কন্ধে চাপিয়া থাকিলে, আমরা বেদের সৈকত-ভূমিতে পাথর নুড়ি কুড়াইতেই আজীবন ব্যস্ত রহিব ; দেখিব না, জানিব না, যে, সে রত্নাকরের অগাধজলে কত গভীর, কত অপূর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের হীরা জহরৎএর খনি থরে থরে সাজান রহিয়াছে। চাষার গানেরই সমজদার রহিয়া গিয়া, আমাদের প্রাচীন পুণ্য তপোবনের অপূর্বগৌরবমণ্ডিত ভাব, ভাষা ও ছন্দে অতুলনীয় সামগান শুনিয়া তারিফ করিবার কাণটাই আমরা খোয়াইয়া বসিয়া আছি। আরও এক কারণে ঘটনা বা তথ্য সামনে পাইয়া, তাহার উপর, ভিতরকার ভাব (purpose) ও নিগূঢ় অর্থ (meaning) সম্বন্ধে অনুমান গড়িয়া তোলা চলে না। পূর্বে বলিয়াছি, তথ্যের উপকরণ—যাহা আমরা সচরাচর হাতে পাইয়া থাকি, তাহা যথেষ্ট (sufficient) নহে, সম্ভবতঃ পক্ষপাতাদি-দোষ-লেশ-শূন্য নহে। ইংরাজি ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায় যাহাকে malobservation (দুষ্টদর্শন) এবং যাহোক non-observation (অদর্শন) বলে, সেই দ্বিবিধ ক্রটিই আমাদের সংগৃহীত তথ্যের মালমসলায় বিদ্যমান থাকা সম্ভব। এ ছাড়া আবার এমনও হইতে পারে যে, যেটাকে সত্যের সন্দেশবাহী তথ্য বলিয়া আমরা আদর করিতেছি, সেটা হয়ত' সত্যের দিক দিয়াও ঘেঁসে নাই ; হয়ত সেটা একটা ছদ্মবেশ, একটা মরীচিকা ; আমাদিগকে ভিতরে ভাবের ঘরে মর্মপুরীতে লইয়া না গিয়া বাহিরে ঘুরাইয়া বিভ্রান্ত ও অবসন্ন করিয়া দিতেছে। আমাদের দেশের এবং ইজিপ্ট-ব্যাবিলন প্রভৃতি অপরাপর দেশের প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠানের অনেক "অঙ্গ" হয়ত' "তথ্য" হিসাবে সাহেব পণ্ডিতদের কাছ হইতে বিবৃতি যাহা পাইয়াছে তাহাতে মোটামুটি কাহারও আপত্তির কারণ নাই ; কিন্তু গোল বাধিয়াছে তখনই যখন তাঁরা তথ্যের পিছনে 'তত্ত্ব'টিকে অনুষ্ঠানের মুল ভাবটিকে আবিষ্কার করিতে গিয়াছেন। তথ্যটিই এমন যে তাহা গবেষণাকারীর মাঝখানে তত্ত্বের পথে অভিসারিকা তাঁহাদের মণীষাকে, ফাঁকি দিয়া পথ ভুলাইয়াছে। তত্ত্বের সন্ধান না পাইয়া পণ্ডিতেরা অনেক ক্ষেত্রেই এ সকল অনুষ্ঠানকে এনিমিজম্, শ্যামানিজম্, টটেমিজম্, ম্যাজিক, সর্‌দারির কোঠাতেই ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এ কথা স্থির যে, প্রাচীনেরা অনেক তথ্য প্রহেলিকার আকারে, রূপক প্রতীকের আকারে

সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন; অনেক সময় যেটি বলিতে চান তার উল্টাটিই যেন বলিতেছেন, যেন সঙ্কেতাভিজ্ঞ ছাড়া আর কেহ সহসা তাঁহাদের ভাব ধরিতে না পারে। শুধু বলাতে নয় করাতেও তাঁরা যেন ভিতরের কোনও কোনও ভাবকে বা তত্ত্বকে গুপ্ত ধনের মতন গোপনই করিতে চাহিতেন। কেন চাহিতেন তার কৈফিয়ৎ পরে পাইব। তত্ত্ববিদ্যা তাঁদের কাছে "রহস্য" ছিল, "গোপ্য" ছিল—হাটে বাজারে সওদা করার মাল ছিল না। কৌলোপনিষৎ বলিতেছেন—"আত্মরহস্যং ন বদেৎ। শিষ্যায় বদেৎ।" অন্যত্র—প্রাকট্যং ন কুর্য্যাৎ"। প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক টীকাকার ভাস্কর রায় এ সম্বন্ধে লিখিতেছেন—প্রাকট্যাপত্তে-র্মিত্রায়াপি ন বদেদিত্যর্থঃ। অতএব 'কর্ণাৎ কর্ণোপদেশেন সম্প্রাপ্তমবনীতলমিতি স্মৃতিঃ।' গুরুমুখ হইতে শিষ্যের কর্ণে এই তত্ত্বকথা প্রবেশ করিত। সাধকের পক্ষেও অন্তঃস্থিত ভাবটি গোপন রাখিবারই হুকুম ছিল। কৌলোপনিষৎ পুনশ্চ বলিতেছেন—"অন্তঃ শাক্তঃ। বহিঃ শৈবঃ। লোকে বৈষ্ণবঃ। অয়মেবাচারঃ।" শেষে সূত্রটির উপর ভাস্কর রায় লিখিতেছেন—"সন্ত্যন্যেঽপি কৌলিকানামাচারাস্তন্ত্রেষু বিহিতাস্তেষাং সর্বেষাং মধ্যে প্রাকট্যাভাবরূপাচার এবাতীব মুখ্য ইত্যর্থঃ।" তন্ত্রে কৌলিকের অনেক আচারের কথাই আছে বটে, কিন্তু সেই সকল আচারের মধ্যে "প্রাকট্যাভাবরূপ," অর্থাৎ নিজের ভাবটি গোপন করারূপ, আচারটি অতীব মুখ্য। এখন প্রাকট্যের যুগ পড়িয়াছে; যে যাহা লিখিতেছে তাই ছাপাইয়া বাজারে ছাড়িতেছে, যাঁরা আবার "কেষ্ট বিষ্টুর" মধ্যে তাঁদের লেখা কেন, মুখের কথাটিও রেডিও সাহায্যে সাত সমুদ্র তেরনদী পার হইয়া ভূমণ্ডলময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। প্রাচীনদের এটা দস্তুর ছিল না। তাঁরা বিদ্যা কোথায় গোপন করিলে শ্রেয়স্করী এবং কোথায় প্রকাশ করিলে ভয়ঙ্করী হইয়া থাকে, তাহা বিলক্ষণই বুঝিতেন। প্রাচীনদের ধারণায় একটা খুব বড় কথা এই—বিদ্যা মজুদ রহিয়াছে ত সব। খাঁটি তত্ত্বকথা জগতে নূতন করিয়া আবিষ্কার করার কিছুই নাই। কোন্ যুগে কাহাদের কোন্‌টী গোপন থাকিবে, কোন্‌টি বা কথঞ্চিৎ প্রকাশ পাইবে—সে বিষয়ে একটা নৈসর্গিক ব্যবস্থা রহিয়াছে। যুগপ্রবর্ত্তকেরা সে ব্যবস্থা মানিয়া চলেন। যুগ বিশেষের যতটুকু অধিকার বা যোগ্যতা, ততটুকুই তার আদায়। অন্যায় আদায় করিতে যাইলে হিতে বিপরীত হইয়া থাকে। এইজন্য সকল সময় সকল দেশে অথবা সকল পাত্রে সব রহস্য ভাঙ্গা চলে না, অথবা স্বাভাবিক নিয়মেই নিজেকে ভাঙ্গিতে দেয় না। এটা খুব প্রয়োজনীয় কথা। পরে ইহার ভিত্তি আমাদের পরখ করিয়া দেখিতে হইবে।

প্রধানতঃ এই তিন কারণে, শুধু ঘটনা সাজাইয়া ইতিহাস লেখা চলে না। জটিল ঘটনাপুঞ্জের এক অংশেই হয়ত আমরা হাত বুলাইয়াছি; আমাদের মগজের থিওরিগুলো হয়ত সেই অংশটুকু সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটিকেও যথার্থ হইতে দেয় নাই; হয়ত আবার সেই অংশটুকু, গোটা তথ্য অথবা তন্নিহিত তত্ত্বটি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে উল্টা ধারণাই জন্মাইয়া দিয়াছে। এ অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটির সম্ভাবনা হালের "বৈজ্ঞানিক পুরাণকারেরা"

যে আদৌ দেখিতে চান না এমন নহে। অনেকের জবানবন্দী বা এজেহার মিলাইয়া দেখার (Comparing notes) একটা প্রথাও বড় বড় পরিষৎ বা সোসাইটি গুলির অজ্ঞাত নহে। বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষাফলটি অনেককে "চাকিয়া" দেখাইবার পর তাদের রায়ের (verdictএর) যেমন ধারা একটা গড় কষিয়া লইবার ব্যবস্থা আছে, তেমন ধারা গড় কষিয়া লওয়া ইতিহাসের জটিল ব্যাপারের বেলায় সম্ভবপর হয় না। কুরুক্ষেত্র সমর কবে হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে পশ্চিমে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। কোলব্রুক সাহেবের মতে খৃঃ পূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে এই যুদ্ধ হইয়াছিল; উইলসন সাহেব ও এলফিনষ্টোন—তথাস্তু: উইলফোর্ড সাহেব বলেন—১৩৭০ খৃঃ পূঃ অব্দে, বুকাননের মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে; প্রাট্, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে; ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন এই সকল গণনার গড় কষিয়া কি আমাদের কুরুক্ষেত্রের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের উপায় দেখিতে হইবে? কেবল, অনুমান বা সিদ্ধান্ত বলিয়া নহে, তথ্য বা facts সম্বন্ধেও গড় কষিয়া ঐতিহাসিক পাকা সত্যটিকে বাহির করিয়া লওয়ার উপায় নাই। তবে কি এ জাতীয় প্রত্নতত্ত্বের কোনও দাম নাই? আছে। ওপরের খোসা লইয়াই বেশীরভাগ প্রত্নতাত্ত্বিকের কারবার সন্দেহ নাই; কিন্তু খোসাটাও ফেলিবার সামগ্রী নহে। খোসার ভিতরেই শাঁস থাকে, এবং সব সময়ে না হউক কোন কোন সময়, পুরাপুরিভাবে না হউক আংশিক ভাবেও, খোসা দেখিয়া ভিতরের শাঁসের অবস্থাটা আন্দাজ করা চলে। তবে জিনিস অনেক সময় বর্ণচোরা হইয়া থাকে, "অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর" হইয়া থাকে। সেখানে খোসাতেই এই লাগিয়া মজগুল হইয়া থাকা চলে না। খোসা ও শাঁসের কথায় আমাদের ভাল করিয়া খেয়াল রাখিতে হইবে। "তথ্য" বা কথাটা একটা মোটা কথা। বৃহদারণ্যক বা ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋষিরা কি ভাবে, কিরূপ চিন্তার মধ্য দিয়া বায়ু, আকাশ, প্রাণ প্রভৃতির ভিতরে অমৃতের অন্বেষণ করিতেন, তাহা আমরা দেখিতে পাই। ইহা একটা তথ্য। আবার যজুর্বেদীয় শতপথ তৈত্তিরীয়, ঋগ্‌বেদীয় ঐতরেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণে একটা যজ্ঞ কি কি অনুষ্ঠান করিয়া করিতে হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেখিতে পাই। ইহাও একটা তথ্য। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"—এ উপদেশও বৃহদারণ্যকে আছে; আবার হোম করিতে গিয়া চমস, ইধ্ম প্রভৃতি চারিটি পাত্রই যে উড়ুম্বর দ্বারা নির্মাণ করিতে হইবে; দশটি গ্রাম্য ধান্য, অন্যান্য ওষধি সকল এবং যজ্ঞীয় ফল সকল যে যথাশক্তি সংগ্রহ করিয়া দধি মধু ও ঘৃত দ্বারা সিক্তিত করিয়া হোমোপযোগী করিয়া লইতে হইবে,—এ ব্যবস্থাও বৃহদারণ্যক দিতেছেন। পরবর্তী ব্রাহ্মণে কে কার "রস" বা সার তাহা চমৎকার ভাবে বলিতেছেন—"এষাং বৈ ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপোঽপামোষধয় ওষধীনাং পুষ্পাণি পুষ্পাণাং ফলানি ফলাণাং পুরুষঃ পুরুষস্য রেতঃ।" তার পরবর্তী অংশে সেই শ্রেষ্ঠ রসটিকে কি ভাবে রক্ষা করিতে হইবে এবং প্রজা সৃষ্টির জন্য কি ভাবে তার ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার অনুষ্ঠানগুলি মায় মন্ত্র সহিত

বর্ণিত হইয়াছে। এ সকলই তথ্য। সবই তথ্য হইলেও "একদরের" তথ্য নহে। কোনটায় মানবাত্মার একেবারে অন্তরঙ্গ সাধনের এবং শ্রেষ্ঠ অনুভূতির কথা; কোনটায় বহিরঙ্গ সাধন এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নতর অনুভূতির কথা। এ সকল তথ্যকেই এক পর্যায়ভুক্ত করা চলে না।

তথ্যরাজিকে একটা ক্রমোন্নত ভঙ্গীতে বিন্যস্ত করিয়া লইতে হইবে। প্রাচীনেরা কেমন করিয়া উল্কি কাটিতেন, এলুন-আলপনা দিতেন—এগুলি এক থাকের তথ্য; তাঁদের সামাজিক জীবন কেমন ধারা ছিল, রাষ্ট্র কেমন ছিল, বাণিজ্য ব্যবসায় কিরূপ ছিল, বাড়ী ঘর দুয়ার কেমন ছিল—এগুলি উপরের থাকের তথ্য; তাঁদের সাহিত্য, সঙ্গীত, নীতি, ধর্মবিশ্বাস কেমনধারা ফুটিয়া উঠিয়াছিল—এগুলি আরও উপরের থাকের তথ্য; তাঁরা সনাতন তত্ত্বগুলির কতখানি পরিচয় ও আস্বাদ পাইয়াছিলেন, এবং এ সম্বন্ধে তাঁদের অনুভূতিটিকে কি পরিমাণে তাঁরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের গঠনে ও পরিচালনে নিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন, এবং তার ফলে কতখানি শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ সত্যভাবে তাঁরা অর্জন ও আয়ত্ত করিয়াছিলেন—এইটিই হইল সর্বোচ্চ থাকের তথ্য। আমরা তথ্যগুলিকে সাজাইবার মোটামুটি একটা নক্সা দিলাম। উল্কি তিলককাটা হইতে পরমাত্মায় জীবাত্মায় আহুতি—এ সবখানি লইয়াই পূর্ণ মানবের সত্যকার জীবন। নিতান্ত তুচ্ছ হইতে পরম মহান্—এ সবেরই সত্যকার জীবনে স্থান আছে, প্রয়োজন আছে। একভাবে না একভাবে, এ সকলই মানুষের জীবনে পাশাপাশি ঘরকন্না করিয়া থাকে। হক্স্‌লি সাহেব উল্কি কাটিতেন কিনা, এ সংবাদ আমরা রাখি না; কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে অবশ্য গলায় নেকটাই বাঁধিতেন, জুতায় ফিতা আঁটিতেন। লর্ড কেল্‌ভিন একভাবে মাথার চুল কাটিতেন; রবীন্দ্রনাথ আর একভাবে কাটেন। এ তথ্য অবশ্য নিতান্তই খোলসের তথ্য! কিন্তু দরকারী। ভগবান খোসাটা বাদ দিয়া ফল রচিতে নারাজ হইয়াছেন। তবে খোসাটা তার গর্ভে খানিকটা ফাঁকা পূরিয়া রাখুক—এটাও তাঁর অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। ব্যাপক দৃষ্টিতে "তুচ্ছ" বলিয়া কিছু নাই। প্রাচীনেরা এই গোটা জীবনটাকেই ধর্মসাধন বলিতেন। তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্রে কেমন করিয়া টিকি বাঁধিতে হইবে, তিলক কাটিতে হইবে—ইহা হইতে সুরু করিয়া কেমন করিয়া সত্য-জ্ঞান আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে, এ সকল বিধিই নিঃসঙ্কোচে পাশাপাশি ঠাঁই পাইয়াছে। কেননা, এ সবখানি লইয়াই একটা অখণ্ড, বিচিত্র তথ্য—the fact of Life. এখনকার পণ্ডিতেরা তাঁদের অভ্যাস মত ছুরি চালাইয়া এই অখণ্ড সামগ্রীটিকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়াছেন, এবং আপনাদের হিসাব মাফিক তাদের এক একটা দর করিয়া দিয়াছেন। উল্কি তিলক তারা নিজেরা কাটেন না; যারা কাটে, তারা তাঁদের বিবেচনায় বর্বর। সুতরাং প্রাচীনদের (এবং "কোন কোন আধুনিকদের") উল্কি তিলকের তথ্যটিকে তাঁরা সমজদারের মত বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, বাজে জঞ্জালের মাঝে ঝাটাইয়া রাখিয়াছেন। মানুষের

নিজেকে সাজাইবার সহজ সংস্কার (decorative instinct), এনিমিজম্ টটেমিজম্, ম্যাজিক—এই সকল মুখরোচক কথায় কত কত পুরাতন রহস্য তাদের "মরম-কথা" হারাইয়া মূক বনিয়া রহিয়াছে। প্রাচীনেরা কেমন করিয়া মদ খাইতেন, কেমন সব রঙ্গীন ফুলকাটা পাত্রে মদ রাখিতেন, কেমন কাপড় চোপড়, গহনাপাতি পরিতেন, তাদের ঘর দুয়ার ছিল, সমাজ ছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসন পদ্ধতি ছিল ;—এ সকল তথ্যের অনেক গুলি অবশ্য সকল যুগেই এবং সকল দেশেই প্রয়োজনীয় তথ্য। কারণ এইগুলিই আটপৌরে জীবন। হালের পণ্ডিতদের অনেকে এ সব তথ্য বিস্তর সংগ্রহ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। খুব ভাল কথা। কিন্তু এদের মর্ম-গ্রহণে (interpretationএ) তারা কেহ কেহ দুই দফা ভুল করিয়া থাকেন।

তাঁদের দৃষ্টি (stand point)তে সে তথ্যগুলি দেখিতে অপারগ হইয়া ইঁহারা তাদৃশ জীবনের সকল অংশে সংগতি দেখিতে পান না; তথ্যরাজির মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রাণের সম্বন্ধটি তাঁরা ধরিতে পারেন না। যে ঋষি অরূপ অক্ষর আত্মতত্ত্বের উপদেশ করিতেছেন, তিনিই আবার উল্কি কাটার ব্যবস্থাও দিতেছেন; যিনি নীতিশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শ নিষ্কাম কর্মের কথা বলিতেছেন, যিনি জ্ঞান-যজ্ঞ পুরুষ-যজ্ঞ স্বাধ্যায়-যজ্ঞের উপদেশ দিতেছেন, তিনিই আবার, দেবগণ ও মনুষ্যগণ যাহাতে পরস্পরকে "ভাবনা" করিতে পারে সেই উদ্দেশে বৈদিক দ্রব্যযজ্ঞেরও বিধি দিতেছেন—এ সকল ব্যাপার হালের বহু সমালোচকের দৃষ্টিতে বড়ই অসঙ্গত, বড়ই আজগুবি ঠেকিয়াছে। এ অসঙ্গতির কৈফিয়ৎ তাঁরা সহজে দিতে চাইলেও, কৈফিয়ৎ সকল সময়ে সফল হয় নাই।

প্রথম কৈফিয়ৎ এই যে সে অনুন্নত যুগে মানুষের জ্ঞান কোন কোন বিষয়ে বেশ বিকাশপ্রাপ্ত হইলেও অনেক বিষয়ে অপরিণত ও অপরিপুষ্টই ছিল। মোটের উপর দার্শনিক চিন্তা (metaphysic) প্রাচীনকালে যা ছিল, তাতে কাহারও লজ্জিত হবার কারণ নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবজগৎ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা বড়ই সঙ্কীর্ণ, গোলমেলে ও ভাসা ভাসা ধরণের ছিল। সেখানে তারা রহস্যের কুয়াসার (mysticism) ভিতর দিয়া সত্যের চেহারাখানি ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই। জড়বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, শরীরবিদ্যা এ সকল বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে নাই। ইতিহাসে গল্প ও রূপকথা নির্বিবাদে সত্যঘটনাবলির পাশেই ঘরকন্না করিতে পারিত। এই কারণে যে ঋষি আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে খুব উঁচু কথা আমাদের শুনাইয়া আমাদের বিস্মিত করিলেন, তিনিই আবার পরমুহূর্তে পৃথিবী, গ্রহতারকা, মেঘবিদ্যুৎ এমন কি আমাদের নিজেদের শরীর সম্বন্ধেই নিতান্ত খেলো ও আজগুবি কথা বলিতেছেন। যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য ধ্যান ধারণার উপদেশ দিতেছেন, তিনিই আবার "ভূত-প্রেত" তাড়াইবার জন্য মন্তর-তন্তর জুড়িয়া দিতেছেন। সে অনুন্নত যুগে মানুষের মগজে স্বতন্ত্র কুঠারিতে এ সব পাশাপাশি বাস করিতে পারিত। এখনও যেখানে যেখানে "অনুন্নত মধ্যযুগ" জোর করিয়া টিকিয়া আছে,

সেখানে ইহারা পাশাপাশি বাস করে। পশ্চিমের ভাবুক লেখকেরা এদেশে বেড়াইতে আসিয়া এই ব্যাপারটি দেখিয়া অনেক সময় বিস্মিতও হইয়াছেন, আমোদ অনুভবও করিয়াছেন। এড্‌ওয়ার্ড কার্পেনটার কয়েক বৎসর আগে এদেশে বেড়াইতে আসিয়া "From Adam's Peak to Elephanta" নামে একখানা বই লেখেন (১৮৯২ ; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯০৩)। অনেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিমত্তার পরিচয় তিনি এই বইখানি যায়গায় যায়গায় দিয়াছেন। পরম গুরুস্বামী নামে একজন ভাল যোগীর কথা ইনি খুব ফলাও করিয়া লিখিয়াছেন। যোগীটির আকৃতি ও আচার-ব্যবহার সুন্দর। তাঁর তত্ত্বকথা খুবই উচ্চ এবং খুবই গভীর। অবশ্য যে সব তত্ত্বকথা শুনিয়া ভারতবর্ষের মতন বিরাট দেশের বিচিত্র ধর্মবিশ্বাস বা সাধন সম্বন্ধে জাব্‌দা বলিবার সাহস হওয়া কাহারও উচিৎ নয় ; সাহেব স্থানে স্থানে সে সাহস করিয়াছেন। ইষ্ট এবং ওয়েষ্টেএর ধাতের পার্থক্য দেখাইতে গিয়া সাহেব লিখিতেছেন—Thus in the East the will constitutes the great path, but in the west the path has been more especially through Love—and probably will be" ইত্যাদি। অবশ্য ওয়েষ্ট মানে এখানে যীশুখৃষ্টে সমর্পিত-মনঃ-প্রাণ ওয়েষ্ট সাহেব এখানে "গোটা হাতীর" অঙ্গ বিশেষেই হাত বুলাইয়াছেন। তবে তিনি ভারতবর্ষের অন্তঃপ্রকৃতির যেটুকু দেখিয়াছেন, সেইটুকুই বা কয়জন দেখিয়াছেন? ভারতবর্ষের এই হাজার গোলামি বছর দেখিয়া আমরা অনেকেই ভাবি যে, ইচ্ছাশক্তির (willএর) গলা টিপিয়া মারাই ভারতীয় সাধনার খাঁটি নিজস্ব বাহাদুরী। সে যাহাই হউক, সাহেব "পরম গুরুর", জ্ঞান দেখিয়া যতখানি বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাঁর "অজ্ঞান" দেখিয়া ততোধিক বিস্মিত হইয়াছিলেন—"I am not a sticler for modern science myself, and think many of its conclusions very shaky ; but I confess it gave me a queer feeling when I found a man of subtle intelligence and varied capacity calmly asserting that the earth was the centre of the physical universe and that the sun resolved round it !" তারপর সুমেরুর কথা ; লোকালোক পর্বতের কথা, রাহুকেতুর কথা ; ইত্যাদি ইত্যাদি। জ্ঞানের প্রবীণতা ও শৈশব কেমন ধারা বেমালুব পরস্পরের গায়ে গা দিয়া রহিয়াছে! সাহেবদের এইটিই প্রথম কৈফিয়ৎ।

দ্বিতীয় কৈফিয়ৎ এই যে, পুরাতন পুঁথিগুলি এখন যে আকারে আমাদের হাতে উপস্থিত হইয়াছে, সে আকার তাদের মৌলিক আকার নহে। সেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পাঁচমিশালি জিনিব। বেদব্যাস মহাভারত রচিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান মহাভারত যে কতখানি "বেদব্যাসী" তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা শক্ত। বঙ্কিমবাবু তাঁর "কৃষ্ণচরিত্রে" এ প্রশ্নের বিচার করিয়াছেন, এবং বিচারের কয়েকটা মূল সূত্রও মানিয়া লইয়াছেন। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র পশ্চিমের বিগত শতাব্দীর "যৌক্তিকতাবাদ" (Rationalism)

এর প্রভাবে কতকটা অভিভূত না হইয়া পারেন নাই। সেই "Culture myth", "Star myth" প্রভৃতির দিনে তিনি যে মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত ইত্যাদির "অতি-প্রাকৃত" ভাগগুলিকে অলীক ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিবেন, ইহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। এখন, পশ্চিমের বিজ্ঞান জগতে নূতন বিপ্লব উপস্থিতির ফলে সে দেশেরই চিন্তার হাওয়া এবং বিশ্বাসের কম্পাসের কাঁটা দিক্ বদ্‌লাইয়াছে। এখন দেশের বড় বড় মাথা শ্রদ্ধার পাল' তুলিয়া তাদের পরীক্ষার জাহাজটিকে জীবনের পরপারে প্রেতলোকের ঘাটে পাড়ি দেওয়াইতেছেন। বড় বড় নামজাদা বৈজ্ঞানিকদের সেই কঠশ্রুতির বালক নচিকেতার মত বিশ্বাস ও সাহস দেখিয়া সত্যই খুব আহ্লাদ হয়। এখন প্রাকৃত ও অতি-প্রাকৃতের মাঝখানে সেই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর মনগড়া খানাটি ক্রমশঃ ভরাট হইতে চলিল। ম্যাজিক, সরসারি, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস—এ সবের ব্যাখ্যায় সেই সাবেকি আনিমিজম্, টটেমিজম্, স্যামানিজন্ প্রভৃতি থিওরি আর "হালে পানি" পাইতেছে না। নূতন তথ্য সমূহের আবিষ্কারের ফলে, এ সকল থিওরি লইয়া লম্ফ ঝম্ফ কতকটা ছেলেমির সামিল হইয়া পড়িয়াছে। সে যাহা হউক বড় বড় "স্যাভান্ট" (মনীষী) গণ তাঁদের চিন্তা পরীক্ষার মানমন্দিরে দাঁড়াইয়া ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য "লোকায়ত" জগতের চক্রবালের অন্তরালে যে নূতন রশ্মিরেখাগুলি দেখিতেছেন, সে রশ্মিরেখা অবশ্য এখনও প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার পাতাল মন্দির ভূগর্ভনিহিত অতীতের সমাধি কক্ষগুলিতে লব্ধ প্রবেশ হয় নাই। সেখানে "New thought" এর এখনও সাড়া পৌঁছায় নাই। সেই কারণে এখনও সেখানে ম্যাজিক, সরসারি, প্রক্ষিপ্তবাদ প্রভৃতি নিঃসঙ্কোচে বাস করিতেছে। বিপ্লবের ঢেউ সেখানে পৌঁছায় নাই। অতীত যুগকে অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর যৌক্তিকতাবাদের (যাহাকে সময়ে সময়ে Higher Criticisms ও বলা হইত) কষ্টিপাথরে কষিতে গিয়া আমরা তাহার মধ্যে যতখানি খাদ বাহির করিয়াছিলাম, সত্য সত্যই ততখানি খাদ তাহাতে আছে কিনা, ইহা এক্ষণে বিচার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কষ্টিপাথরখানিতেই আমরা এখন আগেকার মতন আস্থা স্থাপন করিতে নারাজ। সে সকল তথ্যকে আগে "Legend" (গল্প), "Myth" (রূপকথা) ইত্যাদি আখ্যা দিয়া ঠেলিয়া রাখা হইত, এখন আমরা ক্রমে বুঝিতেছি, সে সকল তথ্য একেবারে আষাঢ়ে গল্প না হইতেও পারে। রূপক বা প্রতীক (Symbol) হিসাবে তাহাদের মূল্য আমরা আগেও একটু আধটু স্বীকার করিতাম, যদিও অধিকাংশ স্থলেই, উপরের গল্পের খোসাটাতে দন্তস্ফুট করিয়া ভিতরকার তত্ত্বের শাঁসটি আমরা বাহির করিতে পারিতাম না। গল্প অনেক সময়ই নিতান্ত অলীক, অসম্বদ্ধ, অর্থহীন এমন কি, অশ্লীলতা বর্বরতা প্রভৃতি দোষে দুষ্ট বলিয়াই আমাদের ঠেকিয়াছে। আমাদের বেদে, পুরাণে তন্ত্রে উদাহরণের অসদ্ভাব নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে বিবৃতি বা উপাখ্যানের অপেক্ষাকৃত স্থূল ইঙ্গিতটি আমরা ধরিতে পারিলেও, সূক্ষ্মতত্ত্বের ত্রিসীমানা দিয়াও তেমন

যাইতে পারি নাই। বেদে একাধিকবার পণিঃ অসুরের দ্বারা দেবতাদের সাদা সাদা গরু চুরির গল্প আছে। পাশ্চাত্য ভাষ্যকারদের দৃষ্টিতে ইহা "সৌর উপাখ্যান"—Solar myth বই, খুব জোর ফিনীসীয় বণিকজাতির সঙ্গে সংঘর্ষের উপাখ্যান বই, আর বড় বেশী কিছু নয়। রাত্রির অন্ধকার সূর্যের আলোকপুঞ্জকে কেমন ধারা গুহার মধ্যে পুরিয়া রাখে; সূর্য কেমন ধারা উষা বা সরমার সাহায্যে সেই গুহাবদ্ধ "গাভীগণ"কে মুক্ত করিয়া দেন; এই দৈনন্দিন নৈসর্গিক তথ্যটি হেঁয়ালির ভাষায় ঐ ঋকগুলিতে বলা হইয়াছে মাত্র। যদি আবার ম্যাক্সমূলারের মত কোনও পণ্ডিত এই বৈদিক মিথের সঙ্গে গ্রীসের মহাকবি হোমরের পারিস হেলেনা উপাখ্যানটিকে মিলাইয়া দিতে পারিতেন, তবে আর আমাদের আস্ফালনের সীমা পরিসীমা থাকিত না। কিন্তু এরূপ লম্ফ ঝম্ফ করার সৌভাগ্য সকল সময়ে আমাদের ঘটিত না। বেদের রাশি রাশি সূক্ত ও ঋকের মহারণ্যে আমরা কখন কখন "বনের পাখীর গান" এবং অনেক সময় কিচির মিচির শুনিতে পাইলেও, এবং অন্ধকারে সত্যের পথ খুঁজিতে খুঁজিতে কচিত কদাচিৎ আমাদের দৃষ্টির সামনে একটু আধটু আলোকরশ্মি রেখা সম্পাত হইয়া থাকিলেও, মোটের উপরে আমরা শ্রুতিগহনে পথহারা দিশেহারা হইয়াই ছিলাম।

কেবল আমাদের দেশ বলিয়া নয়, অন্য দেশেরও অতীতের প্রেতাত্মার ঐতিহাসিক শ্রাদ্ধ এই ভাবেই কিছু দূর গড়াইয়াছে। ব্যাবিলনের সেমেটিক (বঙ্কিমবাবুর ভাষায় "সীমীয়") সভ্যতা খুব পুরাতন। কিন্তু সেটাও আবার প্রাচীনতর সুমেরু আকাডের অসীমীয় (non-semitie) সভ্যতার অঙ্কেই লালিত, পালিত, বর্ধিত। পারস্যোপসাগরের মাথায় যেখানে ইউফ্রেটিস্ নদী আসিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে এরিডু (Eridu) নামে এক প্রাচীন নগর ছিল। কত প্রাচীন তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত। টাইগ্রিস ইউফ্রেটিসের মোহনায় পলিপড়ার ধরণ হইতে গণিয়া অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ৪০০০ চারি হাজার বৎসর আগে ঐ নগর পারস্যোপসাগরের উপকূলবর্তী ছিল। এবং অধ্যাপক সাইস্ সাহেব লিখিতেছেন—There must have been a time when Eridu held a foremost rank among the cities of Babylonia, and when it was the centre from which the ancient culture and civilazation of the country made its way." পাদটীকায় লিখিতেছেন—"The decay oJ Eridu was probably due to the increase of the delta at the head of the Persian gulf, which made it an inland instead of a maritime city, and so destrayed its trade. এখন এই Eridu এর প্রাচীন উপাখ্যান (সাহেবী ভাষায় " culture myth") আমাদের বলিতেছেন, কি ভাবে সমুদ্র হইতে "অর্ধমীন অর্ধমানব" এক দিব্যপুরুষ উপস্থিত হইয়া সমগ্র ব্যাবিলোনিয়ার

অসভ্য বর্বর সমাজে জ্ঞানালোক ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয় লিখিতেছেন—"Ancient legends affirmed that the Persian Gulf—the entrance to the deep or ocean Stream—had been the mysterious spot from whence the first elements of culture and civilazation had been brought to chaldea." Berosses এর ইতিহাস হইতে তিনি ঐ দিব্যপুরুষের অভ্যুত্থানের গল্পটিও আমাদের শুনাইয়াছেন। গ্রীকভাষায় ঐ দিব্যপুরুষের নাম হইয়াছে—Oannes-ওয়ানেস্! তিনি পুরাতন সুমেরের জ্ঞান দেবতা Ea হইতে অভিন্ন। সে যাহা হউক, এই ক্যালডীয় মৎস্যাবতারের রহস্যের আমিষগুলিই আমরা হাত বুলাইয়া সংগ্রহ করিতে পারিলাম। আমাদেরও পুরাণে ভগবান মৎসরূপী হইয়া প্রলয় পয়োধি জলে বেদ সকলকে ধারণ করিয়াছিলেন! ইহার ভিতরে গভীর তত্ত্ব আছে।

বলা বাহুল্য, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রায়ই সে তত্ত্বের আবিষ্কারে তেমন যত্ন করেন নাই। গভীর তত্ত্বের ভাবনা চিন্তা সাধারণতঃ সভ্যতা বিকাশের অর্বাচীন যুগেই হইয়াছে, প্রাচীন যুগে হয় নাই—এই থিওরি তাঁদের স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া থাকায় তাঁদের দৃষ্টি প্রায়ই বহির্মুখী হইয়াছে। ভিতরে গল্প, ম্যাজিক, অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর বড় কিছু নাই—এই বিশ্বাসে তাঁরা প্রাচীন সভ্যতার অন্দরমহল (inner court) টি তেমন মনোযোগের সহিত খোঁজ তল্লাস করেন নাই। ঋগ্‌বেদের প্রসিদ্ধ "ত্রেধা নিদধে" ঋকে সায়ণাচার্য বিষ্ণুর বামনরূপে পাদত্রয় বিক্ষেপের কথা বলিয়া কি ঝকমারিই করিয়াছেন। Vedic Grammar, Vedic Mythology প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা অধ্যাপক ম্যাকডোনেল এজাতীয় ব্যাখ্যায় অসহিষ্ণু হইয়া বলিতেছেন—Thus sayana considers the Dwarf incarnation of Vishnu to be referred to in R. V. 1. 22. 16 ff yet Yaska (xii 19) seems to know nothing of that incarnation, which in any case can be shewn to have been a mythological development of the post-Rigvedic period." এইরূপ ঋগবেদে রুদ্র কোন মতেই পুরাণকারের পার্বতীবল্লভ রুদ্র হইতে পারেন না। এজাতীয় "mythological development" এর শাক দিয়া সকল সময়ে যে বেদের অর্থ গৌরবের আমিষ খণ্ডটিকে যে ঢাকা চলিবে না, তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখাইতে প্রয়াস পাইব।

এখন এরিডুর মীনাবতারের প্রাচীন গাথা হইতে অধ্যাপক সাইস মঁসিয়ে লঁ্যারমা প্রভৃতি assyriologist গণ সাব্যস্ত করিলেন কি? "আধা মাছ আধা মানুষ" —এটা টেইলর সাহেবের মানসপুত্র এনিমিজম্ এরই বংশাবতংস টটেমিজম্ ("টটেম্" অথবা পশুপক্ষী সরীসৃপকে দেবতা বানাইয়া পূজা করা) বই আর কি হইবে?

তবে নীললবণাম্বুরাশি হইতে তাহার অভ্যুত্থান?—ইহার মধ্যে অবশ্য একটা মস্তবড় দরকারী ঐতিহাসিক তথ্য লুকানো রহিয়াছে। প্রাচীন ক্যালডীয় সভ্যতা অর্ণব পথে দূরদেশ হইতে আসিয়াছিল। একদিকে ঈজিপ্ট ও সিনাই-উপত্যকা—অন্যদিকে ভারতবর্ষ—এই দুই দেশের সঙ্গে স্মরণাতীত কাল হইতেই ক্যালডীয়ার ব্যবসাবাণিজ্য চলিত। তাহার অনুরূপ পাকা নিদর্শনও আছে। তন্মধ্যে একটা এই—ভারতের "সিন্ধু" নামক বস্ত্র ও সব দেশে আমদানী হইত; গ্রীক, হিব্রু, ব্যাবিলোনীয় ভাষায় "সিন্ধু" কথাটা সামান্য রূপান্তরিত হইয়া রহিয়া গিয়াছিল; পারস্যের মধ্য দিয়া স্থলপথে সিন্ধু শব্দটি, শব্দের অভিধেয় পদার্থের সাথে যাত্রা করিলে "স" "হ" হইয়া যাইত; কিন্তু তাহা হয় নাই। অতএব সরাসরি কালাপানি পার হইয়াই গিয়াছিল। পক্ষান্তরে, স্বর্গীয় লোকমান্য তিলকের অনুমান এই যে, ঋগ্‌বেদের "মনা" শব্দটি ভারতীয় আর্যেরা ক্যালডীয়দের কাছ হইতে কর্জ করিয়াছিলেন। শব্দটি ফিনিসীয়, গ্রীক লাটিনে সামান্য একটু চেহারা বদলাইয়া বিদ্যমান ছিল দেখা যায়।

ব্যাবিলোনীয়ার মীনাবতারের উপাখ্যান হইতে এইটুকু ঐতিহাসিক তথ্য নিংড়াইয়া বাহির করিয়া পণ্ডিতেরা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কোথায় কবে কি হইয়াছিল, কে কার আগে, কে কার পিছে, কে উত্তমর্ণ কে অধমর্ণ—এই সব লইয়া বাদানুবাদই যেন ইতিহাস। প্রাচীন সভ্যতা ও সাধনার প্রাণটি সেই রূপকথার রাজকন্যার মত পালঙ্কে মরার মতন এলাইয়া পড়িয়া আছে; শয্যাপার্শ্বে মরণকাঠি ও জীওনকাঠি দুই-ই পড়িয়া আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু পণ্ডিতেরা, কার অভিসম্পাতে বলিতে পারি না, জীবন কাঠিটা অনেক সময় খুঁজিয়া না পাইয়া মরণকাঠির সাহায্যেই রাজকন্যার সাজপোষাক, আসবাব পত্র—এ সবের মাপ লইয়া এক অফুরন্ত, অসামাল, ভয়াবহ ক্যাটালগ তৈয়ারি করিয়া যাইতেছেন।

প্রোফেসর বারনার্ড বোসাঁকে (Bernard Bosanquet) তাঁর "Social and International Ideas" (1917) নামক গ্রন্থে "Atomism in History" নামক তাঁর দেওয়া বক্তৃতাটি অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বক্তৃতাটি উপাদেয়। আমরা যাকে "ক্যাটালগ" তৈয়ারি করা বলিতেছি, তিনি সেইটাকে "method of slips" Anatole France ঐ পদ্ধতির (অবশ্য অপব্যবহারের) "শ্রাদ্ধ" করিয়াছেন। বোসাঁকে "Agathon"এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ফরাসী Faculty of Letters (Sorbonne)র অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছেন:—"Every research begins with a collection of slips, and they esteem you at the Sorbonne according to the number of your slips. He is a great savant, worthy of your respect, who has before him thousands of these coloured bits of pasteboard the infinitesimal dust of knowledge." এই টুকরা করিয়া দেখার পদ্ধতির

অতি প্রকোপে সমগ্র অবিচ্ছিন্ন তথ্য ও তত্ত্বের পরিচয় ("দর্শন" শাস্ত্রের যেটা কাজ) অসম্ভব হইয়া পড়িতে পারে। গোটা ও জীবন্ত পরিচয়ের জন্য যে পদ্ধতির অনুসরণ আবশ্যক, সেটিকে বোসাঁকে "the method of context", "of pervading life" বলিয়াছেন। অনুক্রমণিকা এবং ঘটনা বিশেষের সঙ্গে বৈশ্বানর প্রাণের সংযোগটি পুরাপুরি লক্ষ্য করিয়া তবে চলিতে হইবে। সামাজিক ইতিহাস এবং ভাবাভিব্যক্তির ইতিহাসে এই নীতির অনুসরণ করা ছাড়া "মূল্যবান্ ফল" পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই।

ভস্মাসুর

পুরাণে গল্প আছে, এক দৈত্য তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া এক অদ্ভুত বর লইয়াছিল। একে আশুতোষ, তাতে আবার ভোলানাথ, কাজেই "তথাস্তু" বলিয়া ফেলার সময় আর খেয়াল করেন নাই—বরের শ্রাদ্ধ কতদূর গড়াইবে ও দেবতাটির না হয় ভাঙ্‌ খাইয়া নেশা করার ব্যায়রাম আছে; কিন্তু ব্রহ্মা ও বিষ্ণু খাসা "সেন ও সোবার দেবতা" তাঁরাও দেখি সময় সময় বর দিতে যাইয়া এমন বেতাল হইয়াছেন যে, শেষকালে তাল সামলাইতে "আত্মারাম খাঁচা ছাড়া" হবার উপক্রম হইয়াছে। এক এক সময় বেশ তালিমও দেখি তাঁদের। হিরণ্যকশিপু তপস্যা করিয়া অমর হবার সাধ করিল। কিন্তু সে আরজি সরাসরি মঞ্জুর হইল না। তখন হিরণ্যকশিপু অবধ্য রহিবার এমন কি ফিরিস্তি বাহির করিল, যাতে শর্তের ফাঁক বাহির করার জন্য শ্রীভগবানের নৃসিংহাবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল। বুদ্ধি খরচ করিয়া ফিরিস্তি বাহির করিলেই ফাঁক কোথাও না কোথাও রহিয়া যাইবেই; আর সেই ফাঁকেই শেষকালে মাৎ হইতে হইবে। এই ব্রহ্মাণ্ডের কারবার যাহা হইতে এবং যাকে আশ্রয় করিয়া চলিতেছে, তার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতির গতি বা ধারাই নিয়তি—Reign of cosmic Law। এটা একটা বিশ্ব-বেড়াজাল। এ জালের ভিতরের কোন কিছুর দ্বারা এ জাল এড়াবার জো নেই। "বুদ্ধি"কে "মহৎ" বলা হয় বটে, কিন্তু তাহার মহত্ত্বই বা কতটুকু! বিশ্ব বেড়াজালের ভিতরেই সে রহিয়াছে ও খেলিতেছে। বুদ্ধি প্রকৃতির দুহিতা। মেয়ে মার ঘাড়ে চড়িবে, মাকে ডিঙাইয়া যাইবে, এমন বেয়াদপি তাহার থাকিলেও, পরওয়ানা নাই। বুদ্ধি দ্বারা প্রকৃতির ষোল আনা এমন কি আসলটাই বোঝা যায় না। বুঝিতে গেলে নিজের ঘাড়ে নিজে চাপিতে হইবে, নিজের ছায়া নিজে ডিঙাইতে হইবে। বোঝায় কার্পণ্য রহিবেই ফাঁক থাকিবেই। সেই দার্শনিক কাণ্টের ভাষায়—Thing-in-itself is un-understandable. Forms and categories have no transcendental application.

এই ত' গেল মেয়ের বাহাদুরি। নাতিটির বাহাদুরি আরও চমৎকার। প্রকৃতি ঠাকুরাণীর নাতি অহঙ্কার, অস্মিতা—"আমি" জ্ঞান। আরও তলাইয়া হিসাব করিয়া নাতির "রাশ নাম" রাখিতে হয়। কিন্তু আমরা "ডাক নামেই" কাজ চালাইব। নাতিটি যেমন অভিমানী, তেমনি আব্‌দারী। দিদিমণি নাতির আবদারেই এ দুনিয়াদারীর যত কিছু ভাঙ্গিতেছেন, গড়িতেছেন। আবদারও, অফুরন্ত ভাঙ্গাগড়াও

অফুরন্ত। কিন্তু একটা আবদার দিদিমণি রাখেন না—রাখার তাঁর সাধ্য নেই। নাতি—অহঙ্কার—আবদার করেন—"দিদিমণি, আমি তোমার চাইতেও বড় হব; তোমাকে ডিঙ্গিয়ে যাব।" দিদিমণি আর সত্যসত্যই "ছোট" হবেন কিরূপে? তিনিই যে "প্রধান"। তবে, নাতিটিকে ভোলানর জন্য কত না ফন্দি বাহির করেন। কখনও নাতির চোখে ঠুলি পরাইয়া দিয়া বলেন "এই দেখ যাদুমণি, কত রত্তি আমি, আর তুমি কত বড়।" যাদুমণি গোটা, আস্ত দিদিমণিকে দেখিতে না পাইয়া, তাঁর কাণটুকুতে হাত বুলাইয়াই ভাবে—এই ত' ধরেছি, এই ত' পেয়েছি তোমাকে! দিদিমণি নাতির কচি হাতের কাণমলা খাইয়া হাসিয়া আটখানা। ভাবেন কেমন ঠ'কিয়েছি! নাতিও হাসিয়া কুটকাট্‌। ভাবে কেমন জিতেছি।

কিন্তু কাণ ধরিয়া টানিলে যে মাথা আসে। মানুষের অভিমান তার দর্শন বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া সময় সময় দিদিমণির কাণ ধরিয়া টানিয়াছেও। টানিয়া দেখে—আর একটা কিছু আসিয়া পড়িতেছে! সেটা কাণের চাইতে বড়। মাথা ধরিয়া নাড়ানাড়ি করিলে গর্দান ও ধড় আসিয়া পড়ে। সেগুলি আরও বড়। দিদিমণির আর এক নাম তাই "অব্যক্ত"! তবেই ত'! দিদিমণি ত' আচ্ছা ঠকান ঠকিয়েছে! এ বেঠিকের ঠকাটি ঠিক ঠিক বুঝিলেই লেঠা অনেকটা চুকিয়ে যায়। তখন চোখের ঠুলি খসিয়া পড়ুক আর নাই পড়ুক, সুস্থির হইয়া দিদিমণির মিষ্টি সম্পর্কটুকু বোঝাতেও স্বস্তি! এই "কোল জুড়িয়া বসাই নাকি প্রকৃতিস্থ হওয়া—Live in Nature and according to Nature। অপ্রকৃতিস্থ থাকিতে স্বস্থ হওয়া যায় না। মানুষের অহমিকা তার দর্শন বিজ্ঞানের ভেতর দিয়া নষ্ট "স্বাস্থ্য" ফিরিয়া পাইবে কবে? অবশ্য "প্রকৃতিস্থ" হবার আর এক মানেও আছে—"স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ" হওয়া সেটা আপাততঃ থাকে।

বুদ্ধি ও অহঙ্কারের এই স্বাভাবিক ন্যূনতার জন্য তাদের কোনও ফন্দিতে বা ফিরিস্তিতে প্রকৃতির গতি—যেটাকে আমরা বিশ্ব বেড়া জাল বলিতেছিলাম—অতিক্রম করা যায় না। গীতায় শ্রীভগবান্ তাই না "মহদ্ ব্রহ্ম" বলিয়াছেন। ফন্দিতে ছিদ্র ফিরিস্তিতে ফাঁক থাকিবেই। এই ফাঁকি যে বুঝিল না, সে অযুত বর্ষ পঞ্চাগ্নি তপস্যা করিয়াও "কাঁচা ঘুঁটি" রহিয়া গেল। মধুকৈটভ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ আরও কত কে তপস্যার কসুর করেন নাই, কিন্তু সেই চিরকেলে নাতিটির খপ্পরে পড়িয়া শেষকালে সগোষ্ঠী নাজেহাল হইয়াছেন দেখি। যাই হোক আমরা যে দৈত্যের কথা পাড়িয়াছি, তার পাওয়া বরটি বড়ই অদ্ভুত। অবশ্য বর মাগিতে গেলে কেহই কম করিয়া মাগেন না। প্রহ্লাদের মত দু'একজন "অনপায়িনী", "অব্যভিচারিণী" ভক্তই মাগিয়েছেন বটে, কিন্তু প্রায়ই দেখি—মাগিতেছেন, "আমায় অমর বর দেও"। যতখানি আশা, ততখানি অবশ্য পূরে না। আশা না পূরিলে কেহ কেহ নবীন উদ্যমে আরও কঠোর তপঃ

করিতে সুরু করিয়া দেন। তখন দেবতাকে আবার ছুটিয়া আসিতে হয়। কিন্তু সেবারও আরজি মঞ্জুর হইল না। তখন অগত্যা, একটি রফা নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিতে হয়। দেবতা হয় ত' সর্তবন্দী করিয়া অমরত্ব দিতে প্রস্তুত। আচ্ছা, তাহাই হোক। সর্তের ফিরিস্তি মুসাবিদা হইল। যতদূর আঁট সাঁট করা চলে করা হইল। যিনি বর পাইলেন, তিনি ভাবলেন, "কাজ হাসিল হইয়াছে"। যে রকম বজ্র আটনি দিয়াছি, তাতে আমাকে ছোঁয় আর কার সাধ্য!" কিন্তু সেই বেআক্কেলে নাতিটির কাঁচা হাতের বজ্র আটনি ত'। ও ত' ফস্কা গেরো হইয়াই আছে।

প্রকৃতির গতি অথবা নিয়তিতে ঢালা-উবুর, ভাঙ্গন-গড়ন চলিতেছে। এ এলেকার মধ্যে সমস্তই ক্ষর; অক্ষর কিছুই নাই। সমস্তই জন্মাদি-ষট্-পরিণামশীল। এ বিশ্ব-প্রবাহের ধারা অনতিক্রমণীয়। অন্ততঃপক্ষে, প্রকৃতির গোষ্ঠী, নাতিপুতি সব খোস মেজাজে বাহাল তবিয়তে বজায়, কায়েম রাখিয়া কেহই এ ধারা অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। এ ধারার ভিতরে গতি স্থিতি—সবই আপেক্ষিক। এটা Realm of Relativity. একটানা একদিকে গতিও বরাবর সম্ভব নয়। এমন কি "শূন্যে"ও নয়। আমাদের এই পৃথিবীর পিঠে চলিতে সুরু করিয়া চলিতে চলিতে যেমন সেইখানেই ফিরিয়া আসিতে হয়, তেমনি space বা নভঃ প্রদেশেও গতিও নাকি এক সরল রেখায় অনন্ত নয়; আবার ঘুরিয়া আসিতে হয়। এই শূন্য বা spaceএর বক্রতা (curvature) শুধু যে গণিতের আজগুবি খেয়াল এমন নয়। দেশ ও কাল দুই সম্পর্কে দেখিলে বলিতে হয়—এই ব্রহ্মাণ্ডটা একটানা সোজাসুজি, কোন একদিকে ছুটিতেছে না; ঘুরিয়া ফিরিয়া পূর্বাবস্থায় আসিতেছে; আবার চলিতেছে, আবার ফিরিয়া আসিতেছে। এটা একটা চক্রগতি cycle যাক্, এ শক্ত কথাটা এখানে পাড়িলাম মাত্র। আসল কথা অমর হইতে গেলে এই প্রাকৃত ধারা হইতে কোন উপায়ে আলগ হইতে হইবে। আলগ হবার নানান্ উপায় আছে, অথবা, একই উপায়কে নানান রকমে দেখান হইয়াছে। যে সব দৈত্যের তপস্যার কথা বলিয়াছি, তারা কেহই আলগ হবার রাস্তা ধরে নাই। অথচ না ধরিয়াই সাধ করিল—অমর, অজর, অক্ষয় হইব। যাতে যা হবার নয়, তাতে তাই করিতে চাহিল, কাজেই ফাঁকিতে পড়িতে হইল। উপনিষৎ ইন্দ্র বিরোচনের উপাখ্যান বলিয়া মূল তত্ত্বটি শুনাইয়াছেন। "বিরজাঃ, বিমৃত্যু, বিশোক" বস্তুটিকে পাব বলিলেই পাওয়া যায় না। পাওয়ার রাস্তা ঠিক আছে বটে। সেই ঠিক ঠিক রাস্তায় হাঁটতে হয়। তপস্যা করিলেই ঠিক রাস্তা ধরা হয় না। আধুনিক যুগের অভিমানী আত্মাও ত' তার বিজ্ঞান-বিস্তার মধ্য দিয়া কঠোর তপস্যা করিতেছে দেখিতেছি। মাকাল ফলের মত রঙচঙে বরও কিছু কিছু মিলিতেছে দেখিতেছি। কিন্তু অমর বর? এমন বর, যাতে ক'রে মানবের আত্মা সেই বিরজাঃ, বিমৃত্যু, বিশোক বস্তুটির সন্ধান পাইবে? হায় আশা! বরং উল্টা

উৎপত্তি হইতেছে! সমুদ্র মন্থনে হলাহল উঠিতেছে। অমৃতের নামে গরল বিকাইবার ফাঁকি আর কতদিন চলিবে? বিশ্বপ্রাণীর মর্ম সন্তপ্ত, জর্জরিত। বিশ্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা আজ সত্য-শিব-সুন্দরের হলাহলপায়ি-নীলকণ্ঠ বিগ্রহাবতারের প্রতীক্ষায় আকুল হইয়া ফুকরিয়া ও গুমরিয়া মরিতেছে যে!

"বিরোচনী-মত" বা দেহাত্মবাদ থেকেই এ হলাহল উঠিতেছে বটে, কিন্তু আজিকার দিনে এর উৎস আরও গভীরে খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। পূর্ব শতাব্দীর দেহাত্মবাদ বা জড়বাদ এখনও "লোকায়ত" হইয়া আছে, সন্দেহ নেই, বরং বেশী বেশী লোকায়ত হইতেছে। গড্ বেচারী ত' আউট ভোট হইয়াছেন; রিলিজন ও ব্ল্যাক লিষ্টে। কিন্তু বিজ্ঞান বিদ্যার অন্তঃপ্রকোষ্ঠে জড়বাদের প্রতিষ্ঠা প্রস্তর শিথিল হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। বিজ্ঞান স্থূলের পূজা ছাড়িয়া সূক্ষ্মের পূজা ধরিয়াছে। কায়া ছাড়িয়া ছায়া মাগিতেছে, মামুলি কায়াটাই নাকি ছায়া। নতুন ছায়ার ভিতরেই না কি সত্যিকার কায়া লুকান' আছে। দেখা যাক—। কথা কয়টা এখন পরিষ্কার হবে না। যাই হোক—বিজ্ঞানের নূতন পূজার দেবতা যিনি বা যাঁহারা তিনি বা তাঁহারা কি অমৃতভাণ্ড হাতে করিয়া এই মথিত বিক্ষুব্ধ নবযুগ ক্ষীরোদধির মধ্য হইতে উঠিতেছেন? ভরসা হয় না। ভরসার লক্ষণই বা কোথায়? বিজ্ঞান যে এখনও চক্রের যেটা "নাভি", সেটা "আদৌ" স্পর্শ করেন নাই? এখনও যে নেমিতেই পাক খাইতেছেন! এ যে কালনেমি—এর পাকে মৃত্যুই আনে। কোথায় সেই তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি, যিনি স্বস্তি বহন করিবেন? স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে পাক খাওয়া চলিতেছিল—সৌরজগতে ও নক্ষত্র জগতে দেখিতেছি অণুর বা সূক্ষ্মের কোঠাতেও ইলেকট্রণ ইত্যাদির ঘাড়ে চড়িয়া সেই পাক খাওয়াই চলিতেছে। পাক খাওয়ার মামুলি ধারাটা একটু আধটু অদল বদল হইলেও চলিতেছে। স্থূলের এলাকায় আইনষ্টাইনের "রেলেটিভিটি"-মত একটুখানি ধারা বদল করিয়া দিয়াছে; সূক্ষ্মের এলাকায় "কোয়ান্টাম্" মতও অধিকন্তু নতুন ভোল' ফিরাইতেছে দেখিতেছি। সূক্ষ্মের ভেতরেও রেলেটিভিটি, শনৈঃ শনৈঃ লব্ধ প্রবেশ; কিন্তু কোয়ান্টাম বেজায় একগুঁয়ে, তার সঙ্গে আপোষ নিষ্পত্তি হইয়া উঠিতেছে না। তদ্বির উভয় পক্ষ থেকে চলিতেছে। কথা কয়টা সমঝদারেরা সাটে বুঝিবেন। আমি এখানে বলিতে চাই যে বিজ্ঞান বিদ্যা এখনও চাকার নাভিটি স্পর্শ করেন নাই। এটমের যেটাকে বলা হয় "নিউক্লিয়াস," সেটাও যে নাভি নয়! নাভি কোথায়? কোনখানে নিখিল প্রপঞ্চ আশ্রিত, কিসের দ্বারা বিধৃত? "বিরোচনী" বিদ্যায় সেটি মিলিবে না। উপনিষদের উপদেশ—ব্রহ্ম-বিদ্যা নৈলে শেষ পর্যন্ত চলিবে না। সেই ঋক্‌বেদের ঋষিরাই দেখি, চক্রের শুধু নেমিও অর নয়, নাভিরও খোঁজ করিয়াছিলেন। খোঁজ পাইয়াও ছিলেন মনে হয়।

চক্রের নাভিও অরের কথা বিজ্ঞান যে কল্পনায় না ভাবিয়াছেন ও ভাবিতেছেন, এমন নয়। অণু বা এটমের অন্দরে যে যজ্ঞশালাটি এই বিংশ শতকে আবিষ্কৃত হইয়াছে সে যজ্ঞশালায় যে অমর অগ্নি দীপ্যমান, তাহার অনেকগুলি জিহ্বা। রেডিও একটিভিটিতে আমরা মুখ্যত: তিনটি জিহ্বার পরিচয় পাই। সেই তিনটি অর্চি:-(Rays) কে আমরা আগে "বেদ ও বিজ্ঞান" এর আলোচনায় তিনটি শৃঙ্গ বলিয়াছিলাম। কেন না বেদে যেমন "সপ্ত জিহ্বা"র কথা আছে তেমনি তিনটি "শৃঙ্গ" এর কথা আছে। যাই হোক এই তিনটি অর্চি: আমাদের অনেক "হাঁড়ির খবর" বহন করিয়া আনিয়াছে ও আনিতেছে। এটমের যেটা "নিউক্লিয়াস" তার পরিচয় এরাই কিছু আনিয়া দেয়। এখন এক দফা পরিচয় এই যে—রেডিয়াম ইউরেনিয়াম প্রমুখ বিশেষভাবে "যজমান" (রেডিও-একটিভ্) বস্তু নিচয়ের যেটা সার শস্য (Core), তাতে "হিলিয়াম নিউক্লিয়াই" রহিয়াছে। ভূতবর্গের (Elements) যে পারম্পর্যক্রমের বৈঠক (Periodic Series) বিজ্ঞান সাজাইয়া ফেলিয়াছেন, তাতে দেখি, হাইড্রোজেন এর আসন সর্বাগ্রে। হাইড্রোজেন এর "ভৌতিক সংখ্যা" (Atomic Number) "রাম"। হিলিয়ামের নম্বর দুই। কাজে কাজেই হিলিয়াম বেশী "রাশ ভারীও"। এখন এই যে হিলিয়াম নিউক্লিয়াই অর্চি: পথে বিকীর্ণ হইতেছে, এগুলি কি মৌলিক পদার্থ না যৌগিক? ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দেখার এখনও সুবিধা হয় নাই। তবে, নানা কারণে মনে হয়—এরা যৌগিক, কতকগুলি মূল বস্তুর সঙ্ঘাতে সমুৎপন্ন। সে মূল মসলা হইতেছে—হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াই ও ইলেকট্রন। তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষায়—পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জেস। এই তাড়িত-মিথুনই ভূতগোষ্ঠির গোড়ায় আদম-ইভ্। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে দেখি ব্রহ্ম সিসৃক্ষু হইয়া প্রথম স্ত্রী পুরুষ বা মিথুন হইলেন। জড়তত্ত্বে এই সনাতন পুরাতন মিথুন আমরা পাই। মিথুন যে দুই বরাবর থাকেন, এমন নয়। হাইড্রোজেন এটমও (যতক্ষণ চার্জবিহীন, নিরপেক্ষ) এক পুরুষ, আর এক স্ত্রী—এক পজিটিভ চার্জ আর এক নেগেটিভ চার্জ। তাদের পরস্পরের বাঁধনে ও আকর্ষণে হাইড্রোজেনের সৃষ্টি, স্থিতি। লয়ের কথাও কেহ কেহ ভাবিয়াছেন। স্ত্রীটি পুরুষকে বেড়িয়া নাচিতেছেন। নাচিয়া বেড়ান'র কক্ষ ও ছন্দ:টি যে সব সময় একই থাকে, এমন নয়। এক কক্ষে পাক খাইতে খাইতে আর এক কক্ষে (বৃত্ত বা বৃত্তাভাসের মতন পথে) লাফ ("Jump") মারা হইয়া থাকে। এই লাফ মারার কসরৎ থেকেই না কি আলোকরশ্মির জন্ম। অর্থাৎ, বিন্দুবাসিনী সৌদামিনীর ঐ লাফ মারার সঙ্গে সঙ্গেই "প্রসব"। প্রসূতি প্রসবান্তে আবার নাচিয়া বেড়ান, এক মুহূর্তও বিশ্রাম (Confinement) নেই! যেটি "প্রসূত", সে শক্তি বপু—ঢেউএর বুকে চাপিয়া নিমেষে লক্ষ যোজন বেগে ব্যোম প্রদেশে (শূন্য না ঈথার?) ধাওয়া করে। তাকে বলি আমরা "রশ্মি"। ইনি বিজলিকুমার। বেদ অশ্ব ও রশ্মি দুই সরঞ্জামই দিয়াছেন, আদিত্যের রথে। মনে রাখিবেন—বেদের

"আদিত্য" শুধু যে ঐ প্রত্যক্ষ গোচর সূর্য, এমন নয়। সূর্য ও সোম—এ দুইই হইতেছেন ব্রহ্মের এক দফা মিথুন রূপ। ভৌতিক চক্ষে জ্যোতিঃ বা রেডিয়েসনের পজিটিভ ও নেগেটিভ—এই দুই রূপ ভাবিলে ভাবিতে পারেন। তবে, খুব হুঁসিয়ার হইয়া। বেদের physical interpretation আছে, কিন্তু তাতেই বেদ-বিদ্যা পর্যাপ্ত নহেন। আমরা চোখে যতটুকু দেখি, ততটুকুই জ্যোতিঃ, বিজ্ঞানও এ কথা বলেন না। জ্যোতি বিশ্লেষণ করিয়া বিজ্ঞান তার যে নক্সা (Spectrum) পাইয়াছেন, তাতে আমাদের চক্ষু-গ্রাহ্য রশ্মিগুলিই যে শুধু ঠাঁই পাইয়াছে, এমন নয়। আল্ট্রা ও ইনফ্রা থাকও আছে। অপটিক্ স্পেকট্রাম আছে, আবার এক্স্-রে স্পেক্ট্রামও আছে। আরও কিছু?

যাই হোক হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের কথা হইতেছিল। তার ভিতরের নক্সা কল্পনা ছকিতে এখনি তুলি ধরিয়াছেন। সেই সনাতন, পুরাতন মিথুনেরই ঘরকন্না। সর্বত্রই তাই। ইউরেনিয়ামের মত ঝুনো গেরস্তরা মস্তবড় সংসার পাতাইয়া ঘরকন্না করে। বহু স্ত্রী পুরুষের সংসার। এটমের যেটা অন্দর বা নিউক্লিয়াস, সেখানে একরাশ পুরুষ ও মেয়ে জটলা করিয়া রহিয়াছে। অন্দরের এই জটলা যেমন জটিল তেমনি জমকালো। তা ছাড়া বাহির বাড়ীতে তড়িল্লেখা চটুলচরণা নটীদের খাসা নাচ চলিতেছে। ঢিমে তেতালায় নয়। বেজায় জলদ। কম্‌সে কম নিরানব্বুইটি নাচ-ওয়ালী নানান্ রকমের ব্যূহ রচিয়া পাক খাইতেছেন; মাঝে মাঝে খোস খেয়ালে লাফও মারিতেছেন কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে বলা বাহুল্য, লাফের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঢেউ-সওয়ার রশ্মিকুমারের প্রসব। এই গেল বড় বড় গেরস্তদের কথা। এদের সমাজে এক হাইড্রোজেনই দেখি একনিষ্ঠ—মাত্র একটি পক্ষেই আশা পর্যাপ্ত! সময় সময় সেটিও বাপের বাড়ী যান। তখন তাঁর রুক্ষ "পজেটিভ" মেজাজ! আর সর্বত্র —বহু বিবাহ, সাদী, নিকা, কণ্ঠিবদল, "মোতা করম্ অফ্ ম্যারেজ" সবই চলিতেছে। আদি যুগের সেই রাক্ষস, আসুর বিবাহও মঞ্জুর। একে অর্ধাঙ্গিনী এক লহমায় ইলোপ করিতেছেন; পরকীয়া এক লহমায় বন্দিনী হইতেছেন। সব্বাই না কি তুল্যমূল্য। সকল ইলেকট্রনই রূপ গুণশীলে না কি সমান—সকলেরই "চার্জ" এবং "ম্যাস" না কি এক। এদের সমাজে "ন্যাশানালিজেশন অফ্ উইমেন" চলিতেছে। বিশ্বাস না হয়, সমারফেল্ড প্রমুখ হালের ঘটকদের কুলপঞ্জী বাহির করিতে বলিবেন।

যাই হোক্—আমরা হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের গেরস্তালীর কথা বলিতেছিলাম। গৃহলক্ষ্মীটি অসূর্যম্পশ্যা—এখনও অন্দর পর্যন্ত ঢুকিয়া কেহই "মুখ" দেখেন নাই। তবে, যেটি গোপন তার কল্পনায়ও সুখ! বরং বেশী বেশী। পরীক্ষা যেখানে পেছপাও, অন্বীক্ষা (গণিত বিদ্যা) সেখানেও আগুয়ান। কল্পনা করা হয় যে—হিলিয়ামের

নিউক্লিয়া—যাহা রেডিও-একটিভ পদার্থগুলি হইতে আলফা-রেজ হইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসে, কাজেই সেই সেই পদার্থের "কুলের খবর" আনিয়া দেয়—এর ভিতরে এক অপরূপ ব্যূহ বিগুমান। চারিটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াই (পজিটিভ-পুরুষ), দুইটি ইলেকট্রন (নেগেটিভ্-স্ত্রী) লইয়া ব্যূহ রচনা করিয়াছে। চক্রব্যূহ। ভৈরবীচক্র? চক্রের চারিটি অর (রেডিয়াই) এর প্রান্তে পরিধিতে চারজন "পুরুষ", আর চাকার যেটা "ধুরো", সেটা যেন দুই দিকে একটু একটু বাহির হইয়া আছে। সেই ধুরের দুই মুড়োয় দুইটি "স্ত্রী"। চক্র চলিতেছে। এই গেল হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের "যন্ত্র"।

মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র—এ তিনটি হইতেছে সৃষ্টির গোড়ার কথা। মন্ত্রের তত্ত্ব সংখ্যার তত্ত্ব। হাইড্রোজেনই হোক, হিলিয়ামই হোক, আর যে কেউ ভূতই হোক, প্রত্যেকেই সংখ্যার অধীন, সংখ্যা আশ্রয় করিয়া আপন সত্তায় সত্তাবান হইয়া রহিয়াছে। তার বীজসংখ্যা বা মূলমন্ত্রটি বদল হইল, সে বদলাইয়া আর কিছু হইয়া গেল। তার এটমিক নাম্বারটিই "জীওনকাঠি, মরণকাঠি"। "আইসোটোপস" অথবা একই নম্বরের ভূত কেউ কেউ যজ্ঞশালায় কদাচিৎ প্রাদুর্ভূত হন বটে; কিন্তু সাধারণতঃ ভূত গোষ্ঠীর মূল মন্ত্র আলাদা। ভূতের নিউক্লিয়াসে কতখানি নিট্ শক্তি সন্নিবেশ (চার্জ), তার হিসাবই তার বীজ সংখ্যার হিসাব। তার গুরুত্ব বা ম্যাস কতখানি, সেটা অপেক্ষাকৃত গৌণ হিসাব। আগে আগে রসায়নবিগ্তা ঐ গৌণ হিসাব করিতেই ব্যস্ত ছিলেন। এখনও সেটা আবশ্যক। ম্যাস বস্তুটিকে তখনকার দিনে "অব্যয়" জ্ঞান করা হইত। এখনকার দিনে সেটা এনারজি বা শক্তির সামিল হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই শক্তির বেশী-কমির সঙ্গে ম্যাসের (কোয়ানটিটি অফ ম্যাটারের) বেশী-কমি হইবে। অল্প-সল্প কারবারে সেটা নগণ্য। কিন্তু কোন ভূত যদি আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে দৌড়িতে আরম্ভ করে (অর্থাৎ সেকেণ্ডে প্রায় দু' লাখ মাইল), তবে সে বেজায় "রাশভারি" হইবে। আলোর গতিই না কি পরমা গতি। কোন ভূতই সে পরমা গতি লাভের আশা রাখে না। পরমা গতি লাভ করিলে সে গুরুর গুরু তস্য গুরু হইত। রেডিও একটিভিটির যজ্ঞশালা হইতে যে বিটা-রেজ (ইলেকট্রন) বাহির হন তিনি না কি পরমাগতির প্রায় কাণ ঘেঁষিয়া যান, কাজেই তার গৌরব অনেকগুণ সমধিক। সব ইলেকট্রনের ম্যাস যে তুল্য ধরা হয়, সেটা এই রকম ধারা গতি-নিরূপিত লাঘব-গৌরবের কমি-বেশীগুলো হিসাব করিয়া বাদ সাদ দিয়া। আইনষ্টাইনের ধারা চলার পর হইতে ম্যাস বা লঘুগুরুর হিসাব জটিল হইয়া পড়িয়াছে! ট্রু ম্যাস—না সত্যিকার গৌরব—অনেক মেহনত করিয়া আদায় করিতে হয়। সে যাই হোক—হিলিয়ামের সংসার যদি সত্যসত্যই ঐ রকমের স্ত্রী-পুরুষের (চারি পুরুষ, দুই স্ত্রী) সংসার হয়, তবে যজ্ঞশালা হইতে যে তিনজন (আল্‌ফা, বিটা,

গামা রশ্মি) বাহির হইয়াছিলেন, তাদের ভেতর প্রথম জনা মৌলিক শ্রেণীর দাবীটা করিতে পারিলেন না। হাইড্রোজেন—নিউক্লিয়াই (পজিটিভ, পুরুষ) আর ইলেকট্রন (নেগেটিভ, প্রকৃতি)—এই দুইজনাই তা হইলে ভূতবর্গের মধ্যে "নৈকষ্য" মৌলিক সাব্যস্ত হইলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই পুরুষ-প্রকৃতির মিথুনীভূত অবস্থা, বুড়োবুড়ীর "মনের মিলে সুখে থাকার" সংসার। বলা বাহুল্য, ঝগড়াঝাঁটি প্রায়ই হয়, আর, ব্যাপার দেখে পাড়ার লোককে পুলিশও ডাকতে হয়। বুঝলেন ?

সাংখ্যশাস্ত্রের পুরুষপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের এই বুড়োবুড়ীকে কেহ যেন গুলাইয়া না ফেলেন। সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি আরও গভীর স্তরের তত্ত্ব। ভূতের মর্ম-নাড়ীতে আমরা যে পুরুষ-প্রকৃতিকে দেখিলাম, তাদিগকে বেদের পরিভাষায় অগ্নি ও সোম, সূর্য ও সোম বলা চলিবে বটে, কিন্তু সাবধান হইয়া। বড় জিনিষকে খাটো করিয়া দেখিতেছি, একথা সর্বদা মনে রাখিয়া। যাক সে কথা পরে হইবে। আমরা প্রসঙ্গতঃ মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্রের কথা পাড়িয়াছিলাম। মন্ত্র সংখ্যাতত্ত্ব, কালশক্তি। যন্ত্র মানতত্ত্ব, দিক্‌শক্তি। একে Number, অপরে Magnitude। দুয়ে জড়াইয়া Four Dimensions of Space Time. এ কথাটী আর তন্ত্রের কথা আপাততঃ খোলসা করিতে চেষ্টা করিলাম না। শুধু এইটুকু বলিয়াই রেহাই লইব যে—মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র কেবল যে মানুষের সাধনাবিশেষের অঙ্গ, এমন কেহ যেন মনে না করেন। তত্ত্ববিদেরা, বিপশ্চিতেরা অত মোটা কথা কহিতেন না। প্রত্যেকটাই এক একটা জাগতিক রহস্য। জড়ে, প্রাণে, অন্তঃকরণে, স্থূলে, সূক্ষ্মে, অণুতে, মহতে—সর্বত্র তাদের সার্বভৌম অধিকার ও প্রয়োগ। যিনি জড়ের এটমিক নাম্বার জানেন, তিনি তার মন্ত্রটি জানেন, সে মন্ত্রশক্তির যথাযথ বিনিয়োগ করিতে পারিলে; তিনি সে জড় সৃষ্টি বা লয় করিতে পারিবেন। প্রাণের ও অন্তঃকরণের রাজ্যেও তাই। বিজ্ঞানের ঋত্বিকেরা প্রাণপাত করিয়া সে চেষ্টা করিতেছেন। বড়, রাদারফোর্ড, সামারফেল্ড, র‍্যামজে—এঁরা সব বড় বড় ঋত্বিক। বীজমন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে জড়ের বীজযন্ত্রেরও পরিকল্পনা, ধ্যানধারণা চলিতেছে। অর্থাৎ ভূতের সংসারের সদর অন্দরের নক্সা। সংসারে কয়জন ?—এই হইল একটা প্রশ্ন। আমরা খোঁজ লইয়াছি হাইড্রোজেনে মাত্র দুই জন; হিলিয়াম-নিউক্লিয়াসে ছয় জন। এই রকম আর আর। সপ্তম মণ্ডলে (Seventh Seriesএ) যে ভূতবর্গ আছেন তাঁরা খুব জাঁদরেল যজমান (রেডিও একটিভ), আর তাঁদের গেরস্থালীও খুব বড়। অন্দরেও (নিউক্লিয়াস) গুলজার, বাহিরেও (পাকখাওয়া, নাচাকোঁদার আসরেও) গুলজার। রেডিয়াম হইতে সুরু করিয়া ইউরেনিয়াম পর্যন্ত সপ্তম মণ্ডলে কয়টি "রাবণের গোষ্ঠী" গেরস্ত বিদ্যমান। যজমান যে শুধু এঁরাই, এমন না। সম্ভবতঃ ভূতনামা যজমান অল্পবিস্তর দু'কুড়ির উপর যজ্ঞশালার সমাচার এরি মধ্যেই পাইয়াছি। আরও পাইব সন্দেহ নেই। যজ্ঞ শুধু যে "দক্ষযজ্ঞ" মারণ-যজ্ঞ,

ভাঙ্গন-যজ্ঞ, এমন নয়। সকল রকম যজ্ঞই আছে, মায় বশীকরণ। সত্যিই। বিজ্ঞানের কল্পসূত্র, তন্ত্রসার, এ সবে এই বিংশশতকে লেখা সুরু হইয়াছে। অনেক কাটাকুটি হইবে, অনেক কিছু লিখিতে মুছিতে হইবে। সবে ত' কলির সন্ধ্যে। ভূতের যন্ত্রের প্রশ্ন—এটমের অন্দরে ও সদরে যাহারা রহিয়াছে, তাহারা পরস্পরের "জন্য", পরস্পরের তরে কেমনভাবে সাজিয়া রহিয়াছে (configuration), আর তাদের চলাফেরাই বা কি রকম পথে, কি রকম কায়দায় হইতেছে? যে পাক খায় সে কি সোজাসুজি গোল পথেই পাক খায়? না, সে গোলেও কিছু গোল আছে? বৃত্ত না বৃত্তাভাস (Ellipse), না আরও জটিল কুটিল? গ্রহদের কল্পিত অভিসার-পথে ভাগ্যে জটিলা-কুটিলা কাঁটা দিয়া ছিল, তাই না দুই দুইটা জলজীয়ন্ত ফেরারি গ্রহ শেষকালে বামালশুদ্ধ ধরা পড়িয়া গেল! আদাম্‌স্‌ ও লাভোয়াসিয়ার অনেকদিন আগে এক ফেরারিকে পাকড়াও করিয়াছিলেন; প্রথমে আঁকের খাতায়, তারপর দূরবীণে। সেদিনও আর এক ফেরারি গ্রেপ্তার হইল। এরা সকলেই সৌরগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ফেরারি আসামী। বহুদূরে আসমানে পলাতক হইয়াছিল। যাক্—অণুর জগতেও বোধকরি জটিলা-কুটিলা অভিসার পথে কাঁটা দেবার জন্যে আছেন। খোঁজ পরে লইব। এই গেল ভূতের মন্ত্র ও যন্ত্রের কথা। আর ভূতের তন্ত্র হইতেছে—কোনও দিকে, লক্ষ্যে মন্ত্র-যন্ত্রের বিনিয়োগ। বিনিয়োগ বলিতে অধ্যক্ষতা (control) বুঝায়। কোন কিছু নিয়ামক (controlling Principle) মানিতে হয়। সেই নিয়ামকই ভূতের ভূতেশ্বর, ভূতের আত্মা; ভূতের ঈরিতা। ইনি গুহাশয়, নিগূঢ়, গুহ্যাদপি গুহ্য। ইনি দহর-ব্রহ্ম—Infinitesimal Space Timeএর মন্দিরেও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বিজ্ঞান ভূতচক্রের অর, নেমি হাতড়াইয়া মরিতেছে। এখনও নাভির তল্লাস পায় নাই। কবে পাবে জানি না। নাভিতে যে তত্ত্বটি রহিয়াছেন, তিনিই ভূতের অথবা পশুর পতি, ঈরিতা, যজমান হোতা। পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ। তিনিই "হংস" —বেদ "হংসঃ শুচিষদ্ বসুঃ" মন্ত্রে যাঁকে বিশ্বভুবনে ওতপ্রোত দেখিয়াছে। এই হংসহোমেরই পরিচয় আমরা রেডিও-একটিভিটিতে পাই, আলফা, বিটা, গামা-রেজ রূপ তিনটি জিহ্বা তাঁর লেলিহান দেখি। এই হংসহোমেই ভূতের জন্ম, জরা, মরণের চক্র বা সাইক্‌ল্ চলিতেছে। ভূতের তন্ত্র বড়ই গুহ্যাদপি গুহ্য তন্ত্র। তুড়ি দিয়া বোঝার নয়, বোঝাবার নয়। এখানে বিজ্ঞান অণুর দেশে (শুধু কি সেখানেই?) কতকগুলো "খাজা খবর" ("brute fact" বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ভাষায়) পাইয়া হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছেন। এগুলো মানুষের বোধশোধের বাহিরে—Ultra-rational না irrational? শুধু কোন্‌টাম নয়, অনেক কিছুই। অনেকের চমক ভাঙ্গিতেছে। এডিংটন রিলেটিভিটির একজন পাণ্ডা। তিনি বলিতেছেন—প্রকৃতির যেগুলো "প্রকৃত" ধারা, সেগুলো আমাদের বোধশোধের বাইরে হওয়াই স্বাভাবিক। যে সব ধারা (Laws)

আমরা বুঝি সুঝি, সেগুলো আমাদেরই চাপান, সাজান অধ্যাস কি না কে বলিবে? আমরা সাগরের জল লইয়া ঘটিতে বাটিতে ঢালা-উবুর করিতেছি; আর ভাবিতেছি, জলের ঘটির আকার, বাটির আকার। তার সত্যিকার আকার কি? ঋষিরা অনেক ঠেকিয়া শিখিয়া "অনির্বচনীয়" বলিতেন। কোয়ানটাম্ (পরে এর কথা বলিব) অনির্বচনীয়। অনির্বচনীয় বলিয়াই "প্রকৃত"। আমাদিগকে "অবাক" করিতেছে বলিয়াই সত্যসন্দেশ! সত্যসন্দেশ মুখে পাইলে আর কি বাক্ সরে?

এইবার আসল রাস্তা ধরার উপক্রম হইবে কি? না, আবার বে-মক্কা ঠোক ধরিবে? যে গল্পটা গোড়ায় পাড়িয়াছিলাম সেটা শেষ করি। এক অসুর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া বর পাইল—যার মাথায় সে হাত দিবে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া যাইবে। এটি ভস্মাসুর। ভস্মলোচন এরই মাসতুত ভাই। বর পেয়েই যিনি বরদাতা তাঁর মাথাতেই প্রথম বরের সত্যতা পরখ করিতে ইচ্ছা করিল। শিবের মাথায় হাত দেয় আর কি! শিব তখন পালাবার পথ পান না। শিব পালাইতেছেন, আর ভস্মাসুর হাত বাড়াইয়া পিছু পিছু ধাওয়া করিতেছে। এই ধরি ধরি! শিব ত্রিভুবনে দৌড়িয়া কোথাও আশ্রয় পাইলেন না; ব্রহ্মলোকেও না। ব্রহ্মারও ভয় পাছে দৈত্য বেটা গুণিতে ভুল করিয়া মোটে চারিটা আননের মালিককেই খোদ পঞ্চানন ভাবিয়া বসে! শেষকালে গলদঘর্ম দিগম্বর ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে গোলোকে গিয়া উপস্থিত। গোলোকপতি গোলোকে গো-গোপ-গোপী লইয়া বসবাস করেন বটে, কিন্তু বুদ্ধিটা তার অপ্রাপ্ত-ষষ্টিবর্ষ যাদবের বুদ্ধি নয়। তিনি ব্যাপারখানা বুঝিয়া এক চমৎকার ফাঁক্ বাহির করিলেন। বলিলেন—"আচ্ছা, বৎস অসুর! তুমি বরটি তোমার পরের মাথায় পরখ করার জন্য ছুটিয়া হয়রাণ হইতেছ কেন? আহা, ত্রিভুবনে ঘোড়দৌড় করিয়া হাঁফাইয়া পড়িয়াছ যে! একটু জিরাইয়া লও। ভাল কথা,—নিজের মাথাটা ত' সঙ্গেই রহিয়াছে, তাতেই পরখ করিয়া দেখ না কেন, বরটি সত্য কি মিথ্যা।" অসুর ভাবিল—"তাই ত', ভুল হইয়াছে, এতক্ষণ মিছে হয়রাণ হইয়াছি!" বলা বাহুল্য, সেই নিজের মাথায় হাত ঠেকাইল, আর ভস্মত্ব পাইল। শিবও ছুটি পাইলেন। আবার জটা বাঁধিলেন; বাঘছাল পরিলেন। ভাঙের ঘটিতে চুমুক মারিলেন। ভাঙেই ত' যত ভুল! না ভুলিলে যে, শিবের শিবত্ব, ভোলানাথের ভোলানাথত্বই হয় না।

বিজ্ঞানও শিবের তপস্যা করিয়াছে। সত্য, শিব, সুন্দরকে সেও খুঁজিয়াছে, খুঁজিতেছে, সন্দেহ নাই। শেষ পর্যন্ত, খোজার বস্তু আর আছেই বা কি? কিন্তু সেই অবুঝ আব্দেরে নাতিটি তার ঘাড়ে চড়িয়া আছেন। অহমিকা। এটি বোকা সেয়ানা, ভোলানন্দ নহেন। এ ঘাড়ের ভূতটি ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে নাই সে। তাই এমন বর তার মিলিয়াছে, যাতে, যা কিছুতে সে হাত দিতেছে, তাই জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যাইতেছে। খোদ শিব—জ্ঞানমূর্তি, কল্যাণমূর্তি যিনি—পলাইয়া বেড়াইতেছেন।

"বিরোচনী" বিদ্যা তাঁর মাথাতেই হাত দেবার বায়না ধরিয়াছে যে! অণুর অন্দরে পলাইতেছেন, লুকাইতেছেন, সেখানেও ধাওয়া ছায়াপথের ও-পিঠে (Galactical System-এর বাইরে) "island universes" গুলোতে পলাইতেছেন, সেখানেও প্রায় ধর'-ধর'। দৈত্যগুরুর ধন্য ওস্তাদী বটে! তিনি যত বড় হন, সেও তত বড় হয়, তিনি যত ছোট হন, সেও তত ছোট হয়। আলোর বেগে, তড়িতের বেগে ছোটেন, সেও তাতে পেছ-পা নয়। বিজ্ঞানের সিদ্ধি তারিফ করিতেই হইবে। এ সিদ্ধির অতিবৃদ্ধি কিন্তু স্বল্প ঋদ্ধি।

কিন্তু যেটা ভুবনস্থ নাভিঃ—ছোটতেই হোক আর বড়তেই হোক, সচলের সম্পর্কেই হোক আর অচলের সম্পর্কেই হোক—সেটা বিজ্ঞান এখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। নেমি, আর—এই সব নিয়াই সে ফাঁপরে পড়িয়া আছে। ও যে গোলকধাঁধার ঘুরপাক! তার নিউক্লিয়াস, সেণ্টার, পয়েণ্ট—এসব কেহই নাভি নয়। নাভি স্পর্শ করার হদিশ সে এখনও শেখে নাই। নাভির দুয়ারে যাইয়া তবে শিখিবে। ভুবনের নাভি গোলক —সে নাভিতে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা, প্রজাপতি পদ্মনাভের সমুদ্ভব। সেখানে আসিলে তাহার নিজের মাথাতেই হাত দিতে হইবে। তার ঘাড়ে যে আব্দেরে "নাতিটি" চাপিয়া সব ভস্ম করার বায়না ধরিয়াছে, সে নিজেই ভস্ম হইবে। তখন শিব হবেন নিরুদ্বেগ, শান্ত, স্বস্থ। তখন ভস্মাসুরের মুক্তাত্মা, ভস্মবিভূতিভূষণ যিনি, সেই শিবের তাদাত্ম্যই লাভ করিবে। "বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায় ত্রিবেদীদিব্যচক্ষুষে। শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি নিমিত্তায় নমঃ সোমার্ধ-ধারিণে॥" এখন বিজ্ঞানের যা কিছু জ্ঞান, তা "প্রাকৃত" জ্ঞান,—প্রকৃত, বিশুদ্ধ জ্ঞান নয়—প্রজ্ঞান নয়। যেটাকে এখন সত্য (Truth) বলিতেছি, বিধি (Law) বলিতেছি, সেটা সেই দিদিমণির দুহিতা ও দৌহিত্রের কারিগুরি, কারসাজি যেটা অনির্বচনীয়, অবাঙ্‌মনসগোচর, সেটা ঐ ত্রিমূর্তি ভেল্কিপ্রসাদাৎ খাসা ধোপদুরস্ত হইয়া আমাদের কারবারে খাটিতেছে। বিজ্ঞানের জগৎ এই হিসাবে—কারবারি (Pragmatic Conventional) নিজের মাথায় হাত দিয়া, নিজেকে "ফুঁকিয়া" দিয়া, তবে সত্যকে সত্য সত্য স্পর্শ করিবে সে। আমাদের চলতি কারবারের হিসাবে সে সত্য হয়ত' ভস্মই। আমরা ভস্মকে ভাবি "ছাই", উপনিষৎ কিন্তু ভাবিয়াছেন—সারের সার।

ভস্মলোচন

ভস্মাসুরের গল্পে কিছু কিছু হেঁয়ালি রহিয়া গিয়াছে। ভস্মাসুরের মাসতুত ভাই ভস্মলোচন আসিয়া সে হেঁয়ালি আমাদের খোলসা করিয়া দিবে কি? ভস্মাসুরের স্পর্শে ভস্ম; ভস্মলোচনের দৃষ্টিতেই ভস্ম। কাজেই ভস্মলোচনের কেরামতী বেশী। ভস্মাসুরকে শিবের পিছু পিছু বিশ্বভুবন ধাওয়া করিতে হইয়াছিল। ভস্মলোচনকে ছুটিয়া মরিতে হয় না, সে দৃষ্টিপাত করিলেই সব ভস্ম। রাম-রাবণের যুদ্ধে একে আমরা দেখিয়াছিলাম না? চোখে ঠুলি পরিয়া থাকিত। রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া রাম-বাহিনীর অভিমুখে দাঁড়াইয়া চোখের ঠুলিটি খুলিলে কারুরই রক্ষা পাবার ত' কথা নয়! সেবার শিব পড়িয়াছিলেন ফাঁপড়ে, এবার শ্রীরাম। গোড়ার তত্ত্ব একই। বিভীষণের উপদেশে দর্পণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া রাম রক্ষা পাইলেন—দর্পণে নিজেরই মুখ দেখিয়া রাক্ষস নিজেই ভস্মত্ব পাইল। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনেক রকমে লাগসই হইতে পারে। আছেও অনেক রকম। অধ্যাত্মরামায়ণ ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ত' স্থূল ব্যাপারটাকে আগাগোড়া সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম করিয়া দেখা। গীতা বলিয়াছেন—"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্॥" সেই যে "বহুশাখা", "অনন্তা" বুদ্ধি বা মতি—তাকেই কি দশস্কন্ধ রাবণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে? মতিকে পুংলিঙ্গ করিয়া মনন বা মন বলা যাক্। অবশ্য বুদ্ধি, মন—এ সব আমরা দার্শনিকের পরিভাষা-মাফিক প্রয়োগ করিতেছি না এখন। তা হইলে, এক রকম মনন বা বিচার হইতেছে—বহুশাখ, অনন্ত। আর, এই মনন বা বিচারের এক সোদর হইতেছে ব্যবসায়াত্মক বিচার—যেটা একনিষ্ঠ, একই। সে বিচার নিখিল ভেদবৈচিত্র্যের মধ্যে একেরই অন্বেষণ করে—"সর্বভূতস্থমেকং বৈ নারায়ণং কারণপুরুষমকারণং পরং ব্রহ্ম"। এই সহোদরটি বিভীষণ। ইনি রামকেই আশ্রয় করেন। রামকে আশ্রয় করেন বলিয়া এঁর ভূতের ভয় পলায়। ভূতের ভয় মৃত্যু—ভূত মাত্রেই মরিতেছে, মরিবে। বিভীষণ অমর। মনন বা মন আরও এক কিসিমের আছে—জড়। ঘুমাইয়াই কাটায়। এটি কুম্ভকর্ণ—আর এক সহোদর। যোগসূত্রে ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, মূঢ়, একাগ্র, নিরুদ্ধ—এই পাঁচ রকম চিত্তের অবস্থার কথা আছে। তার মধ্যে ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত রজঃপ্রধান। মূঢ় তমঃপ্রধান। একাগ্র—যুঞ্জান; আর নিরুদ্ধ-যুক্ত। তার মধ্যে একাগ্র-যুঞ্জান—সত্ত্বপ্রধান। নিরুদ্ধ বা যুক্ত অবস্থায় নির্বিকল্পভাব, কাজেই গুণাতীত, উন্মনী দশা। এই গেল তিনটি ভায়ের সাটে পরিচয়।

ভস্মলোচনকে অভিমান ভাবিলে মন্দ হয় না। উপনিষৎ বলিয়াছেন—পরাঞ্চি

খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুঃ” ইত্যাদি। বিধাতা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামকে আর ইন্দ্রিয়গ্রামের রাজা অভিমানকে “পরাঙমুখ” বা বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বহির্মুখ অভিমান ও ইন্দ্রিয়গ্রামের সংস্পর্শে সবই ভস্ম হইতেছে। “ভস্ম” হইতেছে মানে—আর কিছুতে বিভক্ত ও রূপান্তরিত হইতেছে,—resolve and redistributed into something else শুনিয়া বিস্মিত হইবেন না। শুধু আমাদের কর্মেন্দ্রিয়গুলো নয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোও এই যজ্ঞ, এই হোম নিত্য করিতেছে। চোখ, কান-এরা যে শুধু দেখে আর শোনে, এমন নয়। এরা এক “পোড়ায়”, আর কিছু “রানায়”। অথবা এরা এক একটা ছাঁচ—এরা কাদা ভাঙ্গিয়া, ছানিয়া আপন ছাঁচে ঢালাই করিয়া লয়। প্রাচীন ও অর্বাচীন বাস্তবতাবাদী (Realist) বা যাই বলুন, এটা ঠিক যে, আমাদের দেখা-শোনা ইত্যাদি সবই “কাঁচামাল”গুলো গড়িয়া পিটিয়ে লওয়া। বাহিরের “মাল”কে আগে কাঁচিয়া লইতে হয়। একই কাদার তালে কেউ শিব গড়ে, কেউ বা বাঁদর গড়ে। আমাদের জঠরাগ্নিকে নিত্য এই কাজ করিতে হইতেছে। অন্ন “পচন” করিতে হয়। পচন মানে ‘পোড়ান’। তারপর হজম। ফুস্‌ফুস্‌ যে বাতাস টানিয়া লইতেছে, তার দেহের রস-রক্তাদি ধাতুর “পচন” (Oxidation) হইতেছে। এটি আবশ্যক। শাস্ত্র দেখা-শোনা ইত্যাদিকেও “আহার” বলিয়াছেন। ঠিকই বলিয়াছেন। শুধু বাহির হইতে আহরণ বলিয়া আহার নয়। পাক বা পচন অর্থেও আহার। “ভস্ম” এই প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত একটা কিছু (product of metabolic combustion)। প্রশ্বাসে যে কার্বণ-ডাইঅক্সাইড্‌ বেরোয়, শরীর থেকে যে মল নানা ভাবে নির্গত হয়,—তারা এই ভস্মের সামিল। এটা অবশ্য ভস্মের একটা খুব সঙ্কীর্ণ অর্থ। আসল মানে পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

যাহা হউক, আমাদের ভিতরে একজন কেউ এই ভস্মলীলা করিতেছে সে আর তার চরেরা বহির্মুখ। “বহি” আর “অন্তর” কথা দুটাকে তলাইয়া দেখিবেন। আমরা এই স্থূল দেহের বাহিরে সব কিছু বাহ্য মনে করি। ও বাহ্য বড়ই “বাহ্য”। আরও আগাইয়া চল। মনের বাহিরে যা কিছু, তাই কি বাহ্য? বটে, কিন্তু “এহ বাহ্য আগে কহ আর”। আসলে, যেটা স্বরূপ, যার আত্মা, সেইটা তার "অন্তর"। আর, তাই যেটা নয়, সেটা তার “বহি” বা বাহ্য। এই মানে স্মরণ রাখিতে হইবে। নৈলে, ইন্দ্রিয়গ্রাম বহির্মুখ না হয় হইল, কিন্তু অভিমান বহির্মুখ—এ কথাটার মানে বোঝা যায় না। অভিমান বহির্মুখ—মানে সে তার নিজের যেটা স্বরূপ, তাতে দৃষ্টি করে না। সব তাতেই তার দৃষ্টি আছে, শুধু নিজের নিজত্বে তার দৃষ্টি নেই। নিজের বা আত্মীয় সম্বন্ধে তার চোখে ঠুলি। পরকীয়, অর্থাৎ স্ব-স্বরূপাতিরিক্ত সম্বন্ধে তার চোখে ঠুলি নেই। সবই ভস্ম, কি না resolve করিতেছে সে। তার হাতিয়ার ইন্দ্রিয়গ্রাম, সংস্কার ইত্যাদি। দর্পণশাস্ত্র বলিতেছে আত্মবিবেক—স্ব-স্বরূপ-

বোধ ("স্ব"টাকে দু'বার বলিলাম)। যাতে করে নিজেকে নিজে দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিতে গেলেই "নিজেকে"—অভিমানকে ভস্ম হইতে হয়।

এই গেল এক রকম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এই রকমের একটা কিছু "মনসি নিধায়" ঐ গল্প রচিত হয় নাই? না, ওসব নির্জলা, গাঁজাখুরি, ছেলে ভুলান গল্প? সেকেলে বুড়ারাও না কি "ছেলে" ছিল, তাই তাদের সব কাজেও ছেলেমি, গল্পেও ছেলেমি! আগষ্ট কোঁৎএর সেই মামুলি লেবেলগুলো এই বিংশ শতকে এখনও বাতিল হয় নাই? আগে, মাইথোলজিক্যাল্, তারপর থিওলোজিক্যাল, তারপর মেটাফিজিক্যাল্, সর্বশেষে "পজিটিভ"! সেই ভস্মলোচনী কাণ্ড-কারখানা। এই বিজ্ঞান যুগের অভিমান ভস্মলোচনের মতন আপন অন্তর চোখটিতে খাসা ঠুলি আটিয়া রহিয়াছে দেখিতেছি। বাহিরের চোখ মেলিয়া যা কিছু দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাই "ছাই ভস্ম" হইয়া যাইতেছে। ভারতের বেদ তাই "চাষার গান", ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ (স্বয়ং ম্যাক্স্‌মুলারেরই ভাষায়)—"theological toraddle" অর্থাৎ ছাই-ভস্ম।

ভস্মলোচন যাঁরই রথে অধিষ্ঠান হইয়াছেন, তিনিই স্বরূপে, কি না আপনার সম্বন্ধে, চোখে ঠুলি পরিয়াছেন। পরের বেলায় তিনি শুধু যে ভস্মলোচন এমন নয়, সহস্রলোচন। স্বয়ং হয়ত চালুনি, নিজের সহস্র ছিদ্রে দৃষ্টি নেই; ছুঁচের মার্গে একটি ছিদ্র অন্বেষণেই তৎপর! ইনি যে ধর্মের ঘাড়ে চাপিয়াছেন, সে ভাবিয়াছে ও বড় গলা করিয়া বলিয়াছে—আমিই সকল ধর্মের সেরা, পরধর্মে জাহান্নম। ফলে, সংসারে, মৈত্রী সদ্ভাব পুড়ে ভস্ম হইয়া যায়; ভাই ভায়ের ঘর ছারখার করিয়া দেয়। কোন বিদ্যা বা কাল্‌চারের ঘাড়ে চাপিলেও তাই। গ্রীক্‌রা "বর্বর" বলিত; আর কেউ বা "অনার্য" বলিত। এখন আমরা পুরাকালের সব কিছু "মিডিভ্যাল্", লোয়ার", "প্রিমিটিভ" বলিতেছি। আমাদের গতি সব "প্রগতি"। বাকি সব বকেয়া, বাতিল। অর্থাৎ হালের বিদ্যা ভস্মলোচন হইয়া "আপনার বেলায় চোখে ঠুলি দিয়াছে, পরের যা কিছু সবই নস্যাৎ, তুচ্ছ, ছাইভস্ম করিয়া দিতেছে। খোদ বিজ্ঞান খুব চোখোল বলিয়া নিজের বড়াই করিয়া আসিতেছে। সত্যিই, একটা বালখিল্য পতঙ্গ ধরিয়া তার অঙ্গে শুধু নবদ্বার কেন, নবনবতি কোটি নিরানব্বুই লক্ষ নিরানব্বুই হাজার নশ' নিরানব্বুইটি "দ্বার" সে দাগিয়া দিয়াছে। হাজার দুয়ারী ত নিতান্ত ছোট-লোকেরও ঘর! আমীর লোকের দাওলাৎখানা লক্ষ দুয়ারী! মলিকিউলের নক্সা, এটমের নক্সা—এ সবই তো আঁকিয়া ফেলিয়াছে। সবই "ভস্মপুরী"—সাতমহলই হোক্ আর সাতসাতে উনপঞ্চাশ মহলই হোক্। সর্বত্রই কেউ "পুড়িতেছে"—পুড়িয়া আর কিছু হইতেছে। কোথাও নাম মেটাবলিজিম্, কোথাও কম্বাস্‌চান্, কোথাও বা এটমিক ডিস্‌রাপ্‌শান্ ইত্যাদি। আমাদের লক্ষণ মত সবই ভস্ম। পরে লক্ষণটি আরও খোলসা করিব। যাই হোক্—বিজ্ঞান এতদিন "সত্যং সত্যং বদাম্যহং" হলফ করিয়া এই

বিশ্বভুবনের ওতপ্রোত যজ্ঞের ভস্মই ঘাঁটিতেছে। যজ্ঞ তিলকের হুঁস্ নেই। চোখে ছাই উড়িয়া না পড়িতেছে এমন নয়। সময় সময় চোখ রগড়াইয়া চোখ লালও করিতেছে দেখি। ছাই এর গাদায় ফুঁ মারলে তা ত' হবারই কথা। আজকের পাকা দেখা কাল কাঁচিয়া যাইতেছে—কল্পনা জল্পনার সামিল হইয়া পড়িতেছে; আজকের লজ্জাশীলা কল্পনা জল্পনা বধূটি কাল খাসা বাস্তবী গিন্নীবান্নী হইয়া ঘর পাতিতেছেন। এ ত' হামেশাই দেখিতেছি। কিন্তু, বিজ্ঞান আপনার বেলায়? ঠুলি সেখানে বেজায় শক্ত করিয়া আঁটা। তবু সময় সময় ফাঁকও হইয়া পড়ে। তখন বিজ্ঞান নিজেই ভস্ম হইয়া উড়িয়া যাইবার উপক্রম করে। বিজ্ঞানের আয়তন হইয়া পড়ে একটা অপরূপ বিচিত্র "মায়াপুরী"—A universe of Convention। কতকগুলো সংজ্ঞা ও পরিভাষার বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গণিতের বনমানুষের হাড় ছোঁয়াইয়া বিজ্ঞান যাদুকরী এক অপূর্ব বিরাট ভেল্কি পায়দা করিয়াছে। ইকোয়েশন ও ফরমূলা এই দুই রাক্ষস-রাক্ষসী সেখায় বাস করে। বলিহারি! ময়দানবী কাণ্ড! ভেল্কির পাল্লায় পড়িলে কে বুঝিবে যে এটা ভেল্কি। নিউটনের "কনভেনশন্" দু' আড়াই শতাব্দী ধরিয়া খাসা চলিল। এখন আইনষ্টাইন সে নিউটনী কন্‌ভেন্‌শনে ভুল ধরিয়া শোধন করিতেছেন। একদিকে মামুলি (traditional) হংস বিস্তার (dynamicsএর) এই শোধিত সংস্করণ(amended edition); অন্য দিকে দহর সূক্ষ্ম আকাশে সদ্যঃ আবির্ভূত রহস্যবপু কোয়ানটম ডাইনামিক্স। এই দো-টানায় পড়িয়া বিজ্ঞানের "সত্যসন্ধি" গুলি জরাসন্ধ বধরূপ হইতে বসিয়াছে যে, সেই সেদিন এডিংটনের তত্ত্বকথা ত শুনিয়াছিলাম—প্রকৃতির ধারায় যেটা বুঝি না, সেটা বোঝার না, অর্থাৎ যেটা অনির্বাচ্য, সেইটাই ত প্রকৃত প্রকৃতিনিষ্ঠ; আর যেটা বুঝিয়া হিসাব করিয়া ফেলিয়াছি ও ফেলিতেছি, সেটা বুদ্ধিগড়া, মনগড়া, সুতরাং কৃত্রিম, অধ্যস্ত, আরোপিত। সোজা কথায়, বিজ্ঞান নিজের চোখের ঠুলিটি খুলিয়া নিজেকে উড়াইয়া ভস্ম করিয়া দেবার কথাও ভাবিতেছে।

তবে নিজের সম্বন্ধে এই চোখের ঠুলি খোলার দেরী হবে। কত দেরী কে জানে? ঠুলি খসিয়া পড়িলে তাকে ক্যাভেণ্ডিশ্ ল্যাবরেটারি ছাড়িয়া নৈমিষারণ্যে আসিয়া বসতে হইবে না ত? সে দূরের কথা। ততদিন ক্যাভেণ্ডিশ্ ল্যাবরেটারি চোখে ঠুলি আঁটিয়া নৈমিষারণ্যে টম্‌গুলোতে "ছাই" এর গাদা দেখিতে থাকুন। ম্যাজিক ছাইয়ের গাদা, মাইথোলোজি ছাই এর গাদা ইত্যাদি। ২৫।৫০ হাজার বছর আগেকার "বুনো" বা গুহাবাসী জটাবল্কলধারী, এমন কি পাণিপাত্র দিগম্বর ছিল। আগুন জ্বালিতে হয়ত শিখিয়াছিল, কিন্তু পাথুরে হাতিয়ার ছাড়া আর কোন রণসম্ভার জানিত না। অথচ ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশের গুহাগাত্রে কি অপূর্ব চিত্র-শিল্পনৈপুণ্য এইসব জানোয়াররা "বিচিত্র" বর্ণসম্পদে মণ্ডিত করিয়া অজর অক্ষর করিয়া রাখিয়াছে; বুনোর কীর্তি বলিয়া শুধু মুরুব্বিয়ানা তারিফ করিলে চলিবে না।

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পের সঙ্গে কোন কোন অংশে সেটা তুলনীয়। আর সেটা সখের জিনিব ছিল না। আমাদের অতর্কিত কোন একটা ধর্মানুষ্ঠানের (যেটা আমরা এখন ম্যাজিক বলিতেছি) অচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল সেটা। যাদের এটা কীর্তি, তারা কি সত্য সত্যই "বর্বর" ছিল? গুহাবাসী, পাণিপাত্র, দিগম্বর, "যজমান" হইলে কি সরাসরি বর্বর হওয়া যায়? সে বর্বরতা কি আর এক রকমের সভ্যতা নয়? যার মর্মোদ্‌ঘাটনের চাবিকাঠিটি আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না, আমাদের হালফ্যাসানি বৈঠকখানার নম্বরি ড্রয়ারগুলোতে? যাক বিজ্ঞানের কথা আবার পাড়িব। এখন আমরা দেখিতেছি যে—বিজ্ঞানের গোড়ামিই যে সব চাইতে মারাত্মক, গোঁয়ার গোঁড়ামি এমন নয়; বিজ্ঞানের অজ্ঞতাও সব চাইতে মারাত্মক, আকাট্ অজ্ঞতা বিজ্ঞান পরের বেলায় বিজ্ঞ; নিজের বেলায় আনাড়ি অজ্ঞ। নিজের নাড়ীটাই সে জানে না। জানিলে ভস্ম হইয়া যাইত। রাজনীতি, অর্থনীতি—এসব ক্ষেত্রেও ভস্মলোচনের অভাব নেই। ডিমোক্রেসী দিন কতক জয়ডঙ্কা বাজাইল। এমনটি আর হয় না, হবার না। মানুষ মুক্তির কাছা চাপিয়া ধরে আর কি এখন ডেমোক্রেসী বিশ বাঁও জলে। অবশ্য এখনও কেউ কেউ জয়ঢাকে বাঁওয়া বাজাইতে ছাড়েন নাই। ওটা নাকি মাৎ হইয়া গিয়াছে—It is a failure. অবশ্য ডিমোক্রেসীর প্রেতটির এখনও "গতি" হয় নাই সে "জবরদস্তিজম" এর (অর্থাৎ Dictatership এর) মুখোস পরিয়া তাণ্ডব নাচ নাচিতেছে। রাশিয়ায় লেনিন, ষ্টালিন, ইতালিতে মুসোলিনি, জার্মানিতে হিটলার এমন কি "অতি প্রগত" মার্কিনেও রুজভেল্ট। এরা সবাই ডিমোক্রেসীর আত্মশ্রাদ্ধ করিতে বসেন নাই? মুখে আওড়ানো মন্ত্রগুলি শুনিয়া ভুলিবেন না স্বস্তিকের লাঞ্ছন পতাকায়, মুখে "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ"। স্বস্তিকের লাঞ্ছন রক্তের লাঞ্ছন হইতে কত ক্ষণ, "শান্তিঃ শান্তিঃ" তাথৈ তাণ্ডব নৃত্যের "বব ববম্ বব ববম" হইতে কত দেরী? জগৎ উৎকণ্ঠায় থরহরি কম্পমান। কেন না ১৯১৪-১৮ তে ভুশুণ্ডীকাক ঊর্ধ্বচঞ্চু হইয়া রক্তপান করিয়াছিল, এবার সে ভস্মপান করিবে। ভাবীর আসমানী যুদ্ধে পৃথিবীটা যাতে চন্দ্রলোকের মত হাওয়া জল শূন্য নিরবচ্ছিন্ন আগ্নেয় ভস্মাচ্ছাদিত বপু হইতে পারে, এমন বন্দোবস্ত পার্থিব পুরুষেরা আদা-জল খাইয়া করিতে বসিয়াছেন। অর্থাৎ সশরীরে, সজ্ঞানে পৈত্রিক প্রাণটা ট্যাঁকে করিয়াও কেহ অত্র বসবাসের ইজারা পাইবেন না। "সর্বং ভস্মনে স্বাহা" যজ্ঞ বসিয়াছে সকলে আহুতি দেও।

সমাজনীতি, অর্থনীতি ক্ষেত্রেও হাল তথৈবচ। বলশেভিজম্ ফ্যাসিজম্ এ সব পুরানো বিধি ব্যবস্থাগুলোকে ইন্ধন করিয়া এক এক মহাযজ্ঞের সুরু করিয়া দিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যজ্ঞ "মহামারী" যজ্ঞও হইতেছে। অনেক কিছু ভস্ম হইয়া যাইতেছে ভস্মবিভূতি মাখিয়া যে নবীন তার লেলিহান শিখাগুলোর ভিতর হইতে উত্থিত

হইতেছেন। তার রুদ্রনেত্র ও বজ্রদংষ্ট্রাই এখন আমরা দেখিতেছি। জানি না তিনি শিব কি দানব রুদ্রের নেত্রাগ্নিতে মদনভস্ম হইয়াছিল, দিব্যসিংহের বজ্রাধিক নখস্পর্শে হিরণ্যকশিপুর স্ফীতোদর বিদীর্ণ হইয়াছিল। বর্তমান আবির্ভাবটি কি মদন (Last of Domination) আর হিরণ্য (Power of Gold, Capitalism) এ দুয়ের সংহারের জন্যই আপন স্বরূপে চোখ মেলিয়া যেদিন ইনি চাহিবেন, সেদিন ইনি নিজেই ভস্ম হইবেন না ত? কে জানে বাপু, রকম বেগতিক।

ভস্মলোচনকে নানান মূর্তিতে আমরা দেখিতেছি। আমাদের নিজেদের নিজেদের ভেতরেই ইনি রথে অধিষ্ঠান করিতেছেন। এইখানে এর সত্য-মূর্তি। বাইরে ও সব ছায়ামূর্তি, সঙ্ঘাতমূর্তি। ভেতরে না থাকিলে বাইরেও নাই ভেতরের projection বাইরে। ভেতরে ঐ তত্ত্বটি রহিয়াছে বলিয়া যা কিছু "আমি" দেখিতেছি "ঈক্ষ" করিতেছি, ভাঙাগড়া করিতেছি। মনন, ঈক্ষণ, কল্পনা এ সবের মানেই তাই। "আমি" যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ এ কাজ করিতেই হইবে। বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্ররূপে "আমি" এই কাজটি করিতেছেন। তোমার আমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও সেই কাজেরই অল্প-স্বল্প রিহার্সাল চলিতেছে। প্রকৃতির "সামাম্যক্ষোভে" মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি; কিন্তু অহঙ্কারতত্ত্বে না আসা পর্যন্ত (একটা Centre of Reference) ঠিক ঠিক সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কাজ সুরু হয় না। তিনটে আলাদা করিয়া বলিতেছি, কিন্তু তিনেই এক একেই তিন। অর্থাৎ, রুদ্র সংহার করেন বলিয়া তাঁর জন্য "ছাই" ব্যবস্থা করিয়াছি বটে, কিন্তু সবই ছাই, সবই ভস্ম। হাঁ উপনিষৎ একথা বলিয়াছেন। ভস্মের মূল লক্ষণ স্মরণ করিবেন। সেটা আরও ভাল করিয়া বোঝার চেষ্টা আমরা করিব। গুরুরূপী রাম দর্পণাস্ত্র (অর্থাৎ আত্মবিবেক) মারিয়া আমার "আমি"কে দেখাইয়া দেন। "তত্ত্বমসি" ভাবেই হোক, আর "নিত্য কৃষ্ণদাস" ভাবেই হোক। উভয়থা, তার ভেতর ঝুটা যেটি, প্রাকৃত যেটা, সেটা ভস্ম হইয়া যায়। তার ব্যবহারিক বন্ধন-("পশুপাশ") গুলো মায়ার পাশ resolved ("ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি) হইয়া যায়। সেই ক্ষয়ই ভস্মত্ব। যে "আমি" "হংস" রূপে নিত্য "অন্তর্বহির্খেলায়তে," তাকে "সোঽহং" রূপে দেখাই দর্পণে মুখ দেখা। যে জ্যোতিঃ যাইতেছে, সে আবার ঠিক্‌রাইয়া (reflected হইয়া) ফিরিয়া আসিতেছে। এ কথাটার বিস্তারও পরে করিব।

এইবার ভস্মাসুরের গুপ্ত আড্ডাগুলো একবার তল্লাস করিয়া দেখিব। নানান্ ঠাঁই থেকে ভস্ম কিছু কিছু আহরণ করিয়া আনি। তার পর বুঝিব আসলে সেটা কি চিজ্। একটু আগে বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ড আর ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের কথা হইতেছিল। সাধনরসিকেরা আমাদের বা জীবমাত্রেরই দেহকে অনেক সময় ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া গিয়াছেন। তার কারণ আছে। কিন্তু সে কথা আপাততঃ থাক্। আমরা ভস্মাসুরের গল্পে অণুর ব্রহ্মাণ্ড কটাক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। সেখানে দেখিয়াছি একটা নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রের চারিধারে

এবং তারই আকর্ষণে বিধৃত হইয়া এক বা বহু ইলেক্‌ট্রন (ইউনিট নেগেটিভ্ ইলেক্‌ট্রিক চার্জ) গোলাকার পথে পাক খাইতেছে; পাক খাইতে খাইতে এক গোলাকার পথ হইতে আর এক গোলাকার পথে লাফ মারিতেছে; সময় সময় "ভ্রষ্ট" হইয়া উধাও-ও হইতেছে। কেন্দ্রটাও শান্ত সমাহিত নয়। সেখানেও জটলা। কোন কোনটাতে বা "আগুনের" ফোয়ারা বাহির হইতেছে। হাউইবাজী।

এর পরে আরও একটু স্পষ্ট করিয়া এ বিষয়টি ফোটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিব। আপাততঃ দেখিতেছি যে অণুর জগৎ যে "ব্রহ্মাণ্ড" সে পক্ষে সন্দেহ নেই। অতটুকু জায়গায় স্ত্রীপুরুষে সব গা-ঘেঁষাঘেঁষি রহিয়াছে ভাবিবেন না। আমাদের সৌর-জগতের মতই ঢালাও বন্দোবস্ত। প্রোটন-ইলেকট্রনদের "দেহের" তুলনায় "চরিয়া খাবার" জায়গা প্রচুর। ফাঁকা জায়গা ঢালাও। এ সবের হিসাব আমরা কিছু কিছু পাইতেছি। স্থূলের তুলনায় সূক্ষ্মে বরং বন্দোবস্ত ঢালাও বেশী বেশী। গতি, শক্তি—এসব স্কেলে একটা ইলেকট্রন যে রেটে তার কক্ষে ছোটে, তার সঙ্গে তুলনা করিলে আমাদের ধরিত্রীর শূন্যপথে আবর্তন-গতি পঙ্গুর গতি রেডিয়াম জাতীয় পদার্থের ভেতরে যে শক্তি বা এনারজি স্বতঃ (ঐ ফোয়ারার বা হাউইবাজীর মতন) অভিব্যক্ত হইতেছে, তার সঙ্গে আমাদের পরিচিত কোন শক্তিরই তুলনা হয় না। সমারফেল্ড প্রমুখেরা গণিয়া দেখাইয়াছেন যে, কেমিকাল্ একৃশনে (ধর দহনে) যে শক্তি পুটিত (involved) থাকে তার চাইতে বহু লক্ষগুণ শক্তি রেডিও-একটিভিটিতে সাড়া দেয়। অত শক্তি লইলে খোদ এটমের (অর্থাৎ যেটা সচরাচর বিভাজ্য নয়) ঘর ভাঙে, পোড়ে? সৌরমণ্ডলের ("atmosphere" এর-বায়ুমণ্ডল নয়, মনে রাখিবেন) উত্তাপ কম্‌সে কম ৫।৭ হাজার ডিগ্রী। যত তার কেন্দ্রের দিকে যাওয়া যায়, ততই গরম হু হু করিয়া বাড়িতে থাকে। কেন্দ্রের কাছের উত্তাপ নাকি নিযুতের সংখ্যায় হিসাব করিতে হয়। কোনও কোনও নক্ষত্রে আরও বেশী। সূর্যের বাইরের মণ্ডলে পার্থিব ভূতগুলোর তৈজসবপু (Platinum gas ইত্যাদি) বিদ্যমান। রশ্মি বিশ্লেষণ করিয়া (Solar Spcetrumএ) তা আমরা জানিতে পারি। কিন্তু হিসাবমত সূর্যের ভিতর মহলে যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ছবি দেখিতেছি, তাতে মনে হয়, সেখানে পার্থিব ভূতগুলোর অনেকেই শুধু যে "বায়ুভূত নিরাকার" হইয়া আছেন এমন নয়; অনেকেই চিতায় আরোহণ করিয়া ভস্মত্ব, পঞ্চত্ব পাইয়াছেন। গোটা দুচ্চার "শক্তপ্রাণী" আছেন, তাঁরা অমনধারা ফারনেসে পড়িয়াও অমন আবর্ত ও বোমবার্ডমেন্টের ভেতর রহিয়াও, কায়ক্লেশে টিকিয়া যান। বড় বড় গেরস্তরাই (কমপ্লেক্স এটমগুলো) সব্বার আগে হাবাৎ হন; যাঁদের সাদাসিদে গড়ন-চলন, তাঁরা সহজে বানচাল হন না। সৌরমণ্ডলে ও কোন কোন নক্ষত্রমণ্ডলে এই দহন ও ভস্মীকরণ জোরসে চলিতেছে। বেজায় গরম বলিয়া চলিতেছে। ভেতর-মহলে, কেন্দ্রের কাছাকাছি বেজায় গরমও বটে, বেজায় চাপ (প্রেসার)ও বটে। এখন, এই

যে বিরাট অগ্নিকাণ্ড আর ভস্মলীলা, এটা শুধু যে বিরাটের দেশেই এমন নয়; বালখিল্যের দেশেও বটে। অথচ, বালখিল্যের দেশে শক্তি যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বপু পরিগ্রহ করিয়াছেন এমন নয়। অর্থাৎ, বালখিল্যের দেশে আসিয়া আমরা যেন না ভাবি—এ লিলিপুটিয়ান্‌দের শক্তি-সামর্থ্য, গতিস্থিতি সবই গণ্ডূষজলবিহারী সফরীসদৃশ! তা নয়; তাদের ধরণ ধারণ সব তিমিঙ্গিলতুল্য। মহাতেজাঃ এরা, মহান্‌ এদের উদ্যম, মহতী এদের পরিণতি। তা নইলে এটম্‌ যে এটম্‌, একটা আগ্নেয়গিরির (বৈয়াকরণ দুষিবেন না; কথাটা চলিয়াছে; আর তার বৌৎপত্তিক টিকি ধরিয়া তাকে টানিয়া রাখা গেল না) অগ্নিগর্ভে যে এটম্‌ বিশীর্ণ হয় না, একটা মৈনাক হিমালয়ের চাপে যে এটম্‌ পিষিয়া যায় না, সেই এটমই ফুঁকিয়া ভস্ম হইয়া যাইতেছে, ঐ লিলিপুটের দেশের অগ্নিকাণ্ডে! "অগ্নি" শব্দটাকে লক্ষণায় বড় করিয়া দেখিবেন। যাই হোক্‌—এই বালখিল্য জগৎ যে একটা জগৎ, একটা ব্রহ্মাণ্ড, তাতে আর সন্দেহ কি?

আমাদের এই বিরাট স্থূল জগৎটাকেও (Material Universe টাকে) আমরা ত চিরদিন ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া আসিতেছি। চারুপাঠে "ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড" পড়িয়া ছিলাম। কিন্তু তাকে ব্রহ্মাণ্ড বলিতাম কেন? ব্রহ্মা "অপ্‌সু", কি না কারণ সলিলে বীজ নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন, সেই বীজ হইতে ক্রমে এই অণ্ড (আণ্ডা?) পয়দা হইয়াছে—এই জন্য কি? সলিলে বীজ তা থেকে আণ্ডা; সেই আণ্ডা ক্রমে বড় হইতে লাগিল; তারির ভেতর দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এ সব পরিকল্পিত! এ বৃত্তান্ত পুরাণে শুনি। উদাহরণ স্বরূপ—মনুসংহিতার গোড়াতেই। এখন বর্দ্ধমান খাজা না হয় খাসা জিনিষ, কিন্তু এই বর্দ্ধমান আণ্ডাটি? "ছোট ডিম" বড় ডিম হইতেছেন না হইয়া উপায় কি? ডিমের বড়তে আর তেমন লোভ বর্ণ গুরুদেরও নেই; ডিম ছোটই না কি সরেশ। ভিটামিনও বেশী। ছোটর বংশ কেবল ম্লেচ্ছভূমিতে কেন আর্য্যাবর্ত্তেও নির্বংশ হইতে বসিল। ব্রহ্মাবর্ত্তে খোদ ব্রহ্মলোকেও, বোধ করি এটা বেজায় লোভের সামগ্রী। প্রজাপতি পাছে নিজের প্রসূত ডিম্বটি "ছোট" দেখিয়া নিজেই নির্বংশ করিয়া বসেন, এই ভয়েই ডিম পাড়িয়াই ঝটিতি বাড়িতে লাগিল। বর্দ্ধমান হইল, "ব্রহ্মাণ্ড" হইল। সাবধান তাই বর্দ্ধমান, আর বর্দ্ধমান তাই বিদ্যমান। আচ্ছা, এ সব কি স্রেপ গাঁজাখুরি? নৈমিষারণ্যের সিদ্ধাশ্রমের ধোঁয়াটাকেই এতদিন আমরা গাঁজার ধোঁয়া ভাবিয়া আসিয়াছি। এখন দেখিতেছি, ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটারির ধোঁয়াটাও তাই।

কিছুদিন আগে এমনকি বিশ বছর আগেও, ও দেশের জ্যোতিষী ও জড়তত্ত্ববিদেরা ভাবিতেন—এ বিরাট বিশ্বটা বিরাট, অনন্ত। কোনও একদিকে "নক্ষত্রবেগে" অথবা রশ্মিবেগে (Speed of light) ছুটিয়া চল—কত কত গ্রহ, তারা, নীহারিকার জগৎ ছাড়াইয়া চলিবে; এক ছাড়াইয়া যাইবে, আর কিছু আসিয়া পড়িবে। এই রকম ধারা অফুরন্ত যাত্রা তব। তা হইলে, এ বিশ্ব, এ বিরাট্‌—"ব্রহ্ম" (কিনা,) মহৎ বটে

কিন্তু এটা আর "অণ্ড" মনে করা চলে না। ব্রহ্মাণ্ডের ধারণাটাই আজগবি, ছেলেমি। মাথার উপর রাত্রিকালে এ নক্ষত্র খচিত চন্দ্রাতপটা একটা ডোমের মতন দেখায়। ওটা সেই আণ্ডার ওপরকার খোলা। নীচের আধখানাও তাহা হইলে আছে। এই ভাবে "ব্রহ্মাণ্ডের" কল্পনা হইয়াছিল। ঐ ছায়াপথটাকে ডিম্বের একটা স্পষ্ট "বেড়" রূপই দেখিতেছি না কি? পৃথিবীটা একটা আণ্ডার মত, নিরামিষ মতে (without eggs) কমলালেবুর মতন। গ্রহ, সূর্য; তারা—এরাও প্রায় ঐ আকার। ধূমকেতু, নীহারিকা—এদের ভোল আলাদা। কিন্তু ধরা যাক কোথাও বা আণ্ডা তৈরী হইতেছে, কোথাও বা আণ্ডা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এতটাও না হয় চলিল। কিন্তু সমগ্র বিরাট সম্বন্ধে কোনও একটা আকার কল্পনা করা যায় না। কারণ স্পেস্‌ও অসীম ভুবনও অসীম। ভুবনকে "চতুর্দশ" করা আবার কি? উপরে সাত থাক নীচে সাত থাক্—এ আবার কি? ওটা হয় ছেলেমি, নয় রূপক টুপক একটা কিছু।

কিন্তু একি কথা শুনি আজি গণিতের মুখে, হে নব বিজ্ঞান? বিরাট জড়জগৎ (Universeটা) অসীম নয়, সসীম (finite) খুবই বিরাট তবু সসীম আর এর আকার যে দেশতত্ত্বে বা spaceএ এই বিরাট রহিয়াছে সে স্পেস্ বক্র। বাঁকা তুমি শ্যাম তোমার নয়ন বাঁকা, চরণ বাঁকা, বাঁকা তোমার ঠাম; নাম কামও তোমার বাঁকা সোজা কিছুই নেই। স্পেস্ বাঁকিয়া গিয়াছে এমন নয়, বাঁকিয়া আবার ঘুরিয়া আসিয়াছে অর্থাৎ, সেই আণ্ডা; "ব্রহ্মাণ্ড" বলিতে তিনটি জিনিষ আসিয়া পড়ে না কি? প্রথম এটা বড় হইলেও এটার একটা সীমা পরিধি আছে। দ্বিতীয়—এটা বক্র হইয়া ঘুরিয়া আসিয়াছে। তৃতীয়—এটা বর্দ্ধমান। এটি "মরিয়া" ভূমিষ্ট হয় নাই (পুরাণে মার্তণ্ডের গল্প স্মরণ করিবেন)। Still born নয়। জ্যান্ত, তাজা আণ্ডা ক্রমে বাড়িতে থাকেন। কত বড় যে হইবেন তার ঠিকানা নেই। একেবারে হালের বিজ্ঞানের ভাষায়—Universe যে শুধু Finite এমন নয়; এটা আবার Expanding। কথাটার প্রমাণ সোজা কথায় দেওয়া শক্ত। আইন্‌ষ্টাইন্ ও পরবর্তিদের আঁকের খাতা পাড়িতে হইবে তা হইলে। সেটা চাট্টিখানি কথা নয়। তবে শিষ্ট উক্তি শুনাইতেছি, শুনিয়া বিচার করিবেন; গাঁজা খাইত কে—সিদ্ধাশ্রম না ক্যাভেণ্ডিশ্ ল্যাবরেটরী?

স্যার জেমস্ জিন্‌স জাঁদরেল জ্যোতিষী। গণৎকারও ভাল, কথকও ভাল। বেতারেও কথা কহিয়া থাকেন। লাখে লাখে বই বিকোয়'। এর একটা বেতার-বার্তা এখানে শোনাইব। "But the modern astronomer regards the universe as a finite closed space, as finite as the surface of the earth, and if he is not yet acquainted with the whole universe, he has good reason to hope that he will be before very long. We of to-day no longer think of vast unknown and unsounded depths of space,

stretching interminably away from us in all directions. We are beginning to think of the universe as Columbus, and after him Magellan and Darke, thought of the earth something enormously big, but neverthless not infinitely big; something whose limits we can fix; something capable of being imagined and studied as a single complete whole; something capable of being circumnavigated, if we like.........Scientists now believe that if we could travel straight on through space for long enough, we should come back to our strating point; we should have travelled round the universe."

পুরাণে নানা স্থানে দেখি নারদাদি দেবর্ষিরা ভুবন পরিক্রমা করিতেছেন। পরিক্রমার টাইম-টেবলও আইনষ্টাইন-পন্থীরা তৈয়ারী করিয়াছেন। পুরাণে বৎসরের মনুষ্যমান, পিতৃমান, দেবমান, ব্রহ্মমান—এ সব কথা আছে। তাঁরা রিলেটিভিটির মূলতত্ত্ব জানিতেন। কত লক্ষ কোটি বর্ষে ব্রহ্মার এক দিন হয়, তা কষিয়া দেখিবেন। বর্তমানে জ্যোতিষে "রশ্মিমান" (Light-year) বর্ষ চলতি। কোন তারা হইতে আলো আসিতে পৃথিবীতে কত বর্ষ লাগে, সেটা জানিয়া বলা হয়—অমুক তারা অত লাইট-ইয়ার দূরে অবস্থিত। লাইটে প্রতি সেকেণ্ডে পৌণে ত্বলাখ মাইলের চাইতেও বেশী চলে। সূর্য হইতে আসার সময় মোটে আট মিনিট। এখন, হালের পরিকল্পিত ব্রহ্মাণ্ডের পরিধির হিসাব শুনুন —"The circumference of the universe is likely to lie somewhere between 8,000 million light-years and 500,000 million light-years." সূক্ষ্ম হিসাব নয়, তবু একটা আন্দাজ করার চেষ্টা হইতেছে ত! যেমন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে—পাঁচী ধোপানী বি. সি. ৫০০ অথবা এ. ডি. ৫০০এ প্রাদুর্ভূত হইয়া কলি কলুষ ক্ষালন করিয়াছিলেন! ল্যাজা, মুড়ো ত' হাতে পাওয়া গেল! আর সে যাবে কোথায়? আমরাও দেখিতেছি বিরাট ব্রহ্মের ল্যাজা মুড়ো হাতে পাইতেছি! রহস্য থাক্—তবে এতে বিরাট সত্য সত্যই বামন হইলেন না। আমাদের অতিকায় দূরবীণগুলো এ পর্যন্ত এ বিরাটের দেশে যতটুকু জরিপ করিয়াছে, তাহার মাপ বোধ হয় মাত্র ১৪০ নিযুত লাইট ইয়ার। কোথা পঞ্চলক্ষ নিযুত আর কোথা একশ চল্লিশ নিযুত। অজানার মহানিশায় এখনও বিজ্ঞানের বীক্ষণ-প্রেক্ষণ যন্ত্রগুলো জোনাকির মতন টিপ্ টিপ্ করিতেছে! তবু ত' অসীম নয়! এক দিন—তার বুকের আশা—বিজ্ঞান এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে "একঃ সূর্যস্তমো হন্তি" হইয়া দেদীপ্যমান হইবে!

কিন্তু মুস্কিল আছে। অণ্ডটি না কি বর্ধমান। ব্রহ্ম শব্দের ধাতু "বৃংহ"এর এক মানে বৃদ্ধি। "ব্রহ্মাণ্ড" বলিয়া প্রাচীনেরা এই বৃদ্ধিটাও বুঝাইতে চাহিতেছেন। তন্ত্র-শাস্ত্র ব্রহ্মাণ্ডকে বুদ্বুদের তুল্য ভাবিতে বলিতেছেন। বিজ্ঞানও দেখি সোপ্-ব্যাবলের

নমুনা দিতেছেন। ব্যাবলের পীঠে যদি একটা পোকা ঘুরিয়া চলে, তবে সে ঘুরিয়াই আসিবে; ব্যাবল ছাড়া কখনও হইবে না। স্পেসেও তাই। স্পেসে চলিতে সুরু করিয়া আমরা লক্ষ কোটি লাইট-ইয়ারে স্ব-স্থানে ফিরিয়া আসিব; কিন্তু স্পেস্ ছাড়া কখনও হইব না। যাহাই হউক্, এ বিশ্ব বুদ্‌বুদ্‌টা জন্মিয়াই বড় হইতে থাকে, ক্রমেই বড়। Lemaitre (একজন বেলজিয়ান "গণৎকার") দেখাইয়াছেন যে—Einstein's universe has Properties like those of a soap-bubble.… As soon as it comes into existense, it starts swelling out in size, and must go on expanding indefinitely. আজব কথা! ভস্মাসুর ও ভস্মলোচনের পরীক্ষায় আমাদের এসব কথা আরও কিছু শুনিতে হইবে।

ছাইভস্ম

পূর্বে একবার "বজ্রের কথা পাড়িয়াছিলাম। আজ "ভস্মের কথা" কহিতেছি। ভস্মের কথা "ছাইভস্ম" কথা। আমরা সেবার দেখিয়াছিলাম যে—বজ্রের কথা। বাজের কথাও নহে। বাজে কথাও নহে। বৃত্র, ইন্দ্র আর বজ্র—এ তিনটি বিশ্বভুবনে ওতপ্রোত তিনটি নিগূঢ় তত্ত্ব। জড়ে, মনে, প্রাণে এ ত্রিমূর্তির লীলাস্থল। এ তিনই অবিনাশী। ইন্দ্র বৃত্রকে সংহার করিয়াছিলেন। করিয়াছিলেন কেন—এখনও করিতেছেন; করিতে থাকিবেন। সংহার মানে লোপাপত্তি যদি হয়, তবে, সংহার কখনও হয় নাই। কখনও হইবে না। সেবার কথাগুলো খোলসা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

বজ্র এমন একটা কিছু, যাহা সকল কিছু বিদীর্ণ বিশীর্ণ করিতে সমর্থ। যেটি বিশীর্ণ হয়, সেটি শরীর। যাহা কিছু অবয়বী, যাহা কিছু পরিণামী তাহা বজ্র ভেদ করিতে পারিবে। অবয়ব কেবল যে স্থূল অবয়ব। এমন নয়, পরিণাম শুধু যে ইন্দ্রিয়গোচর, এমন নয়। একটা মলিকিউলের যা অবয়ব, একটা এটমের যা অবয়ব। একটা জীব-কোষের যা অবয়ব—সেগুলোও ধরিতে হইবে। এদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট অবয়ব শরীর আছে। বিজ্ঞান এ ভূত "দেখিয়াছেন"। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না দেখিলেও ইসারায় ইঙ্গিতে যা দেখিয়াছেন, সেটা দেখারই সামিল। একটা 'বেনজিন' মলিকিউল দেখিতে কেমন জিজ্ঞাসা কর—বিজ্ঞান "ফটো" বাহির করিয়া দিবেন। অণুবীক্ষণে সে ফটো তোলা হয় নাই। অণুবীক্ষণে কুলায় না। এ ফটো মনের ফটো—মানসী ছবি। তবু সত্যি—সত্যি সত্যি, সত্যি। বিজ্ঞান হলফ নিতেও রাজি। কবিই বা কোন গররাজি তাঁর মানস প্রিয়াকে ভাবিতে বাস্তবী? কবি ও "সীভাণ্ট" একই গোত্র। এ বিশ্বের যিনি কল্পয়িতা ও শিল্পী, তাকে এ দেশের ব্রহ্মবিদ্যা—"কবিং পুরাণমনুশাসিতারং" এই ভাবেই কীর্তন করিয়াছেন। বিশ্বকর্মা—ঋগ্‌বেদের মন্ত্রে যার অভিনন্দন—এই বিশ্ব আখড়ার প্রধান "সাভাণ্ট" বা ওস্তাদ—বড় গামা। তার সাক্রেদ দক্ষাদি প্রজাপতি। পুরাণেও দেখি—পুরাণ কবির আদৌ মানসী সৃষ্টি। তারপর মৈথুন সৃষ্টি। বিজ্ঞান মলিকিউল, এটম, জীবকোষ প্রভৃতির সে সব ফটো বাহির করিতেছেন, ফটো মিলাইয়া সাদী দিতেছেন। আবার তালাকও দিতেছেন, সেগুলো ষোল আনা না হোক্, অনেকাংশে যে তাঁরই মানসী সৃষ্টি, তাতে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে না। Mental image বা conecpt বলিলেও বিজ্ঞান খাপ্পা হইবেন কি? এ মানসী সৃষ্টি তিনি গড়িতেছেন। ভাঙ্গিতেছেন, বদলাইতেছেন।

ঊনবিংশ শতকে এটম ছিল অক্ষর, অব্যয়, অজ। জড়ের চরম অবিভাজ্য পদার্থ।

এ শতকে এটম্ শ্রীযশোদাদুলালের মতন হাঁ করিয়াছেন। আর তার ভিতরে আমরা ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছি। রীতিমত একটা সৌরজগতের বৃষোৎসর্গের সব বন্দোবস্ত। হাঁ—সূর্যও বৃষ, এটমও বৃষ—বর্ষণ করেন। বিগত শতকে শ্রীযশোদাদুলাল (এটম্) নিয়মের দড়িতে বাঁধা দিয়াছিলেন। নিউটনি ডাইনামিক্স যে দড়ি পাকাইয়া দেয়, সেই দড়ি। খাসা মজবুত দড়ি। সে যুগের কারিগরেরা সেই দড়ি দিয়া শুধু যে এটম্‌কে বাঁধিয়াছিলেন, এমন নয়। সেই দড়ি বুনিয়া এক চমৎকার বিশ্ব-বেড়াজাল বুনিয়াছিলেন। সে জালের নাম ছিল—বিশ্ব-বিধিতন্ত্র—Law of Universal cousation অথবা Uniformity of Nature। স্বয়ং নিউটন জ্ঞান-বারিধির কূলে দাঁড়াইয়া উপল খণ্ড কুড়াইয়াছেন বলিয়া বিনয় করিয়াছিলেন; কিন্তু চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট বছর আগে হিকেল হক্‌সলি এঁরা এ জাল ঘাড়ে করিয়া বিশ্বসাগরের কূলে দাঁড়াইয়া কি দেমাক, কি পসরাই না করিয়া গেলেন। এ জাল মাথা ঘুরাইয়া ফেলিলে না কি সাগরের সপ্ত পুরুষ বাঁধা পড়িয়া যাইবেই; তিমি-তিমিঙ্গিল হইতে সুরু করিয়া ইস্তক চুনো পুঁটি কেহই নাকি বাদ পড়িবে না। জালের গাঁথুনি, এমনি বহর। কিন্তু বিজ্ঞানের ভীম আস্ফালন এরই মধ্যে নাকি সুর ধরিয়াছে।

কোয়ান্‌টার কথা আগের বার পাড়িয়াছিলাম। এ কোয়ান্‌টা আমরা বুঝি না—অথচ এটা একটা অকাট্য সত্য—"brute fact"। আর আর যা কিছু বুঝি বলিয়া অভিমান করি, তার সঙ্গে এই আকাট্ "আবিষ্কার"টিকে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছি না। এটমের অন্দরে যে আবর্তন, তাতে লম্ফনও আছে দেখিয়াছি। ইলেকট্রন শুধু যে গড়াইয়া যায় (Crawls) এমন নয়; লাফও মারে (hops)। ইলেকট্রনের এই নাচে জগৎ "আলো" হইতেছে; কিন্তু এ নাচের রহস্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান প্রচণ্ড অন্ধ। এই রকম সব মারাত্মক ছেঁদা মানুষের মনন-বুনানী বিশ্ব বেড়া জালে বাহির হইয়া পড়িতেছে। মেরামতের চেষ্টার কসুর নেই। কেউ বলিতেছেন—জাল মেরামত হইবেই। আমাদের বুদ্ধির টেকোয় দড়ি কাটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সবুর কর, দড়ি যোগাইলেই ফুটা ফাটা সব মেরামত হইয়া যাইবে। তখন কেয়াবাৎ। কোয়ান্‌টাম, ফোয়ান্‌টাম কিছুই পাশাইবে না। কেউ কেউ বা বলিতেছেন—শুধু দড়ি না, একটা কলসীর যোগাড়ও চাই। বিজ্ঞান তাই গলায় বাঁধিয়া এই অতল, অকূল রহস্য-সায়রে ডুবিয়া মরিবেন, ডুবিয়া মরিয়া "ভূত" হইবেন না—"দেবতা" হইবেন—প্রজ্ঞান হইবেন। তখন উপনিষদের ঋষিদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সুর ধরিবেন—"যেনামতং তস্য মতং" ইত্যাদি। ঈশাবাস্য ও কেন—এই দু'খানা উপনিষদ্ একবার পড়িয়া লইবেন। "যে বলিল, বুঝি সে বুঝে নাই। যে বলে বুঝি নাই, সে বুঝিয়াছে। যে বলিল জানি নাই, সে জানিয়াছে, যে বলে জানিয়াছি, সে জানে নাই।" এডিংটন প্রমুখ দু'একজনের মুখে এ বুলি আধ' আধ' ফুটিতেছে। ব্রহ্মবিদ্যার পাঠশালায় বিজ্ঞান সবে এই সেদিন হাতে খড়ি দিতে সুরু করিয়াছে বৈ ত নয়। তার "বালভাষিতং" আজ "অমিয় সমান"।

তারপর জালটায় ইচ্ছাকৃত গোঁজামিল যে কিছু না ছিল, এমন নয়। আজ কক্ষপথে ইলেকট্রনের বেয়াদবী লাফ দেখিয়া আমরা আঁৎকাইয়া উঠিতেছি! ভাবিতেছি —একি উদ্‌ভুট্টি ব্যাপার! এ নাচে যে বিজ্ঞানের পাকা হাতের সঙ্গৎ বানচাল হয়। কিন্তু সেই ক্লাউজিয়াস্, ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ইত্যাদি দিনের "সঙ্গৎ" গুলোই বা কি? একটা গ্যাসের দানা বা মলিকিউলগুলো কি ভাবে ছুটাছুটি ধাক্কাধাক্কি করে তার হিসাব করিতেছি। দানা ত' ঝাঁকে ঝাঁকে। ঝাঁকের হিসাব বা গড়পড়তা হিসাবই সম্ভব। কোন একটির সঠিক হিসাব কে রাখে, কে দিতে পারে? ব্যক্তির খাঁটি হিসাব জানি না, সমষ্টির জাবদা হিসাব জানি। সমষ্টিতে যেটা পাই, (average) কষিয়া ব্যক্তি বিশেষে সেটা বাঁটোয়ারা করিয়া দেই। যেমন আমরা এ দেশে গড়ে ২৩ বছর বাঁচিতেছি, ৩০৲ সালিয়ানা কামাই করিতেছি। ঝাঁকের বেলায় কতকটা, (ব্যক্তির বেলায় বিশেষতঃ) আমাদের হিসাব সম্ভাব্যের (Probabilityর) হিসাব। ক এর খ হবার সম্ভাবনা যতটা, গ হবার সম্ভাবনা তার তুলনায় এতটা বেশী বা কম। এখন বাঁধাবাঁধি মামলা হইতে সম্ভাবনার মামলায় গিয়া পড়িলে, অনেক কিছু "সম্ভব" হবার ফাঁক রহিয়া যায়। ইলেক্‌ট্রন আজ "খোস খেয়ালে" তালিমের তালকে কলা প্রদর্শন করিয়া লাফ মারিতেছে। ইলেক্‌ট্রনের এ লাথি মাথা পাতিয়া নিতেছে। একটা গ্যাসের দানা, একটা ধূলিকণাও যে "খোস খেয়ালে" মোটেও চলে না, সেও যে বিশ্বনাট্য-লীলারসিকের একটা লীলা-বিগ্রহ, লীলামন্দির নয়, তাই বা ঠিক করিয়াছে কোন্ অভ্রান্ত বেদবিধানে? তোমার হিসাবের জালের ফুটো দিয়ে সেও গলিয়া যাইতেছে না কি?

গোঁজামিলে সে ফুটা সারিবে কি? নিউটনি হিসাবের জাল জবর বুনানী বটে। কিন্তু তাতে গোঁজামিল বিস্তর। কতকগুলো সংজ্ঞা বা কন্‌ভেন্‌শন্ করিয়া লইয়াই জাল বুনিতে বসিয়া গেলে! ভাবিয়া দেখিলে না—সংজ্ঞাগুলো মনগড়া না বাস্তব! বস্তু বা ম্যাসকে ধরিয়া লইলে কায়েমি (Constant) একটা বস্তু যেমন খুসি চলুক, তার বস্তুর "পরিমাণ" কায়েম থাকিবে। মোটামুটি থাকে বটে। কিন্তু না থাকিতেও পারে। খুব ছুটিলে হয়ত রাশভারীও হইতে পারে। এখন রেলেটিভিটি থিওরি বলিতেছেন—ম্যাস কায়েমি নয়; এনার্জি বা কার্যকরী শক্তিরই প্রকারান্তরই ম্যাস। কাজেই শক্তির অতিবৃদ্ধিতে ম্যাস বাড়িবে। নিউটনি ডিনামিক্সের কন্‌ভেনশন্‌টি যথার্থ হয় নাই। আরও কত কি এইরূপ! এইজন্য বলিতেছিলাম—হিসাবের জালটাও যে কতকটা ময়দানবী মায়াজাল নয়, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। বিজ্ঞানের ফরমাসি জগৎ যে "মায়াপুরী" (Conceptual Conventional World) একথা আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের বেশ করিয়া শুনাইয়া গিয়াছেন। বারট্রাণ্ড রাসেল, হোয়াইট হেড এঁরা আজও "কিন্তু" করিতেছেন। হয় ত' "কিন্তু" আছেও। তবুও এটা ঠিক যে বিজ্ঞানের সৃষ্টি অনেকাংশে (সর্বাংশে

নাই বলিলাম) মানস সৃষ্টি। এ জগতে শুধু সৃষ্টি কেন, স্থিতি, সংহার—এ সবের সনন্দও বিজ্ঞান লইয়াছেন।

বিজ্ঞানের ঐ সব এটম প্রভৃতির নক্সা বা ফটো তাই আমরা মানসী বলিয়াছিলাম। তাই বলিয়া এগুলি একেবারে আরোপ, অধ্যাস, মিথ্যা মায়া না হইতে পারে। বিজ্ঞান লিঙ্গপূজা করেন। অর্থাৎ যেখানে প্রত্যক্ষে কুলায় না, সেখানে লিঙ্গপরামর্শ দ্বারা সিদ্ধান্তের নিগমন করেন। ন্যায়ের কথা, অন্যায় কিছু ভাবিবেন না। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষৈক-প্রমাণবাদী হইতে সাধ করেন; কিন্তু অনুমানাদিও তাহাকে করিতে হয়। অগত্যা, অনুমান করিতে গেলেই লিঙ্গ পরামর্শ চাই; অর্থাৎ কোন কিছু সত্যসন্ধানী অনুমিতিসূত্র হাতে পাওয়া চাই। আচম্‌কা অনুমিতি হয় না। পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। পাকা অনুমান ছাড়া, উপমিতি (Analogy); থিওরি, হাইপথেসিস্—এ সবেরও দরকার আছে। বিজ্ঞান এটম্ প্রভৃতির অন্তঃপুরের যে সব নক্সা আঁকিতেছেন, সেগুলো থিওরির সামিল। প্রত্যক্ষ নয়, পাকাপোক্ত অনুমিতিও নয়। তবে থিওরি একেবারে আসমানে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। প্রধানতঃ স্পেকট্রাম এনালিসিস্ অথবা আলোক বিশ্লেষণের সূত্র ধরিয়া এ থিওরীর আঁতুড়ঘরের নক্সা হইয়াছে। আমরা আগের বারেই দেখিয়াছিলাম যে অণুর পুরী অনেক মহল। একেবারে বাহিরের মহলের খবর পাই সাধারণ আলোক বিশ্লেষণে; মাঝবাড়ীর খবর পাই এক্স-রে বিশ্লেষণে; আর একেবারে ভিতর-মহল বা নিউক্লিয়াসের খবর আনিয়া দেয় প্রধানতঃ রেডিও-একটিভিটি, যেমন খবর পাইতেছি তেমন নক্সা আঁকিতেছি। নক্সা দরকার মত বদল করিতেও হইতেছে। ভবিষ্যতেও হইবে। হিসাব (calculation) আর পরখ (Observation Experiment)—এ দুয়ের সাট রাখিয়া চলিতে হইতেছে।

বর (Bohr) হাইড্রোজেন-স্পেকট্রাম বুঝিতে চাহিয়া কল্পনা করিলেন—কেন্দ্রে "একটি (one unit) পুং তাড়িত (positive) রহিয়াছে। আর সেই কেন্দ্র বেড়িয়া "একটি" স্ত্রী-তাড়িত (negative-ইলেকট্রন) পাক খাইতেছে। "ম" ইলেকট্রনের ম্যাস ধরিলেন; "এ" ধরিলেন তার আবর্তন কক্ষের ব্যাসার্ধ; "ই" ধরিলেন পুং অথবা স্ত্রী তাড়িতের "মাপ" (change)। প্রথম হিসাব করিলেন—কত জোরে (force এ) ইলেকট্রন কেন্দ্র ছাড়িয়া উধাও হইতে চলিতেছে ("কেন্দ্রাতিগশক্তি"); আর কত জোরেই বা কেন্দ্রস্থ পুরুষ পলাতকা স্ত্রীটিকে তাঁর টানিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন ("কেন্দ্রানুগ-শক্তি")। এ দুটো বিপরীত টান সমান; কেন না, স্ত্রীটি মামুলি পথে পাক খাইয়াই যাইতেছেন। শুধুই কি সাত পাক? পরার্ধ পাক!

তারপর গতিবিজ্ঞানের সূত্রে ইলেকট্রনের মোটমাট (total) এনারজি মিলিল। এনারজি আর ফোর্স উক্ত বিজ্ঞানের পরিভাষায় এক জিনিষ নয়। তারপর দেখিলেন—স্ত্রীটি একটিবার পুরা পাক খাইয়া আসিতে মোট কতটা বেগ (impulse) পাইতেছেন।

তা গণিতের হিসেবে জানা গেল। সেটা যা দাঁড়ায় সেটা কোয়ান্টামের ("এইচ"এর) কোন একটা গুণিতক (multiple) অবশ্যই।

কোয়ান্টাম থিওরি তাই দাবী করে। অর্থাৎ কোয়ান্টাম থিওরি চায় যে কোনও একটা চক্রগতি (periodic action) হইতে গেলে, শক্তির একটা বাঁধা কনিষ্ঠ মাপ ("h") আছে। সেই মাপে অথবা তার কোন গুণিতকেই ক্রিয়া (action) হইবে। সে মাপের কোন ভগ্নাংশ হইল এই "এইচ"-ক্রিয়ার (action or angular momentum-এর) "পরমাণুতনু"। সে তনুর অঙ্গচ্ছেদন নেই। এত ছোট যে বিলিয়ান্-বিলিয়ান্ গুণ এঁর অণুটি গুণিত করিলে তবে নাকি ইনি সাক্ষাৎকার যোগ্য হন। হিসাবে এর রাশ স্থির হইয়াছে। "h"-৬'৫৫ কে ভাগ দিতে হইবে একের পিঠে কমসে কম সাতাশটে শূন্য দিলে যে সংখ্যাটি হয়, তাই দিয়া। এটি বড় মজার সংখ্যা। এই মাপে অথবা এর কোন গোটা গুণিতক (multiple integer-এ যথা 2h, 3h, nh) চক্র দিয়া চলিতেই হইবে। ধর ইলেক্‌ট্রন সব চেয়ে ছোট গোল পথে পাক খাইতেছে। কেন্দ্রের আর বেশী কাছে ঘেঁসিয়া আসা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তা যদি হয় ত' ইলেক্‌ট্রন ম্যাস্‌কে তার গতিবেগ (velocity) দিয়া গুণ করিয়া তাকে আবার সমস্ত বৃত্ত-পরিধি ("টু-পাই") দিয়া গুণ করিলে, হুবহু "h" হইবে, এক পাই কমও না, বেশীও না। এর চাইতে ঠিক বড় বৃত্ত-পথে ঐ গুণফল দুই "এইচ" হইবে ; তার চাইতে বড়তে তিন "এইচ" হইবে। এইরূপ, ভগ্নাংশ, টুকরা টাকরার কারবার নেই। পাইকারী কারবার, খুচরা কারবার চলে না। পুরা তথ্‌খা চাই, কর্তন করিলে চলিবে না। প্রকৃতির এই গোটা কারবার "পুরা" নিষ্ঠা অদ্ভুত। আগে ভাবা হইত প্রকৃতি কে'জো শক্তি বা ক্রিয়মাণ শক্তি (এনার্জি)র ছোট ছোট প্যাকেট বা বাণ্ডিল করিয়া রাখিয়াছেন। সে প্যাকেট বা বাণ্ডিল আস্তই কারবারে খাটিবে। বাণ্ডিল ভাঙ্গা নিষেধ। ধর তাপ বিকিরণ হইতেছে—অর্থাৎ ছড়ান হইতেছে। যিনি ছড়াইতেছেন, তিনি তাপশক্তি ঐ রকম ছোট ছোট বাণ্ডিল বাঁধিয়া বিলাইতেছেন। এক বাণ্ডিলের কম বিলি হয় না। দেড় বাণ্ডিল, পৌণে দু'বাণ্ডিল ও না। কেননা ওরূপ করিতে গেলে বাণ্ডিল ভাঙ্গিতে হয়। সেটি হবার যো নেই। প্রথমে প্ল্যাঙ্ক প্রভৃতি কেউ কেউ এই সব লিলিপুটিয়ান বাণ্ডিলের সন্ধান বাহির করিয়াছিলেন। ফোঁটায় ফোঁটায় তেল দেওয়া যায়, আবার একটানা ধারায় গড়িয়েও দেওয়া যায়। প্রকৃতি ফোঁটায় ফোঁটায় তেল খরচ করেন ; ঢালাও এক নাগাড়ে (Continuous) ভাবে করেন না। করেন না বলিয়া, তাঁর তাপ ইত্যাদি শক্তির ভাঁড়ার শীঘ্র উজাড় হয় না। এক নাগাড়ে খরচের হিসাব দেখা গিয়াছে, প্রকৃতির গেরস্থালীর বরাদ্দ খরচের চাইতে বেশী হয়। প্রকৃতি পাকা গিন্নী। এখন সমারফেল্ড প্রমুখ অডিটারেরা নতুন অডিট বাহির করিয়াছেন। তাতে সেই বকেয়া বাণ্ডিল বা প্যাকেট কতকটা বাতিল বটে। কিন্তু আসলে ঠিক আছে। যেখানেই প্রকৃতি টেকো কাটিতেছেন। চরকা চালাইতেছেন।

(কোথায় বা না চালাইতেছেন ? অণুতেও বটে, বিরাটেও বটে ; বিরাট জ্যোতিশ্চক্রের নাভিটি "hub" না কি বাহির হইয়াছে,) সেখানেই ঐ "h"এর বা কোয়ানটামের কারবার। অর্থাৎ পাকক্রিয়াটি ঐ "এইচে" অথবা উহার কোন গোটা গুণিতকে হইবে। কথাটা সোজা তর্জমা করিয়া বলিলাম। সমারফেল্ডদের অডিট শিটে কিছু মার প্যাঁচও আছে। পাকা মুন্সী ছাড়া আনাড়ীতে বুঝিবে না। প্রকৃতি কিন্তু পাকা হিসেবী। ধর, একটা পাকক্রিয়া (periodic action) হইতেছে। ঘুরিয়া আসা যে এক কদমে (Constant velocityতে) হইবেই এমন কথা নেই। কার্যতঃ হয়ও না। কদমের বেশী কমি আছে (অর্থাৎ variable)। এখন এই রকম "এলোমেলো" কদমে চলিয়া সারা পথটা ঘুরিয়া আসিব, অথচ (total action) ঐ "এইচ" অথবা উহার কোন গোটা গুণিতক রহিবে—এ বড় সোজা ওস্তাদী কসরৎ নয়। ইনটিগ্রাল ক্যালকুলাস নামক গণিত শাস্ত্রটা দেখিতেছি আমাদের গিন্নীর নথস্ত। তিনি নথ নাড়িয়া ঠিক কদম বাতলাইয়া দিতেছেন—যাতে ঐ এইচের বরাদ্দ ঠিক ঠিক থাকে। প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শুধু সাংখের পুরুষ নন, সংখ্যা পুরুষ—The God of Number। তিনি শুধু যন্ত্রী নন্, মন্ত্রী।

কোয়ানটামের তত্ত্ব আসলে বিন্দুতত্ত্ব। শক্তির নাদ (Continuity) অবস্থাও বিন্দু অবস্থা। বিন্দু হইলে তবে ক্রিয়ার সূচনা হইয়াছে। বিন্দুর আর পরিচ্ছেদ নেই, টুক্‌রা হয় না। কাজেই বিন্দু বিন্দু রহিয়াই শক্তিকে ক্রিয়া করিতে হয়। এ কথা শাস্ত্রে বলিয়াছেন। তবে এ কথার বিস্তার এখানে করিব না।

আমরা Bohrএর হিসাব শুনিতেছিলাম। তাঁর দেওয়া হিসাবে বিন্দুশক্তি কি আকারে দেখা দেন তা আমরা কটাক্ষে দেখিয়া লইলাম। বিন্দুশক্তি আর কোয়ান্টামকে আমরা হুবহু মিলাইয়া দিতেছি না। তার দেরীও আছে। বিন্দুর পথ অবন্ধুর, কোয়ন্টামের কোটে শেয়াকুল কাঁটা। তবে বিন্দু ও কোয়ান্টা—এ দুয়ের একই কাঁটা, একই পর্যায়ের তত্ত্ব। যাই হোক Bohr হিসাবের খাতায় আঁক কষিয়া R অথবা Rydberg Constantএর এক দাম বাহির করিলেন। আলোর ঢেউ—ইয়ংফ্রেসনেলের দিন থেকে বিজ্ঞানে চলিয়াছিল, এখনও অচল হয় নাই। একটা ঢেউ কতটা লম্বা তা' ধর জানি। সেই মাপটা (চুড়ো থেকে চুড়ো) তার দ্রাঘিমা (wavelength)। এখন এক সেন্টিমিটারে সেই দ্রাঘিমাটি কতবার ভাগ খায় জানিলে। জানা গেল—সেই ঊর্মির "ঊর্মিসংখ্যা" (wave number)। Rydberg স্পেক্‌ট্রম লাইন্‌সগুলি সম্বন্ধে এই ঊর্মি সংখ্যার একটা পাকা ঘুঁটি (Constant) বাহির করিয়াছিলেন। স্পেকট্রম-বিশ্লেষণ উদ্ভূত বিভিন্ন রেখাবলীতে, এমন কি সকল মূলীভূত (elements)এর স্পেকট্রাম রেখাবলীতেও ঊর্মি সংখ্যার উক্ত পাকা ঘুঁটিটি বর্তমান। সে পাকা ঘুঁটির দাম খার্ব—প্রতি সেন্টিমিটারে এক লাখের কিছু বেশী ঊর্মি। এই সংখ্যাটি বিভিন্ন-রশ্মি-বিশ্লেষণ-উদ্ভূত ঊর্মিসংখ্যায় অনুস্যূত (involved) দেখা যায়। Neilis Bohr—স্বয়ং দিনেমার

ম্যাঞ্চেষ্টারে রাদারফোর্ডের (এখন লর্ড) সহযোগে কর্ম করিতেন; এবং ইয়োরোপে যে সময় মহাযুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়েই তাহার প্রসিদ্ধ অণুরহস্যবিদ্যা বিদ্বন্মণ্ডলীতে প্রচার করিয়াছিলেন। রাদারফোর্ড অণুর অন্দরের নক্সাটি দিয়াছিলেন অর্থাৎ ডিজাইনটি। বর সেই নক্সার উপর খড়ি পাতিয়া তার "নাড়ি নক্ষত্র" গণিয়া দিতে লাগিলেন—অর্থাৎ, atomic mechanicsএর সূচনা করিলেন। এই বর অণুর অন্দরের নক্সায় খড়ি পাতিয়া Rydberg Constantএর যে দাম ধার্য করিলেন; সে দামের সঙ্গে তার পূর্ব যাচাই করা দাম মিলিয়া গেল। কাজেই হিসাব পরখের দ্বারা পাকা হইল। বিজ্ঞানে এইরূপ হামেশাই হইতেছে। রেলেটিভিটি মতটা কি সত্য?—প্রশ্ন করিলে বলিতে হয়,—"কে জানে বাপু। তবে দেখিতেছি—প্রত্যেক পরখেই এ মতবাদ খাসা উত্‌রাইয়া যাইতেছে। কাজেই সত্য হওয়াই সম্ভব।"

এটমের ভিতরে "ফাঁকা আসমান" (roomy space); কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস্ বা ভূতবীজ; সেই ভূতবীজেই বস্তু (mass) প্রায় ষোল আনাই দেওয়া; চারিধারে মণ্ডলাকারে (বড় বৃত্ত আঁকিয়া হিসাব করিয়াছিলেন; কিন্তু বৃত্তাভাস বা ellipse হইতেই বা বাধা কি ?) সমারফেল্ড প্রভৃতি মামুলি হিসাবের সংশোধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইলেকট্রন (এক ও অনেক) পাক খাইতেছে। ইলেক্‌ট্রনে বস্তু প্রায় নেই, তবে রোখ খুব আছে। নিরানব্বুইটি মূলভূতের ভূতবীজ আলাদা আলাদা, তাদের আণবিক সংখ্যা স্বতন্ত্র; তাদের মণ্ডল বা চক্র এক, সে সব মণ্ডলে রটন্তী ইলেক্‌ট্রন যূথ ও সংখ্যায় আলাদা। এই ভাবে ফিল্ম উঠিয়াছে। এখনও মাঝে মাঝে ফটোগুলি retouch (রিটাচ্) করিতে হইতেছে। ১৯৩২ অব্দে ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটারি "নিউট্রন" বাহির করিল। স্ত্রী ইলেকট্রনই (অর্থাৎ negative) এতদিন জানিতাম, এখন পুং জাতীয় ইলেকট্রন ও (অর্থাৎ positive) শুনিতেছি। কিছুদিন আগে Cockcroft ও Wolton ঘোষণা করিলেন—এটম্ স্বভাবে কোথাও কোথাও নিজেই ভাঙ্গে দেখি: কিন্তু এটম্ ভাঙ্গার যন্ত্র মানুষ আজ বানাইল। অর্থাৎ সেই "বজ্র" যাতে করে এটম ভস্ম আমরা পাইতে পারিব! অপরস্মা কিং ভবিষ্যতি ?

বিজ্ঞানের "গ্রাম্য ভাষা" আওড়াইয়া আপনাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছি। এ গ্রাম্যভাষা কিন্তু একটু আধটু শোনার দরকার হইতেছে। নৈলে যে বজ্রও বুঝিব না, ভস্মও বুঝিব না। আমরা বুঝিলাম এইটুকু যে—প্রকৃতির প্রকৃত কাঠামোগুলো যে কি তা হয়ত' আমরা জানি না। বিজ্ঞান যেগুলো তার ফটো বলিয়া বাহির করে, সেগুলো সর্বাংশে সত্যকার কাঠামো নাও হইতে পারে। তবে সত্য বলিয়াই চলিতেছে। গত্যন্তর নেই। অন্ততঃ মননের রাস্তায়—হিসেবী মগজের মাতব্বরিতে চলিয়া। ছবিগুলো নিত্য নূতন "রিটাচিং" সত্ত্বেও সেগুলোকেই আপাততঃ আমাদের কারবারি চিন্তার বৈঠকখানায় সাজাইতে হইতেছে। কবে আবার পেরেক শুদ্ধ পাড়িয়া ফেলিতে হইবে তার ঠিকানা নেই।

ছবি শুধু যে বামনের দেশের এমন নয়, বিরাটের দেশেরও প্রচুর মজুদ হইয়াছে। সুদূর নক্ষত্রলোক, নীহারিকালোক ফটো পাঠাইয়াছেন। ছায়াপথের পরপারের খবরও পাইতেছি। আমরা আগে দেখিয়াছি—ব্রহ্মাণ্ডের সেই পুরাণী ছবি একেবারে আধুনিকতম বিজ্ঞানের ক্যামেরায় আবার উঠিতেছে। সে ছবি না কি এতদিন মরিয়া ভূত হইয়াছিল। চন্দ্রমণ্ডলের এক পিঠই দেখি। কিন্তু পরিচয়টা খুবই নিবিড়। পৃথিবী আপন বাঁধনে চন্দ্রকে এমনি বাঁধিয়া রাখিয়াছেন যে সে পৃথিবী বেড়িয়া পাকই খাইতেছে কিন্তু "পাশ ফিরিয়া" পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে পারে না। পৃথিবীর এই টানটি ("gravitational grip") এমনি টান, যে চাঁদ তার "চাঁদ মুখ" ফিরাইতে পারে না। তবে ঘোমটার ব্যবস্থাটি আছে। এই দুর্জ্জয় নারী প্রগতির দিনেও! তবু ভাল! মান করিয়া "কলাটি" দেখানোত চলে! অমন ঢলঢলে কান্তি—বিদ্যাপতি শ্রীরাধার মুখশশী আঁকিতে সাধ করিয়া না "হিমধামা"কে (কিনা চাঁদকে) "হরিণীহীন" (কিনা নিষ্কলঙ্ক) করিয়া "কনকলতা অবলম্বনে" উদিত করিয়াছিলেন। এত গেল রসিকের বিদ্যাপতি। বিজ্ঞানের বিদ্যাপতি যাঁরা তাঁদের জিজ্ঞাসা কর—বলিবেন চাঁদেরও চটক বেমালুম চোরা। মায়া মতিভ্রম! নিকট পরিচয় লইবে? কেবল রুক্ষ পাহাড় পর্বত আর আঁধার ফাটাল গর্ত। ঘাস জলের গন্ধ নেই; বায়ুভুক্ হবে তার যোও নেই বায়ুই নেই—চাঁদের এতখানি "টান" নেই যাতে করে একটা বায়ুমণ্ডল তাহাকে ঘিরিয়া আটক থাকিতে পারে। অথচ তার চাঁদের টানে ধরার সাগর কাঁপিয়া ওঠে আরও কত কি। তবে চাঁদে আছে কি? শুধু ছাই আর ভস্ম। আগ্নেয়গিরির অন্তর্দাহের জ্বালায় চাঁদের হাট পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। এসব বিরাটের দেশের কাহিনী আর একদিন না হয় পাড়িব। পৃথিবীতে ফিরিয়া প্রাণীর খবর, জীবের খবর নিন। চাঁদ "প্রেত" লোক। ওখানে জ্যান্তর চিহ্ন মাত্র নেই। প্রাণীদেহের সূক্ষ্ম জীবকোষগুলো এটম্, মলিকিউল এর চাইতে ঢের মোটা জিনিষ। তাদের ফটো তুলিতে বিজ্ঞানকে বড় একটা লিঙ্গ পরামর্শ করিতে হয় নাই। অনেক তথ্যই প্রত্যক্ষগোচর। অবশ্য যোগদৃষ্টিতে। বিজ্ঞানের যোগ কর্মসু কৌশলম্—উপযুক্ত যন্ত্রপাতি। যেমন কেউ কেউ বলিতেছেন—এটম ভস্ম করার যন্ত্র এইবার বানাইয়াছি। যাই হোক জীবকোষে (cellএ) নিউক্লিয়াস আছে। তার আবার ছোট কর্তা বড়কর্তা আছেন। তাছাড়া টানাটানি কর্তা (attraction sphere or centre) নাকি একটিও আছেন। জীবকোষ তখন ব্রহ্মের মতন "একোঽহং বহু স্যাং" কাজটি শুরু করে অর্থাৎ এক দুই হয়, দুই চার হয় ইত্যাদি। তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার। রীতিমত সুতাকাটা আর বুনানীর ব্যাপার। সেই ঋক্‌বেদের ঋষিরা যা বলিয়াছেন তাই বুনানীর মাকু (spinddle) সত্য সত্যই দেখা দেয়; সেই মাকুতে জীবকোষের ক্রোমোসোমস্ গুলো কি ভাবে সাজান গোছান হয় তা দেখিলে নিশ্চয়ই মনে হইবে—এ আজব তাঁতের চাঁই তাঁতি

কেউ আছেন। এটমের বেলায় যেমন এখানেও সংখ্যাতত্ত্ব। এটমের জাতিভেদ সংখ্যা লইয়া জীবের জাতিভেদও সংখ্যা লইয়া। বাইরের সংখ্যা নয়, একেবারে ভিতরের এটমের বেলায় নিউক্লিয়াসে যতটা "নেটচার্জ" আছে তার সংখ্যা নিই; জীবকোষের বেলায় ঐ তাঁতের "সুতোর" (chromosomes) সংখ্যা নিই। সংখ্যাতত্ত্ব মন্ত্রতত্ত্ব। প্রতি "জাতির" জাতীয় বীজ মন্ত্র আছে।

প্রাণীর হিসাব লইলাম। মনের হিসাব লইব না। নিষ্প্রয়োজন। এখন এই সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞান যে সব ছবি তুলিতেছেন, সে হুবহু সত্য ছবি না ও হইতে পারে। না হবার সম্ভাবনা যে না আছে, এমন নয়। সেকালের (যেটাকে আমরা সিদ্ধাশ্রম বা নৈমিষারণ্যের বিদ্যা বলিয়াছি, কিন্তু সে বিদ্যা কেবল ভারতেরই এমন নয়) কতকগুলি "ছবি" তুলিয়াছিলেন। আগে ঐ পুরাণের ছবিগুলি আমাদের ঘরের দেওয়ালে ঝুলিত। এখন আমরা সেগুলো নামাইয়া আবর্জনার গাদায় ফেলিয়াছি। নতুন ছবি পশ্চিমের আমদানি—এখন বৈঠকখানা আলো করিতেছে। এ দেশেও দু'চারিজন নতুন ঢংএর ছবি আঁকিয়া যশ পাইয়াছেন। প্রফুল্ল, জগদীশ, রামানুজ, রমণ, মেঘনাদ, ঘোষ—আরও কেউ কেউ খুব খাতির পাইয়াছেন। পাবারই কথা। যাই হোক্—এখন চোখ রগ্ড়াইয়া দেখিতেছি নূতন, টাট্কা কোনও কোনও ছবি সেই সব পুরাণী তসবীর আবার পরখ করা উচিৎ। তাঁদের আকার ঢং আর এঁদের ঢং আলাদা। তাঁরা আর এঁরা এক কায়দায় তুলি ধরেন নি। রংও আলাদা। তাঁরা যে উপায়, যেমন করিয়াই জানিয়া থাকুন না কেন, তাঁরাও তবে জানিয়াছিলেন। আমাদের মত এমন চুল চেরা কড়াক্রান্তির হিসাব তাঁরা রাখেন নি? বলিতে পারি না। এখন বজ্র আর ভস্মের লক্ষণ ঠিক করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। যাতে করে সব কিছু বিদীর্ণ, বিশীর্ণ হইতেছে, তাই বজ্র। নানান্ রূপ, নানান্ নাম। কোথাও বজ্র মানে তাপ বা অগ্নি; কোথাও রেডিও একটিভিটি, কোথাও বা রশ্মি, কোথাও রাসায়নিক ক্রিয়া—যথা অক্সিডাইজেসন্, কোথাও তাড়িতক্রিয়া, চৌম্বিক ক্রিয়া; কোথাও মেটাবলিজম্, কোথাও "ভস্মকীট"; কোথাও অভিনিবেশ বা অন্য মানসিক ক্রিয়া সাইকোএনালিসিস্। সর্বত্র এই বজ্র কাজ করিতেছে। এর যেটা নিরতিশয় সমর্থ অবস্থা (Ideal limit), সেইটাকেই বজ্র বলা উচিৎ বটে, কিন্তু এর অনুকল্প, প্রতিনিধি, ডেপুটি সর্বত্র। মঘবার হস্তে ইনি বজ্র; শিবের হস্তে শূল, বিষ্ণুর হস্তে গদা। সব কিছু বিশীর্ণ করিতে সমর্থ। সূর্যে, নক্ষত্রে, রেডিও-একটিভ্ ভূতে মহা অগ্নিরূপে ইনি খোদ এটমকেই বিশীর্ণ করিতেছেন। জীব কোষে মেটাবলিজম্ রূপে হোম করিতেছেন। জঠরে ইনি "ভস্মকীট"। অন্তঃকরণে, মনে ইনি ত' সদাই ব্যস্ত। প্রতিনিধিদের দেখিয়া খোদকে ভুলিলে চলিবে না। এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটাই একটা বিরাট যজ্ঞশালা। ঋক্‌বেদই বলিয়া গেছেন। যজ্ঞশালায় বজ্রাগ্নিতে নিখিল ভূতের হোম হইতেছে। সবই তাতে ইন্ধন। যারা জবর, জটিল

(Complex), তারা ভাঙ্গিয়া "সোজা" সিধে হইতেছে। সমীকরণের (Eqiulibration এর) দিকে ব্রহ্মাণ্ডের ঝোঁক। পোটেনসিয়ালের ভেদ, প্রেসারের ভেদ, টেমপারেচারের ভেদ সব একাকারের দিকে চলিয়াছে। জাতি-কুলমান আর বুঝি রয় না। এই বিশ্বব্যাপী কর্মটির ফলে যা হয় হইতেছে—এক কিছু বিদীর্ণ বিশীর্ণ হইয়া আর যা এক কিছু হইতেছে, সেইটার নাম ভস্ম। এরও নানান্ রূপ, নানান্ নাম! উপনিষদ নিজেই বলিয়াছেন—সবই ভস্ম, সবই "ছাই"। তুচ্ছ, মিথ্যা বলিয়া নয়, আর এক অর্থে। তাই নয় কি? জল, মাটি, বাতাস, প্রাণী, অন্তঃকরণ—সবই ভস্ম নয় কি? এ সবই আবার বিশীর্ণ হইতেছে না কি? অবশ্য, ভাঙ্গার দিক যেমন আছে, গড়ার দিকও তেমনি আছে। গড়ার দিকে এর নাম সোম (অমৃত)। এ বিশ্ব মহাশ্মশান। শ্মশান-বিলাসী শিবের ভস্মই বিভূতি—অঙ্গভূষণ। কিন্তু ললাটে তাঁর সোম—সোমার্ধ। এ অর্ধেরও মানে আছে। যাই হোক—এই বিশুদ্ধ জ্ঞান দেহ, ত্রিবেদী দিব্যচক্ষু, সোমার্ধধারী মহাদেবকে আমরা অভিবাদন করি। শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হউক্।

সোম কথা

ভস্মের কথা বলিয়াছি। এইবার সোমের কথা বলিব। সোম লতা ছিলেন, পরে না কি চন্দ্রও হইয়াছিলেন—"ভেদিক্‌" স্কলারদের নিকট শুনিয়া আসিতেছি। বেদের মন্ত্রগুলি মন্ত্রণাপূর্বক পাঠ করিলে—বিশেষতঃ ঋগ্‌বেদের সমগ্র নবম মণ্ডলটি—সমস্যা ঘনাইয়া আসে মনে হয়। অর্থাৎ সোমকে সোজাসুজি লতা বা চন্দ্র, এ দুয়ের কোনটা ভাবা চলে না। আসল কথা প্রাচীনদের আধ্যাত্মিক মেজাজটি আমরা বুঝি না। তাঁদের ভাব বিশ্বাস যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে, সেই সমস্ত অনুষ্ঠান ব্যপদেশে তত্ত্বানুসন্ধিৎসা—এ সব আমাদের কাছে দুর্বোধ্য "হাইরোগ্লিফিক্‌স্" হইয়া রহিয়াছে। পাঠোদ্ধারের চাবিকাটি এখনও পর্যন্ত গরমিল। ডাক্তার প্রমথনাথ না কি ইণ্ডস্‌ভ্যালি সিভিলিজেশনের লিপি-উদ্ধারের নূতন সঙ্কেত বাহির করিয়াছেন। তাতে না কি প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের "শ্রদ্ধা" অনেক দূর গড়াইবে। পূর্বাপরপয়োনিধিতে অবগাহন করিবে। দেখা যাক্‌। কিন্তু প্রাচীন বিদ্যা (যেটাকে অনেকে "ম্যাজিক" বলিয়াছেন এবং সেই নামে ফাঁসিতে লটকাইয়াছেন) বুঝিবার সঙ্কেতটি কবে বাহির হইবে? সে বিদ্যা বর্তমান বিদ্যারই পরিহিত ফ্রক-ক্রীড়নকহস্ত শৈশবের মূর্তি নয়। সে বিদ্যা সাধনায় ও সিদ্ধিতে—স্বতন্ত্র বিদ্যা। এক বাজার চলন মাপ কাটিতে মাপা-জোকা হয় না; একই সেই বাটখারায় তৌল হয় না। এই কথাটি এখন বুঝিতে বাকি। বাকি বলিয়া সে কাল সম্বন্ধে আমাদের মন্ত্রণায় প্রায়শঃ যন্ত্রণাই সার হইতেছে।

আর্যরা সোমলতার রস খাইয়া স্ফূর্তি করিতেছেন; দেবতাদিগকেও দুচার পাত্র খাওয়াইতেছেন। সত্য কথা। কিন্তু ঋষিদের সোমতত্ত্ব ঐ লতার লালিত্য আর মাদকত্ব মাত্র নয়। সোমস্তুতি সেকেলে তাড়ির আড্ডার হল্লা নয়। সাধক সত্য সত্যই "কারণ" করিতেন কি না জানি না। বীরাচারে কৌলমতে বিধান আছে। কেন আছে তাহার সাচ্চা কৈফিয়ৎও আছে। তবে, তিনি যখন গাহিলেন—"সুরাপান করিনে আমি সুধা খাই জয়কালী বলে"—তখন তিনি সে সাধারণ সুরার কথা বলেন নি, তা' এই গানের অন্তরাতে আছে। প্রসাদ শেষকালে বলিতেছেন—"প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গের ফল মেলে"। অর্থাৎ মোক্ষ পর্যন্ত। সুরাকে "প্রতীক" করিয়া সুধাতত্ত্বের সাধন প্রাচীনকালের একটি ব্যাপক অনুষ্ঠান। খৃষ্টীয়ানদের "ইউক্যারিষ্ট" ও এ প্রসঙ্গে চিন্তনীয়। যাই হোক সুধা বা অমৃত-তত্ত্বই সোমতত্ত্ব।

এ বিশ্বভুবনের সবই ত ভস্মময়। সব কিছু দীর্ণ, শীর্ণ, জীর্ণ হইয়া ভস্ম হইতেছে যে শক্তিতে এই বিশ্বজারণ চলিতেছে তাহার নাম দিয়াছি বজ্র। বজ্রই রুদ্র, কাল,

শ্রম, মৃত্যু। বৃহজ্জাবালোপনিষৎ (দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ) ভস্ম ও সোমের তত্ত্ব অতি সমীচীন ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। ভূশুণ্ড নামে কাগের কথা আমরা শুনিয়াছি। শ্রুতিতে যোগবাশিষ্টে ইনি দেখা দিয়াছেন। একবার ইনি কালাগ্নি-রুদ্র সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন—"প্রভো, আমাক বিভূতিমাহাত্ম্য বলিতে আজ্ঞা হউক"। কালাগ্নিরুদ্র স্বয়ং এই বিশ্বশ্মশানের অধিপতি, তিনিই বিশ্বরূপ, বহুরূপ হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডভস্ম লীলাটি করিতেছেন। তিনিই পরম বজ্র। বজ্রের নানান্ অনুকল্প আছে, তাই পরম বজ্র বলিলাম। যাহাই হোক্—কালাগ্নিরুদ্র ব্যাখ্যান সুরু করিলেন। ভস্মের মূল পাঁচটি নাম শুনাইলেন—বিভূতি, ভসিত, ভস্ম, ক্ষার, রক্ষা। মহাদেবতার সদ্যোজাতাদি পাঁচটি বিগ্রহ হইতে এই ভস্মপঞ্চকের জন্ম শুনাইলেন। প্রত্যেকের মাহাত্ম্য কীর্তন করিলেন—"ভূশ-মৈশ্বর্যকারণাদ্ বিভূতিঃ। ভস্ম সর্বাঘভক্ষণাৎ। ভাসনাদ্ ভসিতম্। ক্ষারণাদাপদাং ক্ষারম্। ভীতিভ্যোঽভিরক্ষণাদ্রক্ষেতি"। ভস্মলেপনে শীতাতপ অনেক কীটপতঙ্গ অনেক রোগে হইতে সম্ভবত রক্ষা পাওয়া যায়। প্রাচীনেরা হাইড্রোপ্যাথির মূল সূত্র —"অপস্বন্তর অমৃতং অপ্‌সু ভেষজম্„—জানিতেন; ভস্মভৈষজ্য বিজ্ঞানও জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু সে কথা যাক্। একটি মজার কথা। চন্দ্রবাবাজী নাকি আগ্নেয়ভস্ম সারা কলেবরে মাখিয়া বসিয়া আছেন। এ ধরাধামে আগ্নেয়ভস্মের প্রয়োগ ত, আভ্যন্তরীণ—অন্য উদ্দেশ্যে। বাবাজী ভস্ম মাখিয়া রক্ষা পাইয়াছেন। আমাদের পৃথিবীর মত অক্ষাবর্তন (rotation) টি চাঁদের বুঝি নাই। তাই এক পক্ষ ধরিয়া তাঁকে এক পিঠে রোদই পোহাইতে হয়! একনাগাড়ে অত রোদ পোহাইলেন, বেজায় রুক্ষ হবার কথা। আবার এক পক্ষ কাল ছায়ায় গুটিশুটি হইয়া থাকিলেও ঠাণ্ডায় কালাইয়া যাবার কথা কিন্তু বাবাজীর ভস্মবিভূতি (খুব নন্ কন্‌ডক্টর) তাঁকে এই দুই ফ্যাসাদ থেকে রক্ষা করিতেছে। বাবাজী ভস্ম মাখিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। ভস্মের "রক্ষা" নামটি সার্থক হইয়াছে।

যাই হোক্—এবার আসল কথাটায় আসা যাক। ভূশুণ্ড কালাগ্নি-রুদ্রকে "অগ্নীষোমাত্মক ভস্মস্নানবিধি" শুধাইলেন। ব্যাখ্যানটি আদ্যোপান্ত শুনাইতে পারিলে হইত। অত লম্বা কোটেশনে ধৈর্য ধরিবে কি? চুম্বকে কহিতেছি। "অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একং ভস্ম সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ॥"—এক অগ্নি যেমন ধারা এই বিশ্বভুবনে নিগূঢ় রহিয়া নানাবিধ আশ্রয়ে নানা রূপ ধরিয়াছেন—নানা রূপে ব্যক্ত হইয়াছেন; ভস্মও সেইরূপ এক সর্বভূতান্তরাত্মা হইয়াও রূপে রূপে; কি না ঘটে ঘটে, সেই সেই রূপের অনুরূপ-রূপ ধরিয়াছেন; অথচ এইরূপে বহুরূপ, বিশ্ব-রূপ অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন। অগ্নি ও ভস্ম—এ দুই তত্ত্বকেই একবার সর্বভূতের, নিখিল রূপের "অন্তরাত্মা" (Indwelling Principle) ভাবে দেখা হইল; আর একবার সকলের অতীত রূপেও দেখা হইল। একবার ইনি বিশ্বানুগ

(Immanent), আবার ইনি বিশ্বাতিগ (Transcendent)। সকল রূপের মধ্যে রূপী হইয়া আছেন; আবার, কোন রূপেই ইনি পর্যাপ্ত, পরিসমাপ্ত হন নাই। এ ত দেখিতেছি—সেই ব্রহ্মেরই ধারণা। অগ্নিকে কলিকার অগ্নি ভাবিও না, আর, ভস্মকে কুলের ছাই ভাবিও না। অগ্নি "কলিজার" আগুন, ভস্ম "কুলোর" ছাই। অগ্নি শুধু তাপ (Heat) নহে, এমন কি বিদ্যুৎ (Electricity) বলিলেও ইঁহার অঙ্গ বিশেষেই হাত বুলান-ই হইল। বিদ্যুৎ চিজটি যে কি; তা বিজ্ঞানও জানে না। যদিও কার-বারে খুবই খাটিতেছে। বিশ্বশক্তির বাজারে এইটিই "কারেন্ট কয়েন্"; বিশ্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এইটিই মজুদী "বুলিয়ন্"। তবু অগ্নিরূপ ব্রহ্মের ইনি একটি পাদ মাত্র। আমরা বেদ ও বিজ্ঞানের আলোচনায় অগ্নি-পরিচয় লইতে যত্ন করিয়া-ছিলাম। অগ্নি শুধু ভৌতিক পদার্থ নন্। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে যে তেজঃ জন্মিল, সে তেজঃই অগ্নি এমন নয়। আরও তলাইয়া অগ্নিকে বুঝিতে হইতেছে। অগ্নিকে তেজঃ বলিয়াই বুঝিতে হইতেছে। অগ্নিকে যদি তেজঃ বলাই সাব্যস্ত হয়, তবে, মনে রাখিতে হইবে—সে অগ্নি বা তেজঃ তৃতীয় বা মধ্যম মহাভূতটি মাত্র নন। তৃতীয় বা মধ্যম হইলে আর "সর্বভূতান্তরাত্মা" হওয়া চলে কেমন করিয়া? সকল ভূতের রূপে তিনি রূপী; অথচ কোন রূপই তার নাগাল পায় না। বাউলের সেই বহুরূপীর গান শুনিয়াছ? অরূপের মাঝে লুকায় আবার সে কোন আজব বহুরূপী রে? অর্থাৎ যে তত্ত্বটি "ইতি" বলিয়া শেষ করিতে পার না; লক্ষণের পরিচয় গণ্ডীর ভেতর পুরিয়া রাখিতে পারি না। Undefined Inditerminate তাই বলিয়া তুরীয়, নির্বিশেষ, অলখ নিরঞ্জন "ব্যোম" করিয়াই ছাড়িয়া দিও না। তা হইলেও যে গণ্ডী টানিয়া দেওয়া হইল, চৌহদ্দীভুক্ত হইয়া গেল। চেতনে চৈতন্যরূপ, প্রাণীতে প্রাণরূপ, জড়ে ঐ "ইলেকট্রিক ফোর্স" বা ঐ রকম একটা রূপে—তিনি বিশ্বভুবনে "রূপং রূপং প্রতি-রূপো বভূব"। চেতনরূপে (Vehicle) তাঁকে বলি "আত্মা"। প্রাণীরূপে তাঁকে বলি "প্রাণ"। জড়রূপে তাকে বলিতেছি—ইলেকট্রিসিটি (ঈথার কথঞ্চিৎ গা ঢাকা দিয়াছেন সম্প্রতি)। ইংরাজি Spirit of the soul; ইনি Spirit of life; ইনি Spirit of matter. "Spirit" কথাটি এত ফলাও ভাবে চলিতেছে না; আমরা না হয় চালাইলাম। তেজঃ কথাটির তরজমা তা হইলে হইল Spirit।

এখন এই তেজস্তত্ত্বটিকে (পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যম পাণ্ডবটি শুধু ভাবিবেন না) আমাদের দেখার দিক্ থেকে কারণ রূপে দেখিতে পারি, আবার কার্য রূপেও দেখিতে পারি। যেমন কারণব্রহ্ম, কার্যব্রহ্ম। কারণ ভাবে দেখিলে ইনি অগ্নি, আবার কার্য(eff-ectual manifestation) ভাবে দেখিলে ইনি ভস্ম। কার্যকারণে ভেদ নাই। দেখার এপিট-ওপিট। যেমন আমরা হাতের আঙুলগুলো বাঁকাইয়া হাতের ঠোঙার পিঠটি তোমায় দেখাইতেছি। তুমি দেখিতেছ—উচু ঢিব (convex); আমি হাতের তেলো

দেখিতেছি—খাসা গর্ত (concave)। এই বিচারে যে অগ্নি, সেই ভস্ম। পোড়ানোর কর্তা রূপে অগ্নি; পোড়ানর উপাদান বা ফলরূপে ভস্ম। "অসকৃচ্চাগ্নিনা দগ্ধং জগত্তদ্‌ভস্মসাৎ কৃতম্। অগ্নের্বীর্যমিদং প্রাহুস্তদ্‌বীর্যং ভস্ম যত্ততঃ॥" জগৎটাই (অর্থাৎ যা কিছু চলিতেছে তাই) অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইতেছে। অগ্নির বীর্য (power as work কার্য) হইতেছে ভস্ম; সুতরাং এই চরাচর জগৎটাই ভস্ম—ভস্মময়। আমরা আগে বিজ্ঞানকে কাঠগড়ায় তুলিয়া যে জবানবন্দী লিখিয়া লইয়াছি তাতে এ তত্ত্বটি প্রমাণিত মনে করিতে হইবে। এটম থেকে আরম্ভ করিয়া বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে (সূর্যনক্ষত্রাদিতে) "দাহ" চলিতেছে। কোথাও কোথাও প্রবল তেজে খোদ এটম পর্যন্ত "জারিত ভস্ম" হইয়া যাইতেছে! অন্তর্দাহের কথা ভুক্তভোগেরা জানেন বিশেষতঃ সাহিত্যের সংসদে প্রাণীর দেহে দাহ মেটাবলিজমে: স্থূলতঃ জীবের জঠরে ভস্মকীটের কেরদানীতে। গাছের সবুজ পাতায় সৌরকিরণে ক্লোরোফিল হোম হইতেছে। কত আর নমুনা দিব? পৃথিবীর পাহাড় পর্বত সব জারিত হইতেছে; শুধু গরমে নয়, শীতে বর্ষায়, শিশিরে তুষারে। পৃথিবীর কুক্ষিদেশে ত এক রাক্ষুসে কটাহ টগবগ ফুটিতেছে। আগ্নেয়গিরিতে তার ছিটেফোঁটা বেরোয় ভূমিকম্পে সে ত উৎলে ওঠে। হোম যজ্ঞির ছড়াছড়ি। ঋগ্‌বেদও বলিয়াছেন; সংসারে সবাই সাগ্নিক অগ্নির বীর্য তাই ভস্ম। বীর্যকে সামর্থ্য (Power) হিসাবে দেখি, কিন্তু সেটি ফলের পরিচীয়তে। নয় কি? নিষ্ফল বীর্যের মর্যাদা নেই। কাজেই তার পরখ বা পরিচয় হইল ফলে (Workএ)। অগ্নির বীর্য সামর্থ্য রূপে দেখিলে তার নাম বজ্র। যেটি কিছু জীর্ণ শীর্ণ করিতেছে, করিতে পারে। হীরে পোড়াইয়া ছাই করিয়া দেখাইতেছে, হীরেও যা অঙ্গার (কার্বন)ও তাই। হীরা সজ্জা-বিলাসী অঙ্গারই (Allotropic Modification)। অমন তুষার কান্তি পুড়িলে অঙ্গার কান্তি! জার্মানী আবার কয়লা (Coal) জারিত করিয়া "মিশলী তৈল" (Synthetic oil) বানাইতেছে, লাখ লাখ টন ঐ "তরল ভস্ম" পয়দা হইতেছে। বর্তমান যুগটি না কি তৈল যুগ। মর্দনেও বটে, "ভক্ষণেও" বটে। তৈল নৈলে সবই অচল—স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে তেলের জন্য যত কামড়াকামড়ি। জার্মানীর নিজ ভাণ্ডারে তেমন খনিজ তৈল ছিল না। তেল উৎসবে, ব্যসনে, বিগ্রহে সমান দরকার। কাজেই, জার্মানীর ভাবনার অন্ত ছিল না। বাহির থেকে আমদানি বন্ধ হইলেই চক্ষু চড়কগাছ। এইবার কোলের তরল-ভস্ম বানাইয়া সে হিটলারি কলা বেপরওয়া সকলকেই দেখাইবে। এ সব জারণ-মারণের "বীর্য" হইতেছে বজ্র। অর্থাৎ বজ্রের কোন কোন রূপ, অনুকল্প। সে দিন যে ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরি জাঁক করিল—হাঁ, এইবার এটম ভস্ম করারও বজ্র আমরা বাহির করিয়াছি। সে বজ্রও রূপ একটি অনুকল্প। খুব জবর, রোখাল সন্দেহ কি? বোধ হয় ডেপুটি-বজ্র। বজ্র ফার্স্ট-ক্লাশ পাওয়ার। তার উপর স্পেশালও আছে। নিত্য গেজেট বাহির হইতেছে।

আচ্ছা, অগ্নি আর ভস্মকে মোটামুটি চিনিলাম। জগৎটা পরিণামী। বিকারী। বিকারে যেটি হইতেছে, সেইটিই ভস্ম। প্রকৃতি বা অমূল মূল একটা আছে কি? যেটি এই মহাভস্ম-লীলার মূল বস্তু বা উপাদান? যদি থাকে ত' সেইটে ভস্মের প্রকৃতি, মূল, Radix, মাদার-টিন্‌চার্। সেটি কি তা জানি না। সাংখ্য বলেন—প্রকৃতি, প্রধান, অব্যক্ত। নাম শুনিয়া কি হ'বে? এ কি সেই নাম, যে নামে তরা যায়? তা যদি না হয় ত', নাম চেয়ে কাম ভাল; কাম চেয়ে ধাম আরও ভাল। যে বস্তুটি "কাম" রূপে, দীক্ষা-রূপে, সঙ্কল্প-রূপে এই জগৎটা ঢালা-উবুড় করিতেছেন, তাঁর কি নাম আছে, কাম আছে, ধাম আছে? নির্বিশেষ-বাদী বলিবেন—"রাম বল, তাই আবার থাকে!" সবিশেষ-বাদী বলিবেন—"আছে বৈ কি। আরও কত কি! যা' চাবি তাই পাবি রে মন চিন্তামণির নাচ-দুয়ারে।" নির্বিশেষে "ব্যোম" সেই সানাইয়ের ভোঁ। একঘেয়ে রস জমে না। সুরের করতব্ না হইলে কি মিঠা লাগে রস উপযয় চিতে? অতএব সবিশেষ কথাই শোন। নামটি তার রস, কামটি তার রস; ধামটি তার রাসমঞ্চ, রসিকে তারাইয়া তারাইয়া আস্বাদ করিবেন, আমরা খাঁটি, বিশুদ্ধ রস ছাড়িয়া রস-আলাইএর শালায় গিয়া উপনীত হইব।

অর্থাৎ রসেরও বিকার আছে, ভস্ম আছে। বিকারে যিনি শুধুই মধুর, তিনি মধুরাদি হইয়াছেন। যেমন অগ্নি ও বজ্র "ডেপুটি" হইয়া বিদ্যুতাদি হইয়াছেন। উপনিষদ্ বলিতেছেন—"বিদ্যুতাদিময়ং তেজো মধুরাদিময়ো রসঃ। তেজোরস-বিভেদিস্তু বৃত্তমেতচ্চরাচরম্॥" তেজঃ আর রস এই ভেদটি আশ্রয় করিয়া চরাচর "বৃত্ত" কি না, বৃত্তিমৎ—চলিতেছে, জন্মিতেছে, বাড়িতেছে, জীর্ণ হইতেছে, শীর্ণ হইতেছে, মরিতেছে—ভস্ম হইতেছে। রসেরই নামান্তর সোম, অমৃত। জগৎটি তেজোরসময়—"স্থূলসূক্ষ্মেষু ভূতেষু স এব রসতেজসী"। তেজঃ=অগ্নি আর রস=সোম করিলে জগৎটা (স্থূল ও সূক্ষ্ম সবই) অগ্নীষোমাত্মক। শ্রুতি এই কথাটি বার বার ব্যবহার করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি। আচ্ছা, এ না হয় হইল। কিন্তু এ কি মজার কথা শুনি? অগ্নেরমৃতনিষ্পত্তিরমৃতেনাগ্নিরেধতে। অতএব হবিঃ···মগ্নীষোমাত্মকং জগৎ॥" অগ্নি বা তেজঃ থেকে অমৃত নিষ্পত্তি হইল; অমৃতের দ্বারা অগ্নি বাড়িল (এধতে)। এই অগ্নিষোমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডটাই সেই বর্ধিত, বর্দ্ধমান অগ্নিতে হবিঃ রূপে কল্পিত। ভিতরে যৌন-সঙ্কেত (Sex symbolism) আছে; প্রাচীনদের অত অশ্লীল অশ্লীল বাতিক ছিল না—তত্ত্বের ও তথ্যের ঘরওয়া বিচারে। বাহিরে লেফাফাদুরস্ত হইতেই হয়। যাই হোক্, সে সঙ্কেত সঙ্কেতই রহিল। আসল ব্যাপারখানা কি? তেজঃ ও রস, অগ্নি ও সোম—দুইটি পোলের মতন পরস্পরকে চেতাইয়া বাড়াইয়া তুলিতেছে। অরণিঘর্ষণের মতন। এ হোমে এ বিশ্বভুবনটাই আহুতি।

এ আহুতিটি যাঁরা বিশেষ করিয়া বুঝিতে চান, তাঁরা ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক

প্রভৃতি শ্রুতিতে পঞ্চাগ্নি বিদ্যার প্রসঙ্গটি দেখিয়া লইবেন। আসল কথা কোন এক মূল তত্ত্ব (নামটি, কামটি, ধামটি তাঁর অপ্রখ্যাত) অভিন্ন রহিয়াও যেন নিজেকে দুটি "পোলে" বা মিথুনে ভাঙ্গিয়া দেখাইতেছেন। আর সেই দুইটি "পোলে" বা মিথুনের সহবাসে নিখিল প্রজা সৃষ্টি করিতেছেন। শুধু সৃষ্টি কর্ম নয়, পুষ্টিকর্ম, রিষ্টিকর্মও বটে। এ সব কর্মে অগ্নি আর সোম, তেজঃ আর রস—এ দুই মিথুনের মিলন আছে। বৃহজ্জাবাল এ দুটিকে তন্ত্র শাস্ত্রের প্রধানতঃ শিবশক্তিও বলিয়াছেন। মূল বস্তুটিকে যদি তেজঃ বলি, তাহা হইলে শ্রুতি বলিতেছেন—তেজের দুইটি বৃত্তি। একটি রৌদ্রী (রুদ্ররূপা) ঘোরা (ভয়ঙ্করী)। এটি আমাদের পূর্বপরিচিত বজ্রমূর্তি। সকলেই বিশীর্ণ করিতেছেন ইনি। ফলে, সব ভস্ম—ভস্মময়। এঁর আর এক নাম অগ্নি। রৌদ্রীরূপে ইনি মৃত্যু, ইনি বিষ, ইনি কালকূট। কিন্তু বিশ্বে শুধু রিষ্টি (রিষ্ ধাতু) চলিতেছে এমন নয়। তিনি মাখামাখি করিয়া চলিতেছেন। এক কর্ম অপরকে নিষ্পত্তি করিয়া দেয়; সে আবার তাকে বাড়াইয়া, আগাইয়া দেয় (এধতে)। না গড়িলে ভাঙ্গা হয় না, না ভাঙ্গিলেও গড়া হয় না। ভাঙ্গন গড়ন জড়াইয়া এক পুরাকাম আমরা হিসাবের গরজে ছুরি চালাইয়া লই। রুদ্র রিষ্টিকর্ম করেন বটে, কিন্তু তিনিই আবার মৃত্যুঞ্জয়। তাই মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে তাকে ভজনা করিতে হয়—ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্। যিনি রিষ্টি করেন, তিনিই আবার হেমকুম্ভে সুধা ভরিয়া নিজেকে প্লাবিত করিতেছেন। বৃহজ্জাবাল তাই বলেন—অগ্নিবীর্য ভস্মকে সোমরূপ অমৃত প্লাবনে প্লাবিত করিতেছেন। এইরূপ প্লাবনে "কুতো মৃতিঃ?—মরণ কোথা? পাছে মরণ আর মারণ কর্মটি একেবারে রদ হইয়া যায় তিনি ললাটের সোমকে আধখানা বই পুরা প্রকট হইতে দেন নি। মরণ মারণ না হইলে, সৃজন (কথাটা চলিয়াছে) পোষণও সে হয় না। অর্থাৎ ভবের হাট উঠিয়া যায় যে! তাই শশীশেখরের মৌলিভূষণ সোম—সোমার্ধ। পুরা হইলে পূর্ণম্—অর্থাৎ অভয়, আনন্দ অমৃতত্বে পূর্ণস্থিতি—ব্রাহ্মীস্থিতি, যাতে অমৃতত্বায় কল্পতে। ফল কথা, মহাদেবের "অঙ্গে" ঐ "পোল" দুটি নানাভাবে মিশিয়াছে। ধ্যান খুলিয়া ও করিয়া দেখিবেন। এখন ঐ যে পুষ্টিকরি সোম, সেটি অমৃতময়ী শক্তি। কান্ত, শান্ত, মধুর। শাস্ত্র এ দুয়ের একটিকে ঊর্ধ্বগ, অপরটিকে অধোগ বলিয়াছেন। বিজ্ঞানের ভাষায় বলিব একটা পজিটিভ, অপরটা নিগেটিভ্। তন্ত্রের ভাষায়—এক শিব অপর শক্তি। এই সোমও বিশ্বে—স্থূলে, সূক্ষ্মে, সর্বত্র—ওতপ্রত। এই কারণে বিশ্ব যে শুধু যে শ্মশান, এমন নয়; বিশ্ব ব্রজধাম—আনন্দবন। পুষ্টি বর্ধন করে বলিয়া ঊর্ধ্বশক্তিময়ং সোমঃ"; আর বিশীর্ণ করে, reduce করে, ভস্ম করে বলিয়া অধঃশক্তিময়োঽনলঃ"। তাভ্যাং সংপুটিতস্তস্মাচ্ছশ্বদ্বিশ্বমিদং জগৎ"। এই ঊর্ধ্বশক্তির সংপুটিত ক্রিয়া নিত্যই এই জগৎ, কিনা, চলিতেছে। সংপুটিত ক্রিয়া—combined, resultant action। এটমের ভিতরে একটা কেন্দ্রানুগ একধা টান, আর একটা কেন্দ্রাভিগ (centrifugal)

টান রূপে হাত ধরাধরি করিয়া এটমের এটমত্ব নির্বাহ করিতেছে। এ দুয়ের কোনটি নৈলে চলে না। ইলেকট্রন পাক খাইতেছে, লাফ মারিতেছে, সময় সময় পলাতক হইতেও চাহিতেছে। সহজে পালানোর যো নাই! কেন্দ্রস্থ কর্তাটির টান এড়ানো সহজ নয়। প্রায়ই দেখি এটম তার নিজস্ব বীজসংখ্যা (atomic number) টি বজায় রাখিয়া যাইতেছে। এটমের ঘর বড় একটা ভাঙ্গে না। মোটেই ভাঙ্গে না এমন নয়। ঘরে "আগুন" ধরিয়াছে সর্বত্র। তবে রেডিও-একটিভ গোটাকতক ভূতে আগুন হইয়াছে আগ্নেয়গিরি। এটম ভস্ম হইয়া উড়িয়া যাইতেছে reduced হইতেছে; আর কিছু হইতেছে। সাধারণ রাসায়নিক কারবারে এটমের ঘর আস্ত থাকিতেই দেখা যায়। তবে, বেজায় জবর আগুন হইলে আস্ত থাকা মুস্কিল। সৌরমণ্ডলের অভ্যন্তর ভাগে অনেকানেক রোখাল তারায় বোধ হয় এটমদের ফায়ার প্রুফ ঘর পুড়িয়া যাইতেছে। এটম যেন জড়ের দেশে খাণ্ডব দাহন করিলেন। যার তার কর্ম নয়। আবার, এটম কোন গতিকে যদি বা ভাঙ্গে, তার ঘরের সব কিছু কি রক্ষা তাঁর মন্দাগ্নি দূরীকরণে স্বাহা-বিনিযোগ করিতে পারিবেন? এখনও ত' বিজ্ঞান বলে ইলেক্‌ট্রনের ম্যাস ও চার্জ পাকা-ঘুঁটি' অর্থাৎ ভাঙ্গিবে না; কোয়ানটীনও (যার কুলশীল আগের বার জানিয়াছি) পাকা ঘুঁটি অর্থাৎ তার পুঁটুলি খুলিবে না। আরও কেউ কেউ আছেন। এঁরা সব আকাট সত্য—brute facts, আচ্ছা এরা কি খাণ্ডব দাহনে বাঁচিয়া যাইবেন? পার্থসারথি কি এই সব "পাকার" পাকামি শেষ পর্যন্ত বরদাস্ত করিবেন? রায় শুনিবার জন্য উৎকর্ণ রহিলাম। দেশ বা স্পেস্ ত' রেলেটিভিটির আগুনে বেজায় বাঁকিয়া গিয়াছে। শক্ত পাল্লা—নুইবে, কিন্তু ভাঙ্গবে না। দেখা যাক্। কাল বা টাইম ত' স্পেসের ঘাড়ে চাপিয়া তার "তরীয়" হইয়াছেন, তাতে মিশ খাইয়াছেন। তাঁর কি এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে? বাঁকে-বিহারী বাঁকাশ্যামের মুল্লুকে তিনিও বাঁকা হইবেন না? বিজ্ঞান খত'মত' খাইতেছে। কিন্তু সবুর কর—দেখা যাক্। কালের মেওয়া ত' ফলিবে। এ দেশ ত' কালকেও বাঁকাইয়া ঘুরাইয়া লইয়াছেন, স্পেসেরই মত। তাহা হইল যুগ মন্বন্তরাদি চক্র—সাইক্ল। কাল কালীও বটে, কালাও বটে। দুইই বঙ্কিম। উর্ধ্বশক্তিতে খাড়া সোজা হইতে যায়, কিন্তু অধঃশক্তিতে ঠিক সোজা হইতে দেয় না। এই উর্ধ্বাধঃশক্তিসংঘাতে বিশ্ব চলিতেছে। শ্রীরাধা বামে বলিয়া শ্যামসুন্দর বাঁকা মদনমোহন হইয়াছেন, নৈলে শারী বলে—শুধুই মদন।

এটমের দরবার ছাড়িয়া এবার মলিকিউল প্রভৃতির দরবারে আসা যাক্। মলিকিউল দুই চারিটা এটমের ঘরকন্না। রাবণের গোষ্ঠীও আছে। এ ঘর নিত্য ভাঙ্গিতেছে, নিত্য গড়িতেছে। রসায়ন বিদ্যা এদের জন্য রীতিমত "প্রজাপতি অফিস" আবার "ডিভোর্স কোর্ট" বসাইয়াছেন। এক পত্নীক, দ্বিপত্নীক ত্রিপত্নীকও কেহ কেহ আছেন। মনোগ্যামই যে চল' এমন নয়। একটি অক্সিজেন দুইটী হাইড্রোজেনের সহিত সাঙ্গা পাতাইয়া দিব্য "জল" হইয়া আছেন। একটি সোডিয়াম কিন্তু ক্লোরিয়ামের একটি পক্ষই করিয়াছেন

আমাদের খোরাকী নিমকে—যে নিমক-কানুন তোড়বার জন্য মহাত্মাজী দাণ্ডী অভিযানে বেরিয়েছিলেন। বেশী নমুনা দিতে হইবে না। এ সব "দানা"র দেশে ঘর ভাঙ্গাভাঙ্গি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বড় বড় দানাদার যারা, তাদের ঘর সদাই ভাঙ্গ ভাঙ্গ, অবশ্য সব দানাই মিহিদানা। চোখে "সর্ষপ কা ফুল"—ও দেখিতে হয় অবস্থাবিশেষে কিন্তু এই দানাদারের দানা, তস্য দানা বড়ই কনীয়সী, "কুণো"—দেখা দেন না। তবু আমরা এদের হিসাব রাখি। মাপ লইয়া রাখিয়াছি, "ফটো" বানাইয়াছি। ফটো বিনিময়েই প্রজাপতি আফিসের কারবার চালাই। যাই হোক্ এখানেও অগ্নি, এখানেও ভস্ম। সূর্যাগ্নিতে সাগরের জল বাষ্পরূপে ভস্ম হইল। সেই বাষ্প আবার অগ্নিগর্ভ হইয়া (ions নিউক্লিয়াস করিয়া) মেঘরূপে ভস্ম হইল। সেই মেঘভস্ম বৈদ্যুতাগ্নি সহযোগে জল ভস্ম রূপে বৃষ্টি হইল। কিন্তু ভস্মে সোমও (যাতে ক'রে পুষ্টি) থাকে। বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ। বৃষ্টিতেই পুষ্টি। সূর্য তাই পূষা : ইন্দ্র বৃষ ; পর্জন্যও তাই। সর্বত্রই ভস্মের সঙ্গে সঙ্গে সোম আছে। এটমে সোমশক্তি তাকে পোষণ ও পালন করিতেছে—ভাঙ্গিয়া সহজে ভস্ম হইতে দিতেছে না। এটম্ অগ্নীষোমাত্মক। মলিকিউল প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত মোটা মোটা বস্তুতেও ঐ পোষণ ও পালন কার্যটি চলিতেছে। তাই তারা নিত্য ভস্ম হইতেছে, অথচ কোন গতিকে টিকিয়াও আছে। সব তাতেই সোম পূষা হইয়া রহিয়াছেন। সব তাতেই অমৃত ক্ষরণ করিতেছেন। তাই তারা মরিয়াও মরে না ; মরিয়াও একভাবে রহিয়া যায়। প্রাণীতে এই পূষা বা সোম আরও "প্রকট"। প্রতি জীবকোষ নিত্য ভাঙ্গন-গড়ন চলিতেছে ; যেটী ভাঙ্গিতেছে, তার পোষণ ও মেরামত হইতেছে। ইহাই মেটাবলিজম্। ভাঙ্গনের মুখে শ্রম, অবসাদ, ক্ষয়, মৃত্যু ; গড়নের মুখে স্বস্তি, পুষ্টি, তুষ্টি, ঋদ্ধি।

কালীর বাম দিকে খড়্গ, মুণ্ড ; দক্ষিণে বর অভয়। নারায়ণের শঙ্খ, পদ্ম, গদা, চক্র। খাদ্যের যেটি "প্রাণ" সেটিকে আমরা "ভিটামিন" বলিতেছি। এটি সোম বংশীয়। শরীরে হর্‌মোন্ পোষণাদি নির্বাহ করিতেছে। তাই বুড়া হইলে আমরা "থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডস্" খাইতেছি। যোগীরা ষট্‌চক্রে সোম বা অমৃতের দোহন করিতেন। শ্রুতি বলিতেছেন—"হিরন্ময়ো বেতসো মধ্য আসাম্। তস্মিন্ সুপর্ণো মধুকৃৎ কুলায়ী। ভজন্নাস্তে মধু দেবতাভ্যঃ। তস্যাসতে হরয়ঃ সপ্ততীরে। স্বধাং দুহানা অমৃতস্য ধারাম্॥" এক সোমার পাখী আজব বাসা বাঁধিয়াছে। সে পাখী "মধুকৃৎ"—মধু তৈয়ারি করে। মধু তৈয়ারী করিয়া দেবতাদের বাঁটিয়া দেয়। তার তীরে সাতটি "হরি" দেখিতেছি এক মজার কাণ্ড করিতেছেন—স্বধা (স্ব+ধা) নামক অমৃতের ধারা দোহন করিতেছেন। এই সুপর্ণ হিরন্ময়টিকে চিনিয়াছ ? নিখিলের অন্তরাত্মায় যিনি রসরূপে, মধুররূপে, মধুকৃৎ রূপে বিরাজ করিতেছেন। আমাদের মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি সকল "দেবতাই" সেই মধুচক্রের মধু ভাগ করিয়া ভোগ করিতেছে। ভাবিয়া দেখ—তাই নয় কি ? আর সেই "সপ্তহরি"

কে যাঁরা সুধা দোহন করিতেছেন? এরা ভূর্ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি সপ্তলোক বা সপ্ত ব্যাহৃতির বা গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্তছন্দের অধিষ্ঠাত্রী সপ্ত দেবতা বা ঋষি। তান্ত্রিকেরা বলিবেন—স-সহস্রার সপ্ত চক্রে অধিষ্ঠিত সপ্ত শিব—হর বা হরি (একই কথা)। এঁরাই এই "যন্ত্রে" সুধা চোলাই করিতেছেন, শোধন করিতেছেন। মধুকৃৎ যিনি তাঁর "কারণের" করণ হইতেছেন এরা। অগ্নি বা ভস্মশক্তি এই সুধা বা অমৃত ধারা শোষণ করিয়া লইতেছেন। তাই জরা, তাই মৃত্যু। শোষণটি শেষ করিতে পারিলে পোষণ। যাই হোক্—কার্যত শোষণ পোষণ দুইই চলিতেছে। বিষয়ে বিষ—সেও অমৃত তার ভিতরেও সোমশক্তি আছে। সূর্য কিরণে আলট্রা—ভাওলেট্ রেজ—কত না দামী। ঋষিরা বলিয়া গেছেন—"মধু ক্ষরতি তদ্রসম্। সত্যং বৈ তদ্রসম্।" তাঁর কিরণ রস মধু ক্ষরণ করে সে রস সত্যই আর নিখিলে ওতপ্রোত মাধ্বী ধারা ত ঋঙ্ মন্ত্রেই উদ্ঘাটিত—মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোসধীঃ মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ; মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥"

মন্ত্রে যে মধুকে আবাহন করা হইল, সে মধুর পরিচয় আমরা কিঞ্চিৎ লইলাম। মধুর পরিচয় মুখে, কি না, আস্বাদে লইতে হয়; কানে নেওয়া হয় না। কানে যদি বা নাও, কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিতে দিতে হবে যে! মধু বা মধুরের যেটি পূর্ণ, নিরতিশয় তত্ত্ব, সেটিকে আমরা ধীরে ধীরে চাওয়াইলাম। রসিকে বুঝিয়া লইবেন। বিজ্ঞানের "গ্রাম্য ভাষা" শুনিয়াছেন, প্রজ্ঞানের "বজ্রবুলিও" শুনুন।

মধু, মধুর বা সোমের বাহন কে? ছন্দঃ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গায়ত্রী গিয়া সোম আনিয়াছিলেন না? ছন্দঃ শিঙ্গাতে বাজে—তখন হয় ভস্ম। তখন শিঙ্গা ফুঁকিতে হয়। ছন্দঃ মুরলীতেও বাজে—তখন পায় মরাতে জীবন, যেমন কালিয় হ্রদে। ছন্দের তাল রুদ্র হইলে আগ্নেয়-ছন্দঃ। মধুর হইলে সৌম্যছন্দঃ। সৌম্যছন্দঃ ও যা মধুচ্ছন্দঃ ও তাই। রুদ্রছন্দঃ বা ঘোরছন্দঃ হইতেছে চণ্ডচ্ছন্দঃ বা প্রচণ্ডচ্ছন্দঃ। সেটী আমরা ভাবি বেছন্দ। কিন্তু কানু ছাড়া যেমন গীত নেই, ছন্দ ছাড়া তেমনি কর্ম নেই। ছন্দের সম্বন্ধ নানা রকমের। কোন দুই ছন্দ বেশ মেলে। একটী অপরের পূরণ হয়, মণ্ডন হয়, পুষ্টি হয়। আবার কোন ক্ষেত্রে ছন্দে ছন্দে অরিসম্বন্ধ। একে অপরকে ঘা দেয়, ভ্রষ্ট করে, খণ্ডন করে, নষ্ট করে। মোটামুটি মিত্রছন্দঃ আর অরিচ্ছন্দঃ। সঙ্গীতে বর্ণ সন্নিবেশে এই ছন্দ সম্বন্ধ মানিয়া চলিতে হয়। ফুরিয়ার প্রভৃতি গণিতজ্ঞেরা, হেলম্ হোলজ্ প্রমুখ পদার্থ-পারদর্শীরা এইসব সম্বন্ধের ভৃগুসংহিতা গণিয়া রাখিয়াছেন। প্রাণে ও মনেও ছন্দঃ কম যান না। প্রবন্ধের শেষে দ্বন্দ্বের কথাটি পাড়িলাম মাত্র। ভবিষ্যতে আর একদিন বলিব। এখন মোদ্দা কথাটা এই যে; এটমই হোক্, স্থূল ভূতই হোক, জীবকোষই হোক আর অন্তঃকরণই হোক—তাদের প্রত্যেকের কতকগুলি রুদ্র বা ঘোর ছন্দঃ আছে, আবার কতকগুলি মধু, সৌম্য ছন্দঃ আছে। রুদ্র ছন্দঃ তাকে ভস্ম করে।

মধুচ্ছন্দঃ পালন করে, পোষণ করে। রুদ্রচ্ছন্দে মিতালী ; রুদ্রচ্ছন্দে মধুচ্ছন্দে বৈপরীত্য। মোটামুটি তাদের অরিমিত্র সম্পর্ক। মিত্রে মিত্রে বৃদ্ধি—ভাঙ্গনই হোক আর পোষণই হোক্। অরিতে অরিতে সঙ্ঘর্ষ—interference ; তার ফলে—defraction deflection ইত্যাদি।

এখন ধর ঈথারে বা আকাশে সব কিছু ভূতের মূল উপাদানটি আছে। যদি উপযুক্ত মধুচ্ছন্দঃ সৃষ্টি করিতে পারা যায় ; তবে সে ছন্দঃ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যেমন) সোম আনয়ন করিবে। অর্থাৎ কোন কিছু গড়িয়া তাকে পালন ও পোষণ করিবে। সেই হেলমহোলজ্ স্পেনভিন্ কারদিনের ঈথারে ভরটেক্সরিং অথবা আরও পরে, লারমরের "ইনট্রিনজিক স্ট্রেন সেন্টার" এর কথা একবার ভাবিয়া লউন। যে মধুচ্ছন্দঃ উপযুক্ত ভাবে সাজান' স্পন্দনে (hormonic motion-এর) সৃষ্টি ছাড়া আর কি? সেই সৃষ্টি ও পুষ্টি শব্দমার্গে (আলোকস্পন্দনে নিয়ন্ত্রণ দ্বারা) ও হইতে পারে। এই উপায়ে আন্দার কোন কিছু পয়দা করা সম্ভবপর। বিজ্ঞান "না" বলিবে না। "কিন্তু" করিবেন, কার্যতঃ হইল বা হইতেছে কি না, এটা পরখের জিনিষ—imposible in theory নয় ; qnestion of fact।

সমুদ্রমন্থনও এই দৃষ্টিতে ছন্দোবন্ধনের ব্যাপার। মন্দরকে একাসিস্ করিয়া, বাসুকিকে "রজ্জু" করিয়া এটা একটা Hormonic motion সৃষ্টি। কোথায়? জগতের সেটা উপাদান,—stuff, তাতেই। মন্থনে সব কিছু উঠিতেছে। সোম বা অমৃত উঠিলেন ; বিষ বা কাল বা মৃত্যুও উঠিলেন। সোমের বাঁটোয়ারা করিতেছেন দেবতারা। "ভজন্নান্তে মধু দেবতাভ্যঃ" কিন্তু সেয়ান "সাধু" দেবতাদের পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া বেমালুম সুধার পাতরা মারিলেন। কিন্তু ধরা পড়িয়া গেলেন। তখন, গর্দান দিতে হইল। কিন্তু সুধা মারিয়াছিলেন, মরিলেন না। বাঁচিয়া রহিয়া এক কর্ম করেন—অগ্নি (সূর্য) আর সোম (চন্দ্র) এ দুটিকে গ্রাস করেন। করেন কিন্তু হজম করিতে পারেন না। উগ্‌লাইয়া দিতে হয়। এঁরা দুইটি হইলেন "ধড়" ও "মাথা"। অরিচ্ছন্দঃ এ দুটি। সূর্য ও সোম আপোষে এ সংসার চালাইতেছেন। ফলে, শোষণও হইতেছে পোষণও হইতেছে। শোষণে পোষণ, পোষণে পোষণ হইতেছে। মারণ জীবন দুই-ই চলিতেছে। এদের আপোশে বা ঐ co-ordinationটার ঘা দিতে চায় ঐ অরিবৃন্দঃ। কিছু ঘা দেয়ও। গ্রহণের কালে পৃথিবীর inosphere-এর গোলযোগ হয় ; সূর্যের ultra-violet rays সরবরাহ বাধা পায় ; ইত্যাদি, ইত্যাদি। বিজ্ঞান এ "মাথামুণ্ডুর" সূক্ষ্ম হিসাব লইতেছেন। হিসাব বাহির হোক্—তদ্দিন আমরা ভস্ম ও সোম কে, আর তাদের ছন্দঃই বা কে, মনে রাখিব কি?

সাক্ষী-খবর

"এ চেতন, ওটা জড়; এর প্রাণ আছে, ওর নেই—এ হিসাবটা আমরা সকলেই বিনা অডিটে মেনে নিয়েছি। এ হিসাব ধরে আমাদের সাধারণ কারবার চল্‌ছে সন্দেহ নেই। তবু এ হিসাব আসলে কাঁচা হিসাব। সত্যলোকের কাছারীতে "পাকা খাতায়" এ হিসাব ওঠবার যোগ্য নয়। স্বভাব, স্বরূপ, তত্ত্ব—এ কথা কয়টা আমরা ত' কারবারেও খাটাচ্ছি। কিন্তু এ হচ্ছে কেমন ধারা—যেমন ধারা সোনার পাথর বাটি। আমাদের কারবারের মূল বন্দোবস্তের ফলেই স্বভাব ঠিক স্বভাবে, স্বরূপ ঠিক স্বরূপে, তত্ত্ব ঠিক তাই হ'য়ে এখানে খাটতে পারে না। সেই মূল বন্দোবস্তের জন্য আমাদের সর্বদাই কাটা-ছাঁটা ক'রে, বাদ-সাদ দিয়ে নিয়ে, বাছাই করে নিতে হচ্ছে। সমগ্র যেটা, আসল যেটা, সেটাতে আমাদের প্রয়োজন নেই। টুকরো যেটা, ভেজাল যেটা, সেইটেই আমরা চাই। সেইটে নইলে আমাদের কারবারই চলে না যে। আমরা যে সকলে মিলে "ধাপার মাঠের" ইজারা নিয়েছি। যত ছেঁড়া, ফাটা, রদ্দি, নোংরা জিনিষ কোথেকে গাড়ী বোঝাই হ'য়ে মাঠে এসে পড়ছে; আমরা তাই সব নিয়ে কারবার কর্‌ছি; সময় সময় কামড়া-কামড়ি কর্‌ছি। "ধাপার মাঠের" সঙ্গে তুলনা দিচ্ছি ব'লে কেউ যেন মনে না ভাবেন—সংসারটা একটা বিতিকিচ্ছি নোংরা জিনিষ; সেখানে নাকে কাপড় দিয়েই আমাদের কাটাতে হচ্ছে। তা নয়। অন্য "লোক" হ'তে কেউ বা হয়ত' এটাকে রাবিশের রাশরূপে দেখে থাকেন, আর এর দুর্গন্ধে নাকে কাপড়ও দিয়ে থাকেন। বৈরাগীর আখড়াগুলো থেকে নারী "নরকস্য দ্বারং" আর সংসারটা "সংসারকূপমতিঘোরমগাধমূলং" এই ভাবে বোধহয় আসছে, আসবেও। কিন্তু আমরা যারা এ কারবারে রয়েছি, তাদের এতে রসবোধ, প্রেয়োবোধ, এমন কি শ্রেয়োবোধেরও অভাব নেই। এ বোধের মূলে কোন "বস্তু" নেই, এটা একদম ভুয়া, ফাঁকা—এমন না হ'তেও পারে। বেদের ঋষি যে "মধু"কে সর্বভূতে, সর্বপ্রাণীতে ওতপ্রোত দেখে গেছেন, সে মধুক্ষরণ কি আমাদের এই "ধাপার মাঠে" বাদ পড়েছে? তা ত নয়। মধু নৈলে যে কারবারই চলে না। ছেঁড়া ন্যাকড়া। আর নোংরা রদ্দি মালের কারবার করি—আর যাই করি, আসলে এটা মধুর কারবার। আমাদের সকলেরই রসের পশরা; রসেরি বিকিকিনি। রস=interest। জীব সত্যই "মধুকৃৎ-কুলায়ী"। ইন্দ্রিয়গ্রামকে আর ইন্দ্রিয়গ্রামের রাজা যে মন তাকে সে এই মধু "ভাগ" ক'রে বেঁটে দিচ্ছে—"ভজমাস্তে মধু দেবতাভ্যঃ"। অথবা তাদের কাছ থেকে মধুর "ভাগ" আদায় করে নিচ্ছে। সকল ইন্দ্রিয় মিলে অহরহ প্রাণের কাছে "বলি" আহরণ করছে—

এমন কথা শ্রুতিতে আছেও। "মধুকর রাজানং মাক্ষিকবৎ"। তবে প্রাণই বেঁটে দিক ওদের। ওরাই প্রাণকে এনে দিক—কথাটা দুদিক থেকেই ঠিক। কারবারের বন্দোবস্তে অথবা বেবন্দোবস্তে, সে মধু গেঁজেও উঠছে। ঝাঝালো হ'য়েও উঠছে, উগ্র, তীক্ষ্ণ, মাতালকরা হয়েও উঠছে। তবু ওটা মধুই। যে মধু বা রস স্বরূপে, স্বভাবে, তত্ত্বে "ভূমা" "সুখ" সে মধু কৃপণ হ'য়ে গেছে, কুষ্ঠিত, বিকৃত—ভেজাল হ'য়ে গেছে। কারবারের ধারাই তাই। এ ধারা উল্টে নিতে হবে—স্বরূপে, স্বভাবে, তত্ত্বে, ভূমাতে, আনন্দে ফিরতে গেলে। ধারা উল্টালে কি হয়? রাধা হয়? এখন বুঝে দেখ, যে বা হও মরম-সন্ধানী। আমি ভাঁটার টানেই এখন ভাসতে চলেছি। আমার উজোন টান এখন ধরলে চলে না যে! ধাপার মাঠেই ফিরে আসি।

বিতিকিচ্ছি নোংরা করে দেখবার জন্য ধাপার মাঠে হাজির করি নি। ধাপার মাঠ কেন গো? ভাব না—রসের বাজার। মধুর হাট। এ বাজারে পশরা নিয়ে, এ হাটুরে হ'য়ে এসেছি তুমি আমি। কিন্তু তুমি কে বট হে? আমিই বা কে? স্বভাবে, স্বরূপে, তত্ত্বে কি বা কে জিজ্ঞাসা করছি না। এ হাটের হট্টগোলে সে কথা শুধায়ই বা কে, তাতে কানই বা দেয় কে? কারবারী তুমি, আমি বার্তাই নিচ্ছি। এখন বল দেখি, তুমি কে? তুমি নিজেই তা জান না, আমায় তা জানাবে কি করে? ষ্টেশনে কুলি তার নম্বর দেখিয়ে মাথায় মাল তুলে নেয়। তোমারও একটা নম্বর বা "লেবেল" আছে বটে। সেই লেবেলেই তুমি কারবারে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কিন্তু লেবেলের তলে, পোষাকের নীচে একটা মানুষের নাড়ীও স্পন্দিত হচ্ছে নয়? সে মানুষটি তিন মহল, পাঁচ মহল, সাতমহল পুরীতে নাকি বাস করেন। শ্রুতি সে মহল গুলোকে কখনও বা শরীরত্রয়, কখনও বা পঞ্চকোষ, কখনও বা সপ্তলোক, সপ্তভূমি ইত্যাদি করে বলেছেন। তিনি "মুঞ্জার অভ্যন্তরস্থিত ঈষীকা"টির মত সেই "পুরুষ" (যিনি নাকি পরে শুয়ে আছেন) কে খুঁজে বের করতে বসেছেন। তিনি যে স্বরূপসন্ধানী, তত্ত্বান্বেষী। তাঁর কাছে মুখোস, লেবেল এ সব চলবে না। লুকোচুরি, ভাঁড়াভাঁড়ির কারবারও চলবে না। কাজেই তিনি বুক ঠুকে, ডঙ্কা মেরে মহলের পর মহল পেরিয়ে একেবারে খোদ আসলটিকে চেপে ধরবেন। "আত্মা অরে দ্রষ্টব্যঃ" তা তিনি ধরুন গে যদি পারেন। আমরা লুকোচুরির মহলগুলোতেই একবার উঁকিঝুঁকি মেরে আসি ততক্ষণ। ঐ যে—কে তুমি অমন ক'রে আপনভোলার সাজে বেড়াচ্ছ হে? তুমি পুরুষ কি প্রকৃতি, নর কি নারী—তাও ত' ঠিক পাই নে। তবে যে সাজেই সাজ, আর যে চালেই চল—একটা সাজ, একটা চাল তোমার ভুল হবার যো নেই। তুমি "মধুকৃৎকুলায়ী—ভজন্নান্তে মধু দেবতাভ্যঃ"। তুমি মধুকর, মাধুকরী ক'রে মধুচক্র তৈরি করছো, আর যারা অনুগত, যারা "আপন" তাদের বেঁটে দিচ্ছ। আবার তাদেরটাও বেঁটে নিচ্ছ। কীর্তনের গানে সেকেলে "আকর" দিত—শ্রীমতী কিঙ্কিনী ব'লে কিং কিনি।

এ রসবাজারে আমি কিং কিনি—আমি কিন্‌বো কি হে? তোমার ও নিতুই সেই দশা। এ রসবাজারে (যেটাকে ধাপার মাঠ ব'লে একটু আগে ঘেন্না ধরিয়ে দিচ্ছিলাম) তোমার নিতুই নব আকুতি—কিং কিনি—আমি কিন্‌বো কি হে রসের ব্যাপারী? রস কি আবার একঘেয়ে, একই রকম? এর বৈচিত্র্যের বালাই লয়ে মরি। অলঙ্কার শাস্ত্র আর ভক্তিশাস্ত্র—তার কয়টারই বা খবর দিচ্ছেন! বিচিত্র রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, শব্দে, আর অন্তরের অশেষ আস্বাদনে, সে অশেষ বিধায় লীলায়িত রসে অপূর্ব পরিচয় উপভোগ হচ্ছে। তাতে অশ্রু আছে, হাসি আছে; ব্যথা আছে, সান্ত্বনা আছে; ভয় আছে, ভরসা আছে, বিরহ আছে, আশাও আছে; নেই কি? সেই শ্রুতির আজব গাছে দুটো সোনার পাখী: ভারি ভাব তাদের; ছাড়াছাড়ি নেই। একটা কত কি ফল খাচ্ছে; কখনও খুসী, কখনও বেজার; কখনও রাজী, কখনও নারাজ। আর একটা? কিছু খায় না—চুপচাপ দেখ্‌ছে তার সখাটির সাধের আজব খেলাটি। মজা লুটছে কে বল ত? যে খেলছে, না যে না খেলে শুধুই দেখছে? কেউ বলবেন—ঐ উপরের ডালের আত্মারামটি। কেউ বা বলবেন—তা'হবে, কিন্তু খেলুড়ের খেলাটাই বা মন্দ কি সে? ঐ খেলার জন্যই ত' এই আজব গাছটা পয়দা হ'ল, তাতে কত ডালপালা হ'ল, তাতে আবার কত পাতা, ফুল, ফল হ'ল! গীতা তাই না এটাকে "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং" বলতে পেলেন; এর ডালপালা ফুল ফলের খবর দিলেন; এটাকে কাটবার ফিকির ও বলে দিলেন। "অসঙ্গ শস্ত্রেণ—"। নৈলে—কা কস্য পরিবেদনা!

ধাপার মাঠ-টাকে এই রকম ক'রে যদি কেউ বালীগঞ্জের লেক অঞ্চল বানিয়ে নিতে পারে। ত' মন্দ কি! তবে যাই কর না কেন, এটা ভুল্‌লে চলবে না যে—এটা অগুণ্‌তি মধুকরের এজমালি মধুচক্র; সকলকেই তিল তিল ক'রে মাধুকরীতে মধু আহরণ করতে হচ্ছে; কামাই নেই, ফুরসুৎ নেই; আর সে মধু তিল তিল করেই আবার বেঁটে নিতে হচ্ছে। বিশ্বভুবনে ওতপ্রোত যে মধু বা রস—সেটা হচ্ছে ভূমা, সুখ, আনন্দ—সেটা তিল তিল হ'য়েই, অল্প অল্প হয়েই আমাদের এই মধুর কারবারে খাটছে। ভূমাকে নিয়ে মাধুকরী হয় না; ভাগ বাঁটোয়ারা ও হয় না। এই গেল এক কথা। তারপর কারবারে চলছে যে মধু—সেটাই কি আসল, খাঁটি বস্তু? সকলেই ত' উনার হ্রদের খাঁটি বিশুদ্ধ পদ্মমধুর বিজ্ঞাপন ছাড়্‌ছি; কিন্তু আসলে সেটা কি? এ থেকে এক চুমুক, ও থেকে এক চুমুক—এই রকম করে শুচি অশুচি কত যায়গার। কত ভাল মন্দ "বিষয়ে" যে অহরহ সদর গোপন চুমুক মেরে আমার রসের থলিটি ভ'রে নিয়ে আস্‌ছি। তার ঠিকানা নেই। পাঁচ মিশালী, শত মিশালী, শত সহস্র মিশালী আমার এই মানস হ্রদের ডগায় সংলগ্ন মধুরত্তি! তাছাড়া, মনের নিজের "সরস" "সুধামৃত"ও একটা নেই কি? মন যে ভাবে তার মাধুকরী করছে, সেই ভাবের

"ভাবনা" দিচ্ছে তার মধু সংগ্রহটুকুতে। কখনও গোবরের গাদায় বসেও তা থেকে পদ্মফুল ফোঁটাচ্ছে; কখনও বা দুধের কড়াইতে গোমূত্রের ছিটে হয়েও গিয়ে পড়ছে। মনের "পরশ"ই সোনার কাঠি, আবার রূপোর কাঠি। কাউকে জীয়াচ্ছে, কাউকে বা মারছে। তার মুখেই অমৃত, আবার মুখেই বিষ। তার মুখেই বিষের ছোঁয়াচ লাগে ব'লেই না রস গেঁজে উঠছে, মধু মাতাল-করা মদ হ'য়ে উঠছে! এ বিষ সে পায় কোত্থেকে? কর্ম থেকে, আর কর্ম জন্য বাসনা বা সংস্কারগুলো থেকে (বাসনা আবার শুভ অশুভ দুই রকম)—একথা বল্লে গোড়ার কথাটি অবলাই রয়ে গেল। কর্ম আসেই বা কোত্থেকে? বাসনা থেকে। আর বাসনা? কর্ম থেকে। দুটোরই মুড়ো খুঁজে পাওয়া যায় না—অনাদি। বীজাঙ্কুর ন্যায়। এ সব দর্শনশাস্ত্রের হেঁয়ালির কথা। নিজেই বুঝি নি; বোঝাব কেমন ক'রে? যতই না বোঝার কসরৎ করি, শেষ কালে সে বোঝার বোঝা এত বিষম ভারী হ'য়ে ওঠে যে, তাকে শেষ পর্যন্ত অবোঝার মধ্যে ফেলে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি! তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ—" "নৈষা মতিস্তর্কেণ"। আসলে ভবে যেটা তত্ত্ব আর তথ্য সেটা বোঝারই নয়। হয়ত বা পাবার বস্তু। এটুকু বুঝে ছুটি নিতে পারলেই সোয়াস্তি—তাই না? "যস্যামতং তস্য মতং—"। মনেই বল আর অন্য কিছুতেই বল, বিষ এল কোত্থেকে তার নিদেন বের করবে কে? সব কিছুতেই মধু বা আনন্দের "মাত্রা" রয়েছে—এ কথা শ্রুতি নিজেই বলেছেন। কিন্তু সব কিছুতেই বিষের "মাত্রা"ও রয়েছে যে। অন্ততঃ আমরা যারা কারবারে নিজে খাটছি, আর যা কিছু সব খাটাচ্ছি, তার আর সে সব কিছু, খাঁটি মধুর মাত্রা হ'য়েই ত' খাটছে না। আমাদের সাগরের কারবার নেই; গোষ্পদেরই কারবার। যাঁরা সাগরের কারবার করেন, তাঁরাও দেখি সময় সময় দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়েছেন—"অমিয় সায়রে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল!" তবে এ সাগর ভরা অমিয় আর সাগর-ভরা গরল আমাদের সাধারণ "ভূগোলের" বাইরে। পীরিতি বলিয়া তিনটি আখর—এই আখর তিনটির পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত ও সাগর ভরা অমিয়-গরল বুঝবে কে? বুঝলে পরে ও অমিয়-গরল যে "মধুরং মধুরং মধুরম্"। ও কথা যাক্।

যে গুলো ব্যবহারে জীব আর জড় হ'য়েছে তাদের গোড়ায়, বীজ ও মূলে যদি রস, মধু। আনন্দ, আনন্দই ছিল বা থাকে, তবে তা থেকে উল্টো উৎপত্তি হ'ল কোত্থেকে?—এর কৈফিয়ৎ সুষ্ঠুভাবে কেউ দিয়েছেন ব'লে ত' মনে হয় না। সাগরেই হোক আর গোষ্পদেই হোক্—অমিয় গরল হল কেমন ক'রে? সমুদ্র মন্থনে অমৃতও ওঠে, আবার গরলও ওঠে কেন? সাগর না হয় সাধ ক'রে ("কাম", সংকল্প" "শিক্ষা" করে) নিজে এতগুলো গোষ্পদ হয়েছেন। ("বহু স্যাং—")। কিন্তু তাই হ'তে গিয়ে নিজেকে উল্টে ফেলে আর একটা কিছু" (বিষ) ক'রে ফেলেছেন? তাই যদি ক'রে থাকেন ত'—এ

কেরামতের কৈফিয়ৎ ও কসরৎটা আমরা মোটেই বুঝি না। শাস্ত্র বলেন—অনির্বাচ্য। এ অ-বোঝাটিকে বোঝবার ব্যর্থ কসরৎ ক'রতে গিয়ে দেশ-বিদেশের "বেদ-বেদান্ত" সব নাজেহাল হয়েছেন দেখি। কিন্তু দর্শনে যার না পায় দর্শন, বেদ-বেদান্ত যার অন্ত পায় না—আগম নিগমেও যেটি রইল দুর্গম—তাকে দণ্ডবৎ ক'রে চুপ মেরে যাওয়াই ভাল নয় কি ?

কেমন ক'রে কি হল তা ত' বুঝি না কিন্তু যেটা ঘটছে, যেটা চলছে—সেটা ত' দেখতে পাচ্ছি। এ দেখা ভুল কি সাচ্চা সে জেরা তুলে কাজ নেই। আমি "জীব" হয়েছি—কি ছিলাম, আর স্বভাবে স্বরূপে কিই বা আছি, তাত জানি না। জানি না ব'লেই বুঝি জীব। "মায়া ঈশ ন আপু কহ জান কহে সে জীব"—মায়া ঈশ্বর আর আপনাকে যে জানে না সেই জীব। একটা লুকোচুরি কানামাছির খেলা যে চলছে তাও দেখতে পাচ্ছি। আমার যেটা অনুভূতির জগৎ (Universe of Experience) সেটা কোন কালেও ছোট, এতটুকু নয়। যে কালে একটা "তুচ্ছ" ধূলো নিয়েও আমি মেতে আছি, সে সময় আমার সমগ্র অনুভূতিটা ঐ ধুলোরত্তি নয়। সেটা বড়ই। সেটা আবার এত বড় যে একটা নির্দিষ্ট চৌহদ্দিতে সেটাকে পুরে বলতে পারি না—"ব্যস আমার জগৎ অথবা 'আমিই' এখন এই পর্যন্ত, আর ওদিকে শর্মার আর নেই।" অবশ্য কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলি—"এই ধুলোটাই দেখছি ?" এর কথাই ভাবছি ? কিন্তু এটা আমার অনুভূতির পুরা বিবৃতি নয় ; এটা আমার নিজের কাছে অথবা পরের কাছে দাখিল করা একটা কারবারি রিপোর্ট মাত্র। সে রিপোর্টে অনেক কিছুই ঢাকা পড়েছে ; অনেক কিছু বাদ সাদ দিয়ে বেছে নেয়া আছে তাতে। এই রকম ধারা রিপোর্ট তৈয়ারি করতেই আমরা অভ্যস্ত আছি। কারবারের জীব, ব্যবহারের গরজেই। যাতে ক'রে এই রকম নিজেকে (অর্থাৎ ব্যক্তাব্যক্ত চেতনার পুরো জগৎটাকে) ঢাকা দেয়া চল্‌ছে, তাতে বাছাই ছাঁটাই চল্‌ছে—সেইটের নাম "মায়া"। তার ভিতরে যাওয়া যায় না, ঢোকা যায় না বলে "মায়া"। আবার তাই দিয়ে সব "মাপ" (measure) হচ্ছে বলেও মায়া। বস্তু—এমন কি, আমি আর আমার সমগ্র অনুভূতি (Experience) আসলে অপ্রমেয়। তার সীমা নেই, মাপ নেই, হিসাব নেই। শ্রুতির বচন আওড়াচ্ছি না। ঐ যে রিপোর্টের কথা বল্লাম ঐ রিপোর্ট থেকে চোখ সরিয়ে চেয়ে দেখলেই তাই। কিন্তু তার "মাপ" হচ্ছে ; হিসেব হচ্ছে ; তার ওপর রিপোর্ট লেখা হচ্ছে। আর, তাই নিয়ে কারবার চলছে। "আমি জীব, ওটা জড়"—এটা ঐ রিপোর্টেরই কথা। এটা বড়, ওটা ছোট—এও তাই। নন্দন কানন"—এও তাই। রিপোর্টটা যে কেমন ধারা "সাজানো", "তৈরি" রিপোর্ট, তা ত' আমরা কটাক্ষে দেখে নিয়েছি। অথচ সেই জাল কাগজ খানা হাতে ক'রেই হামেশা "তিন সত্যি" করছি। ওই মাটি, পাথরটা যে জড় তাতে আর অণু মাত্র সন্দেহ নেই ! এই ধুলোটা যে "ছোট" তাতেও নেই ! গরজ বড় বালাই যে। থাকলে চলে

না যে ব্যাপারীর ব্যাপার করা! যাই হোক্, যে বিষের কথা আগে হচ্ছিল সে বিষের উদ্ভবও কি এই ভাবেই হয়েছে? অনুভূতি বা চৈতন্যের সমুদ্র মন্থনে অহংরূপী জীব হয়েছেন মন্থন-দণ্ড-মন্দর? স্বয়ং মায়া হয়েছেন মন্থনরজ্জু—বাসুকি? শুভাশুভ "অদৃষ্ট", বাসনা হয়েছে দেবাসুর? হ'লেও হ'তে পারে। কিন্তু আগেই কবুলজবাব ক'রে রেখেছি—এই সব রকমারি হবার, "উল্টো উৎপত্তি" হ'বার নিদেন বুঝি না। এ সব মন্দর টন্দর, বাসুকি, দেবাসুর। আর তাদের টানাটানি ব্যাপারটা "বাদ" দিতে পারলে যে সাগর সেই সাগর, এই মন্থনের সারা ব্যাপারটাই একটা ভোজবাজী নয় ত'? কেউ বলেন, হাঁ, তাই বই কি! মায়ার দড়িতে মন্থন হচ্ছে—এই থেকে বুঝলে না? কেউ বা বলেন—ভেল্কি কেন গো? লীলা। আভাস নয়—বিলাস। মন্থনের মূলাধার হ'য়ে রয়েছেন কূর্মরূপী ভগবান্। আমি কিন্তু তবু বুঝলাম না। দু'জনেই দেখছি নাকে চশমা লাগিয়ে তাঁদের "রিপোর্ট' কাগজখানায় তাকিয়ে রয়েছেন! দেখে শুনে ত' আমার স্বস্তি হ'ল না! ওগো, চশমা খুলে রেখে, রিপোর্ট টিপোর্ট সরিয়ে ফেল—একটি বার সাম্না সামনি হও দিকিন, সাগরের সা। কি?—এখন মুখে কথা ফোটে না যে। পরমহংসদেব বলেছিলেন নুনের পুতুল একবার গিয়েছিল সাগর মাপ্তে! কূলে দাঁড়িয়ে কত লম্ফ, ঝম্প? কিন্তু যাই গিয়ে সাগরের জলে নাব্ল, আর! কে কার মাপ করে, কে কার বার্তা নেয়, দেয়।

চুপ্ই যদি আছ, তবে না হক্ এত ব'কে মরি কেন? ও সব স্বভাব, স্বরূপ, তত্ত্বের কথা ওঠেই বা কেন? আনন্দ, সুখ, রস, ভূমা—এ সবই বা শুনি কেন? শ্রুতি শোনানই বা কেন? আমরা যারা হাটের হাটুরে, তারা হাটের হট্টগোলের মধ্যে থাকি ভাল। গোল নৈলে বাঁচি নে! যা বলবার নয়, শোনবার নয়, তা'ও শুনতে শুনতে বায়না ক'রে থাকি, তা বলতে উঝজিহ্ব হ'য়ে থাকি। বারণ করলে বেশী করে করি। তাই শ্রুতি দায়ে প'ড়ে কি করেন, যা বলার শোনার নয়, তাও বলেছেন, শুনিয়েছেন। যা অবাচ্য তা বলতে গেলে যা হয়, তাও হ'য়েছে। প্রায়ই "নেতি নেতি" করতে হয়েছে। "আশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।" বলাও আশ্চর্য করা, শোনাও তাই। শুধু কি আশ্চর্য করা? গুলিয়ে দেওয়া বটে, অর্থাৎ আমাদের কারবারি হিসাব শাস্ত্রের (Logic) তলিয়ে যেতে হয় ওখানে। সকল প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহারের বাইরে যেটা, সেটা থাতে ছুঁতে গেলে লজিককে হয় নিজের ঘাড়ে নিজে উঠতে হবে, নয় নিজের ছায়া নিজে ডিঙাতে হবে। জিনিষটা আসলে Alogical (Illogical) নয়। এইজন্য ওখানে "গুরোস্তু মৌনব্যাখ্যানম্"। সে গুরুও আবার বাইরে থেকেও বাইরে নয়। কোথায় খুঁজে দেখ। খুঁজতে বেরুলে অবাক্ হয়ে যাবে। যেটাকে "গোষ্পদ" বা বেঙের গর্ত ভেবে কারবার করছো, তার ভেতরই সাগরের সাড়া পাবে, সাগর বেরিয়ে পড়বে। ঘট সমুন্দর লখ না

পড়ে উঠে "লহর অপার। দিল দরিয়া সমরথ বিনা কৌন উতারে পার।"— ঘটের ভিতরেই সমুদ্র; কূল-কিনারা দেখি না; তাতে আবার দুস্তর লহরী মালা! গুরু হচ্ছেন "দিল দরিয়া সমরথ (সমর্থ); তিনি বিনা কেবা করে পার? "দিল দরিয়া" বলার সঙ্কেত আছে। কিন্তু সেটা থাক্। এই সাগরে পড়ে, অসমর্থ আমি (জীব) হাবুডুবু খাচ্ছি। সমর্থ একজন কেউ আছেন, তাই রক্ষে। তিনি নিয়ে যান কোথা? এক সাগর থেকে আর এক সাগরে। শেষেরটা "বিরজা বিমৃত্যুবিশোকঃ"। "অসতো মা সদ্‌গময়—" ইত্যাদি। আচ্ছা, রাস্তা ধর্‌ব কেমন করে? হাটের ব্যাপারীর যে কথাটা এতক্ষণ হচ্ছিল, সে কথাটা মহাজনের দোঁহাতেই পাই—'যো তু সাঁচ্চা বানিয়া সাঁচি হাট লাগায়। অন্দর ঝাড়ু দে কর কূড়া দূর বহায়"॥ সাচ্চা হাটে সাচ্চা বানিয়া হতে হবে; মনের ময়লা দূর করতে হবে। এই গেল প্রথম কল্প। মনের ময়লা (সেই বিষ) দূর হ'লে আমাদের এই ধাপার মাঠই রসের বাজার, আনন্দ-বাজার (সাচ্চা হাট) হবে। তারপর? আরও সব কল্প আছে। শেষ পদবীটি কোথায়? নির্বিকল্প জ্ঞানের পথে—নির্বিশেষ সত্তায়—পরম ব্যোমে অলখ নিরঞ্জনে। প্রেম-ভক্তিতে—তারও "অতীত" অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামে। কোন্‌টা চরম, তা নিয়ে লজিকের কচকচি ক'রে বা শুনে কি হবে? আসলে দুটোই আমাদের কারবারি লজিকের এলাকার বাইরে। লজিকের বোঝা-সোঝা সে ভূমি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায় না। আমাদের কারবারি জানা-শোনা, বলা কওয়া—এ সবও সেখানে যাবার ছাড়পত্র পায় না। অথচ সত্য সত্য নিজে "পরখ" করে দেখে নেবার, নিজে হবার ও পাবার বস্তু সেটি। সেই রকম ক'রে দেখে-নেয়া, হওয়া-পাওয়া বস্তুটাকে মুখে "উচ্ছিষ্ট" করবে কে বল ত? বল্‌বে কে, শুনবেই বা কে? তবু আমরা বায়না ধরেছি—শুনবোই। তাই গুরু শাস্ত্র-মহাজন বল্‌লেন—সেটি আত্মা, ব্রহ্ম, ভূমা, রস, পরমপুরুষ, আত্মাশক্তি। শুনলাম ঐ পর্যন্ত। বুঝলাম না কিছুই। হাল্কা হিসাবী মগজ লজিকের এক রাশ বোঝা নিয়ে এ ক্ষুরের ধার অতি সূক্ষ্ম "সূত্রসঞ্চার" পন্থা ধ'রে চলবে কি ক'রে?

আমাদের কারবারি বোঝাটাকেই একমাত্র বোঝা মনে করেই ত' যত বোঝা। সেই বোঝাতেই ত ওটা "জড়", ওটা "ছোট", ওটা "তুচ্ছ"! এ বোঝার বাইরে অন্য ধরণের বোঝা আছে। সে অন্য ধরণটা বিজ্ঞান কতকটা ধরেছেন। কাজেই আমাদের অ-বোঝা অনেক কিছু তিনি বোঝাচ্ছেন। যোগ আর প্রজ্ঞানের বোঝাটাও আলাদা তাতে অনেক কিছুর চেহারা, ভোল, এলাকা বদ্‌লে যায়। এমন কি সর্ব ব্রহ্মময়ও হ'য়ে যায়; ঘটে ঘটে রাম বিরাজ করেন। প্রজ্ঞানেরও নানান্ ভূমি আছে। তা ছাড়া —এই বিজ্ঞান-প্রজ্ঞানের বোঝা ছাড়া—আরও এক রকম বোঝা আছে। সেটা প্রেমের বোঝা। সেই "পীরিতি" বলিয়া তিনটি আখরের পরিচয় হলে তবে এ "বোধোদয়"টি সুরু। প্রেমের "চোখ" প্রেমের তত্ত্ব, প্রেমের অনুভূতি, প্রেমের ব্যবহার—এ সব স্বতন্ত্র।

কথাটা পাড়লাম মাত্র। এ জন্য আমাদের এ ভবের দরিয়ায় লজিক হালে পানি পেল না বলে হাল ছেড়ে দেব কেন? দিল দরিয়া সমরথ মাঝির হাতে হাল তুলে দেও না! দরিয়া ত' দরিয়া, সাগরেও পাড়ি মিল্‌বে। বক ডোবার ধারে বসে বেঙ ধরে ধরে খাচ্ছে। বকটিকে হংস ("অহংসঃ") করার ফিকির বের করতে পার? তা হলে দেখ্‌বে—"আব মন হননা ভয়া মতি চুন চুন খাত"। মন হংস হয়ে স্বচ্ছন্দে মতি চুনে চুনে খাচ্ছে। মতি কি ডোবায় মেলে? তাকে সাগর-সন্ধানী, সাগর-সঞ্চারী হতে হয় না?

তাই বলছিলাম মনই বক, আবার মনই হংস। হাঁসের পর পরমহংস। কি করে সে বক হল, হংস হল—তার পাকা কৈফিয়ৎ দিতে পারবো না। কেউ পেরেছেন কি না তাও জানি না। মনে হয়—কর্ম্মই বল, আর অদৃষ্টই বল, আর নিয়তিই বল, আর ভগবদিচ্ছাই বল—পাকা কৈফিয়ৎ দেয়াই যায় না। না দেয়া যাক্‌—বকও ডোবার ধারে ব'সে খাসা বেঙ্‌ ধরে খাচ্ছে, হংসও স্বচ্ছন্দে সাগরে মুক্তা খেয়ে বেড়াচ্ছে। ধাপার মাঠও হয়েছে; বালীগঞ্জের লেক অঞ্চলও হয়েছে। দুটো আলাদা হয়ে রয়েছে। আবার একটার জায়গায় আর একটা করে নিতেই বা কতক্ষণ! হয়েও যাচ্ছে হামেশা; নয় কি? কারবারে কিন্তু দুটোরই দরকার আছে। নেই কি? ধাপার মাঠ বিশ্বেশ্বরী না থাকলে কি বালীগঞ্জ, চৌরঙ্গী, শ্যামবাজার, বাগবাজার, বহুবাজার, বড়বাজার খোস মেজাজে বহাল তবিয়তে থাকত?

ধাপার মাঠে মরা পচা, রদ্দি ময়লা মালের গাদি দেখে নাক সিট্‌কিয়ো না। তোমার এই "স্বর্ণ লঙ্কার" হরিজন, শ্মশানবন্ধু ঐ ধাপার মাঠ। শ্মশানকে, ছাইভস্মকে আদর করে গেছেন, যাঁদের চোখ ফুটেছে তারাই। সদাশিব শ্মশানবিলাসী। "ছাইভস্ম" আমরা আগেই চিনেছি। ধাপার মাঠ উপেক্ষার, অনাদরের, ঘৃণার নয়। তবে মনে রাখতে হবে—এটাও কারবারের হাট। এখানেও বাদসাদ চলছে; এককে আর বানিয়ে নেয়া হচ্ছে; মায় সাপ ব্যাঙের চর্বিকে পর্য্যন্ত। সব যায়গাতেই তাই; কেন না, কারবার মানেই তাই। তবে ধাপার মাঠের কথাটা বিশেষ করে বলছি এই জন্য যে এখানে শুধু শবকেই দেখি, শিবকে দেখি না; ছাইভস্মই দেখি, "বিভূতিকে" দেখি না; ছেঁড়া আর নোংরাই দেখি, পূর্ণ ও শুদ্ধ যেটি তাকে দেখি না। দেখি না বলে তারা সত্য সত্যই কি "পড়ে" বাতিল হয়ে গেছে? যেটাকে শব বলছি। জড় বলছি, সেটা সত্য সত্যই কি ছেড়া? যেটাকে বলছি ছোট, তুচ্ছ, নোংরা সেটা সত্য সত্যই কি তাই? কারবারের খাতায় কি ভাবে তারা লিষ্টিভুক্ত হয়েছে। তা জিজ্ঞেস করছি না। সাচ্চী খবর যদি কিছু থাকে ত তাই। নেই—?

সংশোধন ও সংযোজন

প্রথম সংখ্যা পৃষ্ঠার, দ্বিতীয় সংখ্যা ছত্রের (ঐ পৃষ্ঠা হইতে গণনা করা হইয়াছে)। সংযোজনের পূর্বে যোগ চিহ্ন দেওয়া আছে। সংশোধিত রূপ উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে।

১।৪ 'পলিওলিথিকম্যানও'। ৩।২৪ 'স্বরাট্, বিশ্বরাট্'। ৩।২৭ 'পৌঁছিতে'। ৮।৫ 'ভয়ও পাইব না'। ১৬।১৬ 'আস্তিক'। ১৮।৮ 'Specticism'। ১৯।৯ ধ্যান 'কর্তারা'। ২৬।২৯ একটা+বন্দোবস্ত। ২৭।২৬ বাতাস+কাঁচ। ২৮।১৩ 'আমরা'। ২৯।৩১ 'উন্মাদ'। ৩৩।১০ 'বুদ্ধির' গুহা। ৩৩।১৩ আয়ুধ+তাহার পাওয়া আবশ্যক হইল যে আয়ুধ। ৩৪।১৫ দৃঢ়+ও। ৩৫।১৭ গিয়াছি '।'। ৩৭।২৬ করিয়াছিলেন '।'। ৩৮।২ 'জড়ে,' প্রাণে, মনে,। ৪১।১৪ 'একার্ণবীকৃত'। ৪২।১৪ 'কুম্ভকারের'। ৪৫।১৮ 'অগ্রসর'। ৪৮।১৫ 'একটা'। ৫২।১১ 'ব্যবহারিক'। ৫৩।১ 'ব্যবহারিক'। ৫৫।১৭ 'সুস্থির'। ৫৯।২৫ 'করিয়াছি'। ৬০।৬ জড়ের+ভিতরে। ৬৩।২১ 'চরম'। ৬৮।৭ একটা+স্পষ্ট। ৭৩।৯ আমাদের+দেহের। ৭৪।৪ 'বস্তুনিচয়'। ৭৪।৪ 'অঙ্গে'। ৭৪।১৪ 'পসরা'। ৭৫।২ ইচ্ছাধীন 'নয়'। ৭৬।১৬ 'ওতপ্রোত'। ৭৬।৩০ 'কঠোর'। ৭৭।২৯ দিকে 'এবং'। ৮১।২ চরম লক্ষ্য ','। ৮২।৬ মনে 'হয়'। ৮২।৬ 'বুদ্ধিজঠরে ওসকল'। ৮২।২৪ 'দিয়া'। ৮৬।৩ হইয়াছে ','। ৮৬।৫ 'তা' কে। ৮৮।২৫ 'মৃগ্য'। ৯০।১১ 'প্রশ্ন'। ৯০।১৫ কিন্তু+যাদের। ৯৬।১০ ধারণা+না। ৯৬।৩২ 'আজ ওদেশে'। ১০৮।২৭ বাচিয়া 'রাখিতে'। ১০৮।৩২ 'বুঝি' বা। ১১০।৯ 'সামগ্রী'। ১১১।৩ আত্মা নিয়ে+মুক্তি নিয়ে। ১১১।২৪ সত্য ','। টিকিয়াছে ','। ১১২।১ 'অন্ধতা ও'। ১১২।১৩ বিজ্ঞানের 'যুগে'। ১২১।১৬ 'resistance'। ১২২।১১ 'এতটুকু'। ১২২।১৬ 'মহাত্মাই'। ১২৩।১ 'তাড়িত'-তরঙ্গ। ১২৫।১৪ '১৯১৪'। ১২৫।১৬ 'ভস্মীভূত'। ১২৬।১০ ঋষিরা 'উপমার'। ১২৬।১৪ 'আপ্ত' কাম। ১২৬।১৮ শৃঙ্খলটাকে+তেমন পাকাপোক্ত মনে করিতেছে না, আর, সেটার বাঁধনটাকেও। ১২৬।২০ স্বরূপে ও 'সাকল্যে'। ১২৬।২৩ 'মূলসূত্রগুলিকেও'! ১২৬।২৪ 'অভ্রান্ত'। ১২৬।২৭ আসিয়াছে ও+আসিতেছে। ১২৬।৩১ 'পরিচ্ছিন্ন' ভাবে। ১২৭।১৩ তত্ত্বটিই+বুঝিবার সম্ভাবনা। ১২৭।২৭ 'অফুরন্ত'। ১২৯।২৪ অপকৃষ্ট+যুগের। ১২৯।২৯ কল্প 'পুরুষ'। ১৩০।১২ রীত 'বুঝেন' না। ১৩০।৩১ 'এমন' মনে। ১৩০।৩১ 'হেতু' নাই। ১৩১।১৭ 'হইতে' পারেন। ১৩১।২৪ যে 'সপ্রয়োজন'। ১৩২।২৪ স্বস্তিকে+শ্রদ্ধার। ১৩২।২৪ অঙ্গীকার 'করিয়াছিল'। ১৩৩।১০ 'যে' সত্তাটি। ১৩৩।২৩ 'চলিতে' গিয়া। ১৩৪।১১ 'ধুলার ধরায়'। ১৩৪।৩১ 'থাকেন'।

১৩৬।২৪ 'গোড়ার'। ১৩৭।৭ 'লীলাময়' তিনি। ১৩৮।১৫ we 'seem'। ১৩৯।৫ so 'far' ১৩৯।১৯ পরমাণু+ও হাইড্রোজেন পরমাণু।· ১৪২।২ 'মৈত্র্যুপনিষৎ'। ১৪২।১৮ 'আদিত্য মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী'+হিরণ্যবর্ণ হিরণ্যকেশ পুরুষ হইতে অভিন্ন একথা আমাদের। ১৪২।২০ তিনি+অধিদৈবত কেবলমাত্র একথা বলিলেই রহস্য বোঝা গেল না। ১৪৪।১৬ 'basis'। ১৪৪।২৫ এক-'একটা'। ১৪৫।২৬ 'এমন'। ১৪৭।৩ 'advancement' ১৪৭।৬। 'Scholar-ship'। ১৪৯।১৮ 'সব' এটম্‌গুলার। ১৫১।১৩ 'একান্তভাবে'। ১৫৩।৯ 'সহস্রশীর্ষ'। ১৫৬।২ 'অসন্দিগ্ধ'। ১৫৯।১৯ এবং 'যাহাকে'। ১৫৯।২৯ 'মনীষাকে'। ১৭০।৯ এমন 'এক'। ১৭১।১৬ সুস্থির হইয়া+দিনিমণির কোল জুড়িয়া বসিতে পাওয়া যায়। নাতি। ১৭১।৩০ 'ভক্তিই মাগিয়াছেন'। ১৭৮।৩০ কোয়ানটাম। ১৮০।১০ 'অর'। ১৮২।১৪ তার+দ্বারা। ১৮৪।১৮ 'শুনাইয়াছিলাম'। ১৮৫।১১ রাজনীতি,+সমাজনীতি। ১৮৫।১৩ আর কি '।'! ১৮৫।১৬ 'Dictatorship'। ১৮৬।৩ 'Lust'। ১৮৬।৫ জন্যই '?' ১৮৬।১১ 'ঈক্ষণ'। ১৮৭।২৭ শক্তি 'নইলে'। ১৮৮।১৩ 'পড়িয়াছিলাম'। ১৮৯।৯ 'স্পেস্‌ও'। ১৮৯।১৩ আকার '?'। ১৮৯।১৯ 'তৃতীয়'। ১৮৯।৩২ 'unbounded। ১৯০।৩ 'Drake'। ১৯২।১৭ 'সাভান্ট'। ১৯২।২৩ 'Concept'। ১৯৩।৭' causation'। ১৯৩।১০ 'পসারই'। ১৯৩।১৩ 'গাথুনির'। ১৯৪ ১৫ 'নিতেছ'। ১৫।২৫ 'charge'। ১৯৫।৩১ 'ফোর্স'। ১৯৬।৭ 'অবচ্ছেদ' নাই। ১৯৬।১৮ 'তন্বা'। ১৯৭।১২ 'সাংখ্যের'। ১৯৭।২১ একই 'বোঁটা'। ১৯৭।৩২ Neils। ১৯৮।১৭ 'এবং' চক্র। ১৯৮।২১ 'walton'। ২০০।৩ ভিতরের '।'। ২০০।৫ বীজ 'মন্ত্র'। ২০০।১৫ সেই সব +বাতিল বকেয়া ছবির সঙ্গে মিলিতে চলিয়াছে। ধূলা ঝাড়িয়া ময়লা মুছিয়া সেই সব। ২০২।৮ ডাক্তার 'প্রাণনাথ'। ২০২।১০ 'শ্রাদ্ধ' অনেক। ২০৩।৩ 'যোগবাশিষ্ঠে'। ২০৩।৩ 'সমীপে'। ২০৩।৪ 'আমাকে'। ২০৩।৫ বিশ্ব 'শ্মশানের'। ২০৩।২৪ 'শুধাইলেন'। ২০৩।২৭ নানাবিধ+রূপের। ২০৪।১৭ 'সে'। 'লক্ষণের'। 'পরিচয়ের'। ২০৫।২২ 'মিশালী' তৈল। ২০৫।৩১ সে বস্তুও+একটা রূপ,। ২০৭।১১ এমন নয়।+সৃষ্টি ও পুষ্টিও চলিতেছে। ২০৭।১১ নয়। 'তিনে'। ২০৭।২৭ 'ওতপ্রোত'। ২০৭।২৮ 'শক্তিময়ঃ'। ২০৭।৩৯ ঊর্দ্ধ্বশক্তির+আর অধঃ শক্তির। ২০৭।৩২ 'একটা'। ২০৮।১২ 'ব্রহ্মা' তাঁর। ২০৮।২৩ 'মন্বন্তরাদি'। ২০৮।৩০ 'মনোগ্যামিই'। ২০৯।১৭ 'জীবকোষে'। ২০৯।২৭ 'সোনার'। ২১০।১৬ আমরা+ঠারে ঠারে ঠাওরাইলাম। রসিকে ২১০।১৭ 'ব্রজবুলিও'। ২১০।২৯ 'ছন্দের'। ২১১।১ রুদ্রছন্দে+রুদ্রছন্দে। ২১১।১১ শব্দমার্গে+মন্ত্রশক্তি দ্বারা হইতে পারে অথবা রশ্মিমার্গে। ২১১।১৫ 'একসিস্'। ২১১।১৭ 'যেটা'। ২১১।২৫ পোষণে 'শোষণ' হইতেছে।